বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা

অধ্যাপক অশোক গুপ্ত

[পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ
পাঠ্যক্রমানুসারে পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা

[বিষয় (Contents) অংশ সহ]

অশোক গুপ্ত এম.এ., বি.টি.
অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়
"শিক্ষক-শিক্ষণ" বিভাগ
তমলুক, মেদিনীপুর

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

প্রকাশক :
স্বধীরচন্দ্র রায়
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : ধনঞ্জয় বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
নিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

॥ মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র ॥

॥ মুখবন্ধ ॥

মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা জাতীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার ব্যবস্থা করতে পারিনি। মাধ্যমিক পরীক্ষায় নম্বরের দিক থেকে মাতৃভাষার গুরুত্ব কিছু বেড়েছে এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর গুরুত্ব কিছু কমেছে ঠিকই ; কিন্তু তার দ্বারা শিক্ষণ-পদ্ধতির মৌলিক কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি কিংবা মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন কোন সচেতনতার সৃষ্টি হয়নি। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে ইংরাজী ভাষাকে তুলে দেওয়া নিয়ে চারিদিকে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় আলোচনার যে-সুর শোনা যাচ্ছে তাতে মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরাজীর প্রতি পক্ষপাতিত্বই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। এর পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপরিচালনা, উচ্চপদে চাকুরীলাভ, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে মাতৃভাষা-চর্চার মাধ্যমে সাফল্যলাভের সুযোগ যে এখনও সম্প্রসারিত হয়নি—এ প্রতিক্রিয়া তারই দিগ্‌ভ্রষ্ট বহিঃপ্রকাশ !

জনসাধারণ শিক্ষাতত্ত্ব বোঝে না, বোঝে বাস্তব-জীবনে ভাষাশিক্ষার উপকারিতা। মাতৃভাষা যে যথার্থই মাতৃদুগ্ধ তার প্রমাণ আমরা জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। সেইজন্যই আজ মাতৃভাষায় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আন্দোলন হয় না—অথচ মাতৃভাষার স্বার্থে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী ভাষা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও কত সোচ্চার !

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গ্রন্থটি বি. এড. পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-পাশের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত মতামতগুলি এই গ্রন্থে যথাসম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত হ'লেও বাংলা ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই গ্রন্থটি পড়ে কিছুটা চিন্তার খোরাক লাভ করতে পারবেন, এ আশা রাখি। গ্রন্থটি যাদের জন্য রচিত তারা এটি পড়ে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করব।

১লা ডিসেম্বর
১৯৮১

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

"নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরাণী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজিশিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-কাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনো রকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

—রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ [১৯৩৬]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

রাজশেখর বসু : চলন্তিকা
সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত
জগদীশচন্দ্র ঘোষ : আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : O.D.B.L.
ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : সাহিত্য ও পাঠক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রচনাবলী, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ খণ্ড
অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য জিজ্ঞাসা
কল্যাণী কার্লেকার : বাংলা ভাষার শিক্ষা-পদ্ধতি
বীরেন্দ্রমোহন আচার্য : মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র
W. M. Ryburn : The Teaching of the Mother-Tongue
E.A. Macnee : Instruction in Indian Secondary Schools
প্রিয়রঞ্জন সেন : বাংলা পড়ানো

১

শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব—মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার স্থান

[Importance of the mother-tongue in education. Place of the mother-tongue in the curriculum of High and Higher Secondary Schools]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রয়োজনীয়তা—বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক—শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা।

॥ শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব ॥

১ ॥ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি ? [C. U. B. T. 1957]

অথবা, শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

উত্তর : মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বকে সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে 'মাতৃদুগ্ধে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের মাতৃভাষা ছিল একান্তভাবে অবহেলিত। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে সেদিন পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজী ভাষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু মাতৃভাষার গুরুত্বকে খর্ব ক'রে কোন জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিংশশতাব্দীর সূচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবুল কালাম আজাদ, ডঃ জাকির হোসেন, প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষার চর্চা এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবী ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আজ আমাদের দেশে পরাধীন ভারতের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়েছে।

পরাধীন ভারতে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি

কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বাধীনতালাভের দীর্ঘ ৩৩ বছর পরও মাতৃভাষা একটি অত্যন্ত অবহেলিত বিষয়। এর পিছনে যেসব কারণ রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে এখনও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হয়ে উঠতে পারিনি। সেইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি তা আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদেরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন :—

প্রথমতঃ, মাতৃভাষা একই ভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে ভাববিনিময় ও যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম—

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বাস করতে পারে না। সমষ্টিগতভাবে বসবাস করার প্রবৃত্তি তার জন্মগত। বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে আসছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক একটি গোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধতার মূলে এক-একটি ভাষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালীরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে পারস্পরিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতির আদান-প্রদান করতে পারে অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে তা পারে না। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের চিন্তার যোগসূত্র ভাষার মাধ্যমেই স্থাপিত হয়। সেইজন্য ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম (Medium of Communication) হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেহেতু শৈশবকাল থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশু তার পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে, সেইজন্য মাতৃভাষাই তার আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মাধ্যম।

মাতৃভাষা আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম

দ্বিতীয়তঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার উপর ছাত্রের মানসিক ক্ষমতার উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে—

ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা বলতে তাদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি মানসিক সামর্থ্যগুলিকে বোঝানো হয়। ছাত্রদের এই মানসিক সামর্থ্যগুলির সঙ্গে মাতৃভাষার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। মাতৃভাষা যে কেবল ছাত্রদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে তা নয়, মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলিরও বিকাশ ঘটে। চিন্তন (thought) ও ভাষা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে মনের মধ্যে উভয়ের ক্রিয়াশীলতা একই সঙ্গে চলতে থাকে

এবং একটির বিকাশ না ঘটিয়ে অন্যটির বিকাশ ঘটানো যায় না।[১] মাতৃভাষার সাহায্যেই শিশুদের চিন্তা মনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মাতৃভাষা হচ্ছে চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বাহন। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভাষা ও চিন্তন (thought) পরস্পর পরস্পরের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমোন্নতির ফলেই ভাষার উদ্ভব ঘটেছে—আবার ভাষাও মানুষকে উন্নত ধরনের চিন্তা করতে সাহায্য করেছে। উন্নত ধরনের চিন্তন কিংবা সমস্যা সমাধানমূলক চিন্তনকে বলা হয় বিচারকরণ (reasoning)। এই বিচারকরণও মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেইরূপ ছাত্রদের কল্পনাশক্তির বিকাশও তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গেও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি যে বিভিন্নপ্রকার আচরণের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে তার মধ্যে ভাষার ব্যবহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আচরণ। বুদ্ধিবৃত্তি যেমন মাতৃভাষা আয়ত্ত করার ব্যাপারে ছাত্রদের সাহায্য করে, তেমনি মাতৃভাষার উপর দখলও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে বিশেষ সাহায্য করে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মাতৃভাষা শিক্ষার উপর ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতার উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে।

চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক—

শিশু মাতৃগর্ভ থেকে একটি সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। যে সমাজে সে জন্মায় সেখানে তার পূর্বপুরুষেরা যুগ যুগ ধ'রে এক বিশেষ জীবনযাত্রাপ্রণালী অনুসরণ ক'রে আসছেন এবং তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হচ্ছে। শিশুও তার মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার পূর্বপুরুষদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ ভাষাভাষী জনসমষ্টি তাদের সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক রীতি-নীতি,

১। '.....if thought and inner speech are so closely interwoven that they grow and decay together, we cannot cultivate one without cultivating the other. And training in the use of the mother-tongue—the tongue in which a child thinks and dreams—becomes the first essential of schooling, and the finest instrument of human culture. —P. B. Ballard

'It is therefore of the greatest importance for our pupils to get a firm grounding in their mother-tongue for at the same time we are giving them a firm grounding in their intellectual life.

—W. M. Ryburn, The Teaching of the Mother tongue

জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা লিপিবদ্ধ করে রাখে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরবর্তী বংশধরেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে অগ্রগতির বিবরণ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্পর্কে যে পথনির্দেশ লাভ করে তাকেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (cultural heritage) বলা হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্নপ্রকার উপাখ্যান, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদ, ছড়া, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, তর্জা, পাঁচালী, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালী জাতির জীবনযাত্রাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি নিহিত আছে। এরই পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, মনীষীদের জীবনী প্রভৃতির মধ্যে নিহিত আছে বাঙ্গালী জাতির উচ্চতর সংস্কৃতির উপাদানসমূহ। অতএব বাংলা ভাষাই যে বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষা আমাদের ঐতিহ্যেরও ধারক ও বাহক। কারণ এই ভাষার মাধ্যমেই শিশু তার পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত জীবনযাত্রাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি যথা বাঙ্গালীদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দ, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে, বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বংশগত ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে এই ভাষাকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ ভাষা, সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাতৃভাষা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ও বংশগতি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক

চতুর্থতঃ, মাতৃভাষা সামাজিক ও আন্তর্ব্যক্তিক (inter-personal) সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় করে—

মাতৃভাষার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যত ভালভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে, অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে তা পারে না। যাদের মাতৃভাষা এক তারা যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে পরস্পর ভাববিনিময় করে তখন তাদের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি যেভাবে বহিঃপ্রকাশ লাভ করতে পারে, অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে কখনই তা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য মাতৃভাষা, একই ভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া কোন জনসমষ্টি যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে বাস করে তার অন্তর্গত সমস্ত কিছুর সঙ্গে মাতৃভাষার খুব নিবিড় সম্পর্ক থাকে ব'লে মাতৃভাষা ঐ জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সেতুবন্ধ রচনা

মাতৃভাষা সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে

করে। শস্যশ্যামলা, নদীমাতৃক ও মৌসুমীজলবায়ু প্রভাবিত এই বাংলা-দেশের অধিবাসীরা যে বাংলা-ভাষায় কথা বলে তাঁর সঙ্গে এদেশের জলবায়ু, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও বস্তুজগতের এমন নাড়ীর যোগ রয়েছে যার প্রভাবে বাঙ্গালীরা তাদের মাতৃভাষার সূত্রে পরস্পর এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—

শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন একথার অর্থ হল এই যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলি চর্চা করবে। কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই নয়, উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজ মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুদিন হল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে। সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটছে তা যদি ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে জানবার ও চর্চা করবার সুযোগ লাভ করে তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে তারা যত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারবে, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে কখনই তা সম্ভবপর হবে না, একথা বলাই বাহুল্য।

মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ

বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষার যে আরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। মাতৃভাষাকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয় হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য যে কোন বিষয় চর্চা করার সময় ছাত্রেরা যাতে তাদের ধারণাকে মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ (appropriate) ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। কারণ মাতৃভাষা কেবল শিক্ষার বাহনই নয়, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। মাতৃভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে তবেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হয়।[1] এই দিক থেকেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের Hadow Committeeর Report (1926)-এ সে দেশের মাতৃভাষা ইংরাজী সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেকথা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য : "...English should not be treated as an isolated subject confined to certain definite periods assigned to it in the time-table. In every branch of the curriculum pupils should be trained to express their ideas, either orally or in writing, in accurate and appropriate language. It will therefore be advisable to exercise a careful supervision over the use of English in every subject."

—*Hadow Report on The Education of the Adolescent.*

ষষ্ঠতঃ, মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের আবেগের প্রশিক্ষণ এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

আবেগের প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে মাতৃভাষার ভূমিকা

মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন তার বস্তুগত চাহিদাগুলি মেটানোর প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে তার মানসিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা। স্থূল বস্তুগত চাহিদাগুলির পরিতৃপ্ত ঘটলেই নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মত মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। মানুষের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য-সম্ভোগের একটি চিরন্তন আকাঙ্খা রয়েছে। এই মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবনই হচ্ছে এইসব কাব্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির প্রধান উপজীব্য বিষয়। কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ছাত্রদের সৌন্দর্য সম্ভোগের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটে, অপরদিকে তেমনই তাদের মধ্যে উন্নত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের সৃষ্টি হয় এবং তাদের চরিত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের মানস জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্য কোন ভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য তা পারে না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কাব্য ও সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির পিছনে আমাদের প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি জন্মগত জৈব-মানসিক শক্তিগুলি কাজ করে। শৈশবে এই জৈব-মানসিক শক্তিগুলি অপরিমার্জিত অবস্থায় থাকে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের অমার্জিত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও অনুভূতি শক্তির উন্নতি সাধিত হয় এবং তার মধ্যে সুন্দর ও সুন্দরকে উপলব্ধি করার ক্ষমতার সৃষ্টি হয়।

যেহেতু মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে ছাত্রেরা যে সমাজে বাস করে তারই অন্তর্গত নরনারীর সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণা, উত্থান-পতন ও হাসি-কান্নার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে, সেইজন্য ছাত্রদের আবেগময় জীবনের উপর এই কাব্য ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। সৎ সাহিত্য ছাত্রদেরকে জীবনের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তারা তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং ছাত্রদের মনের উপর কাব্য ও সাহিত্যের আবেগ-মূলক প্রতিক্রিয়া তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।[১] এইভাবে মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের আবেগের প্রশিক্ষণ

১। "The growth and development of our emotional life especially, greatly depends on how the mother-tongue is taught. The emotional effect of literature and poetry is something which is of vital importance in the development of personality. This emotional training and development depends absolutely on the mother-tongue. Literature in a foreign language, for all but a few exceptional people, can never perform the function that is performed by literature in the mother-tongue."

—W. M. Ryburn—The Teaching of the Mother-tongue.

এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সপ্তমতঃ, মাতৃভাষা শিশুর ক্রমবিকাশের একটি অপরিহার্য শর্ত—

শিশুর ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়-পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসাবে মাতৃভাষার যা মূল্য তার চেয়ে শিশুর জীবন-বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসাবে মাতৃভাষার মূল্য অনেক বেশী। মাতৃভাষা যেমন বিদ্যালয় জীবনের একটা শর্ত, তেমনি শিশুর পারিবারিক ও সমাজ-জীবনেরও একটা শর্ত—অর্থাৎ মাতৃভাষার উপরে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা নির্ভর করছে, অন্যদিকে তেমনি নির্ভর করছে পারিবারিক ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্থকভাবে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা। মাতৃভাষা হচ্ছে জীবনের এমন একটা অপরিহার্য আচরণীয় বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রসারিত। মাতৃভাষার পাঠদান কেবল ছাত্রদের মনে কোন একটা জ্ঞান সঞ্চারিত করার ঘটনা নয়—এটা হচ্ছে শিশুকে পরিপূর্ণ মানবজীবনে প্রবেশের জন্য যে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার একটা অংশ।[১]

শিশুর ক্রমবিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনে ভাবের আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল ছাত্রেরা যা বলতে চায়, মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে তারা যেন তা-ই বলতে পারে এবং তারা যেন সরল ও সুস্পষ্টভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীরা যে-কোন পেশাই গ্রহণ করুক না কেন তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কোন শিশুই একজন উৎকৃষ্ট এবং হিতাকারী নাগরিক হিসাবে গ'ড়ে উঠতে পারে না যদি না সে যথাযথভাবে তার মাতৃভাষা ব্যবহারের এবং মাতৃভাষায় জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর মূল্য উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করে। একজন উৎকৃষ্ট নাগরিকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, যেমন, সুস্পষ্ট চিন্তাশক্তি, সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী, চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য, আবেগ ও সৃজনমূলক জীবনের পরিপূর্ণতা প্রভৃতি গুণগুলির যথাযথ চর্চা ও বিকাশ ঘটতে পারে যদি আমরা ছাত্রদের আবেগমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী (intellectual) জীবনের যে ভিত্তি অর্থাৎ মাতৃভাষা, তার চর্চার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিই।

১। English (mother-tongue) is not a school subject at all. It is a condition of school life....It is a condition of existence rather than a subject of instruction. It is an inescapable circumstance of life and concerns every English-speaking person from the cradle to the grave. The lesson in English is not merely one occasion for the inculcation of knowledge; it is part of the child's initiation into the life of man.

—George Sampson—English for the English

অষ্টমতঃ, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের চাহিদা, সৃজনশীলতার চাহিদা ও সাহিত্য-সৌন্দর্য পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটে—

ছাত্রদের মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা রয়েছে সেগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশের চাহিদা ও সৃজনশীলতার চাহিদা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি না ঘটলে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে না। বাল্যকাল ও বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রদের মধ্যে এই চাহিদাগুলি যথেষ্ট তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। এরই সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য ছাত্রেরা তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা ও বিভিন্নপ্রকার অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করতে চায়। এর জন্য বিদ্যালয়ে বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই ছাত্রেরা এইসব বিষয়গুলিতে অংশগ্রহণ করে এবং তার ফলে তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। ছাত্রদের মধ্যে যে সৃজনশীলতার চাহিদা ও সাহিত্য-সৌন্দর্য-পিপাসা রয়েছে মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে তারও অনেকখানি পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। মাতৃভাষার ক্লাসে ছাত্রেরা যদি গল্প বলা ও লেখা, রচনা লেখা, পদ্য কিংবা ছড়া লেখা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা, ডায়েরী লেখা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথাযথভাবে চর্চার সুযোগ পায় তাহলে তাদের সৃজনশীলতার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত ছাত্রদের বয়সের উপযোগী প্রসিদ্ধ লেখক ও কবিদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ ও আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সাহিত্য-সৌন্দর্য পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটে। কারণ এইসব রচনার মধ্যে ছন্দের মাধুর্য এবং প্রকাশভঙ্গী, গঠন (form), ভাব, ভাষা প্রভৃতির এক বিশেষ সৌন্দর্য বর্তমান থাকে যার মাধ্যমে ছাত্রেরা কাব্য-সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্য পিপাসার পরিতৃপ্তি

নবমতঃ, মাতৃভাষা ছাত্রদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে—

মাতৃভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। জীবনে চলার পথে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ছাত্রদের মনে নানারকম ভাবের সৃষ্টি হয়। এই ভাবগুলি হল সুখ, দুঃখ, বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি। এই ভাবগুলি মনের মধ্যে একপ্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ভাষার মাধ্যমে যখন এই ভাবগুলির যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন ছাত্রদের মনের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। যেহেতু মাতৃভাষার মাধ্যমেই কেবলমাত্র উপরিউক্ত ভাবগুলি যথাযথ ভাবে বহিঃপ্রকাশ লাভ করতে পারে সেইজন্য ছাত্রদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে মাতৃভাষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানসিক সুস্থতা রক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকা

॥ মাতৃভাষার উপযোগিতা ॥

২॥ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কেন প্রয়োজনীয়? এই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

[C.U.B.T. 1955, N.B.U.B.T. 1968]

অথবা, ছাত্র-ছাত্রীদের সম্যক আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের অবদান সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

[C.U. B.Ed. 1972]

উত্তর : সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়-গুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হল, এই বিষয়গুলি চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা যে সমাজে বাস করে তার উপযোগী ক'রে নিজেদের গ'ড়ে তুলতে পারবে। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার গুরুত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা কি তা আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে।

শিশু মাতৃগর্ভ থেকে একটি সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। এই সামাজিক পরিবেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরিবার। পরিবারের মধ্যে থেকেই শিশু তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি সংগ্রহ করে। আর এ ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সাহায্যে একদিকে যেমন শিশু তার বিভিন্ন প্রয়োজনগুলি ব্যক্ত করতে পারে, তেমনি অপরদিকে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার মনে যে সীমাহীন কৌতূহলের সৃষ্টি হয় তা সে চরিতার্থ করতে পারে। মাতৃভাষাই তার কাছে আত্মপ্রকাশের এবং অন্যের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের একমাত্র মাধ্যম। এই মাধ্যমটি যত ভালভাবে সে আয়ত্ত করতে পারবে তার আত্মবিকাশের পথও তত সুগম হবে।

মাতৃভাষা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম

মাতৃভাষা শিশুর জীবনের এই ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে সাহিত্য-চর্চার যথেষ্ট সুযোগ এনে দেয়। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ছাত্রদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করা এবং সাহিত্যের রসাস্বাদন করা সম্ভবপর হলেও, অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে মাতৃভাষাই সাহিত্য-চর্চার একমাত্র মাধ্যম। সেইজন্য মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ছাত্রদের মানস জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিত্য তা পারে না।

মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রভাব

বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে প্রধানতঃ সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই উভয় দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক দিক থেকে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রয়োজনীয়তা :—

যোগাযোগের মাধ্যম

সমাজজীবনে মাতৃভাষার প্রধান উপযোগিতা হল, মাতৃভাষা যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে অন্যের কাছে আমাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে পারি। তার ফলে একই ভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হয়। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত সামাজিক প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ হয় :

জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি

প্রথমতঃ, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য, নাটক, গল্প; উপন্যাস, প্রবন্ধ, মহাপুরুষদের জীবনী প্রভৃতির মধ্যে বাঙালীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, রুচি, জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সামাজিক রীতি-নীতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে ছাত্রেরা এসব বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে।

সামাজিক গুণের বিকাশ

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি, মানবকল্যাণ-কামনা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সার্থক সমাজজীবনযাপনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে এই গুণগুলির বিকাশ ঘটা খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ এগুলির অভাবে ছাত্রেরা অহংসর্বস্ব, অসামাজিক ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে।

সৎ নাগরিকতার শিক্ষা

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্যে দিয়ে ছাত্রেরা সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে নিজেদের গ'ড়ে তুলতে পারে। একজন উৎকৃষ্ট নাগরিকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, যেমন সুস্পষ্ট চিন্তাশক্তি, সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী, চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের সততা প্রভৃতি, সেইসব গুণের যথাযথ চর্চা ও বিকাশ ঘটতে পারে যদি আমরা ছাত্রদের মাতৃভাষার চর্চার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিই। এইসব গুণের বিকাশের জন্য ছাত্রদের যথাযথভাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের এবং মাতৃভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর মূল্য উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করতে হবে।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে এবং জাতীয় ভাবগত সংহতির (National Emotional Integration) পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য বিদ্যালয়ের কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার আগে ছাত্রেরা একত্র সমবেত হয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে

এবং তাদের মহাপুরুষদের বাণী থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শোনাতে হবে। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, মহাপুরুষদের জন্ম-জয়ন্তী প্রভৃতি পালন করা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয়-চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন প্রকার পুস্তক পাঠ করে ছাত্রেরা জানতে পারবে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী লোকেরা বসবাস করলেও সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এখানে একটি এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছে যার মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও ভাবগত সংহতির বীজ নিহিত আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (unity in diversity), বৈষয়িক স্বার্থ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ, বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, আত্মত্যাগ, মানবপ্রীতি, স্বাধীনতা, শান্তি ও অহিংসাপ্রীতি প্রভৃতি হল ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ চর্চার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অগ্রগতি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে যেসব অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নানাভাবে সমাজজীবনে তার প্রতিফলন ঘটে। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে এইসব প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তার ফলে সমাজের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সংযোগ

ব্যক্তিগত দিক থেকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক দিক থেকে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত দিক থেকেও মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তেমনি কিংবা তদপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তি হিসাবে ছাত্রদের আত্মবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে :

প্রথমতঃ, মাতৃভাষার চর্চার উপর ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা শক্তি ও বিচার শক্তির উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ ভাষা হচ্ছে চিন্তার বাহন। বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসাবে মাতৃভাষার যা মূল্য তার চেয়ে ছাত্রদের ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী হিসাবে তার মূল্য অনেক বেশি। কাজেই বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মাতৃভাষা চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা সরল ও সুস্পষ্ট-ভাবে অপরের কাছে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। ভাষার মাধ্যমে মৌখিক এবং লিখিত আকারে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষার

মাতৃভাষা ছাত্রদের ক্রমবিকাশের ভিত্তি

উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য মৌখিক কিংবা লিখিত আকারে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রাথমিক শর্তই হল যথাযথভাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করা।

অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে তার যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে। সাধারণতঃ ছাত্রদের মধ্যে যেসব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা থাকে সেগুলি হল, ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা; সাংগঠনিক ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা; সাহিত্য ও সৌন্দর্যপ্রীতি; হাতের কাজ, চিত্রাঙ্কন ও শিল্পকর্মের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি। মাতৃভাষার সহায়তা ছাড়া এইসব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে না।

মৌলিক চাহিদা ও সৌন্দর্য-পিপাসার পরিতৃপ্তি

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের চাহিদা, সৃজনশীলতার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সৌন্দর্য পিপাসা চরিতার্থ করার চাহিদা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটে। এই চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। বাল্যকাল ও বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রদের মধ্যে এই চাহিদাগুলি যথেষ্ট তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য ছাত্রেরা তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা ও বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করতে চায়। এর জন্য বিদ্যালয়ে বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই ছাত্রেরা এইসব বিষয়গুলিতে অংশ গ্রহণ করে এবং তার ফলে তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। তাছাড়া এইসব বিষয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য তারা যখন অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করে তখন তাদের আত্মস্বীকৃতির চাহিদাও পরিতৃপ্ত হয়। ছাত্রদের মধ্যে যে সৃজনশীলতার চাহিদা ও সৌন্দর্য পিপসা চরিতার্থ করার চাহিদা রয়েছে মাতৃভাষা ও সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে তারও অনেকখানি পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে রচনা লেখা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা, গল্প লেখা, ডায়েরী লেখা, পদ্য বা ছড়া লেখা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সৃজনশীলতার চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাদের সৌন্দর্য-পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে ছন্দের মাধুর্য এবং ভাব, ভাষা, গঠন, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির এক বিশেষ সৌন্দর্য যা ছাত্রদের মনকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক রসের জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে এবং তাদের সৌন্দর্য-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন

করতে সাহায্য করে। মাতৃভাষায় রচিত মহৎ কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করার মধ্য দিয়ে যে কেবল ছাত্রদের সৌন্দর্য পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটে তাই নয়, এর মাধ্যমে তাদের রুচিবোধ ও নৈতিক জীবনেরও উন্নতি সাধিত হয়। সৎ সাহিত্য ছাত্রদেরকে জীবনের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তারা তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং মানব-জীবনের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে ছাত্রদের মনের উপর কাব্য ও সাহিত্যের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের মানস জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্য কোন ভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য তা পারে না। কারণ, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে অন্য কোন ভাষায় মাতৃভাষার সমতুল্য বুৎপত্তি অর্জন করা সম্ভবপর হয় না।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সহায়তা

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষা বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কেবল একটি পৃথক পাঠ্যবিষয় নয়—বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়-শিক্ষার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে মাতৃভাষায় ছাত্রেরা কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছে তার উপর। সেইজন্য মাতৃভাষার ক্লাস ছাড়াও অন্যান্য বিষয় পড়াবার সময় ছাত্রেরা যাতে সঠিকভাবে মাতৃভাষার ব্যবহার শেখে শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, মাতৃভাষা কেবল শিক্ষার বাহনই নয়, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। মাতৃভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হ'ল তবেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হয়। অতএব বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার চর্চা যে খুবই প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ

ষষ্ঠতঃ, বর্তমান যুগে নিছক পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার (life-centric education) গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই শিক্ষার মূল কথা হল বিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রকার সৃজনমূলক ও যৌথ কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা জীবন সম্পর্কে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং সার্থক জীবন যাপনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করতে শিখবে। যেহেতু জীবনযাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেইজন্য জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার উপযুক্ত চর্চা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সহায়ক

সপ্তমতঃ, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। মাতৃভাষা হচ্ছে ছাত্রদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্নার ভাষা—এই ভাষার মাধ্যমেই তারা পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে—মাতৃভাষা তাদের

শোকের ভাষা, ক্রোধের ভাষা, আনন্দ-উল্লাস ও বীরত্বপ্রকাশের ভাষা। কাজেই মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের যতখানি আত্ম-অভিব্যক্তি ঘটতে পারে, অন্য কোন ভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভবপর নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা তাদের মনের সমস্ত রকম অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করতে পারে ব'লে মাতৃভাষা তাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এদিক থেকেও বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রয়োজনীয়তা খুব কম নয়।

মানসিক সুস্থতা রক্ষায় সহায়তা

৩॥ বুদ্ধি ও চিন্তা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কি? মাতৃভাষায় এই সম্পর্ক স্থাপন আরও সহজসাধ্য হয় কেন, তাহা আলোচনা করুন। [B. U B. Ed. 1963]

উত্তর ঃ বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বুদ্ধি কাকে বলে সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির যে বিভিন্নপ্রকার সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলির মধ্য থেকে বুদ্ধির সাধারণ লক্ষণগুলিকে একত্রিত করলে আমরা মোটামুটিভাবে বুদ্ধির একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, **বুদ্ধি হল এমন একটি মানসিক শক্তি যার সাহায্যে আমরা সূক্ষ্ম, জটিল ও বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ক'রে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সহজে আয়ত্ত করতে পারি, অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে সংযত ক'রে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করতে পারি।**

বুদ্ধির সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন যে প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষই কেবল চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং এই চিন্তাশক্তিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। চিন্তন বা চিন্তা-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম মতভেদ দেখা যায়। ব্যাপক অর্থে চিন্তন বলতে প্রত্যক্ষণ (Perception), কল্পনা (Imagination), স্মৃতি (Memory), অনুমান (Guessing) প্রভৃতি সমস্তরকম জ্ঞানমূলক মানসিক প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে, **কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কিংবা কোন কিছু উপলব্ধি করার জন্য আমরা যে মানসিক প্রক্রিয়ার**

চিন্তনের সংজ্ঞা

সাহায্য গ্রহণ করি তাকেই চিন্তন বা চিন্তা-প্রক্রিয়া বলা হয়। চিন্তনের সঙ্গে বুদ্ধির একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। কারণ স্টার্নের (Stern) মতে **বুদ্ধি হল ব্যক্তির একটি সাধারণ ক্ষমতা যার দ্বারা সে চিন্তনকে নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে সচেতনভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।**[১] অতএব ব্যক্তির চিন্তা-প্রক্রিয়াকে বুদ্ধি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে পরিচালিত করতে পারে।

এখন বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কের বিষয়ে একথা বলা যায় যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যে বিভিন্নপ্রকার আচরণের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে তার মধ্যে ভাষার ব্যবহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আচরণ। একজন বুদ্ধিমান ছাত্র তার সমবয়সী অন্যান্য সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ভাষা আয়ত্ত এবং ব্যবহার করতে পারে। অপর পক্ষে ক্ষীণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের ভাষা আয়ত্ত করা এবং তা ব্যবহার করার ক্ষমতাও বুদ্ধিমান ছাত্রদের তুলনায় অনেক কম।[২]

বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক

বুদ্ধি ও ভাষা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধি যেমন ব্যক্তিকে ভাষা আয়ত্ত করতে সাহায্য করে, তেমনি ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা আবার তাকে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী থারস্টোন (Thurstone) বুদ্ধির যে সাতটি উপাদানের[৩] কথা বলেছেন তার মধ্যে দুটি উপাদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি উপাদান হল—(১) বাক্যের

১। Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirements.
—Stern

২। The idiot has been defined as one who does not learn to talk. Feeble-minded children learn to talk later than normal children and gifted children talk earlier. Probably children who talk early are gifted, but not all who talk late are inferior in intelligence.
—Skinner & Harriman

৩। থারস্টোন-প্রদত্ত বুদ্ধির অন্যান্য উপাদানগুলি হল:

(ক) গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (ability to do arithmetic problems, i. e., problems relating to Number—'N');

(খ) স্মৃতি থেকে কোন নক্সা অঙ্কন করা কিংবা স্থানগত সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা (ability to draw a design from memory or to visualize relationships in space—'S');

(গ) স্মৃতিশক্তি (memory—'M');

(ঘ) বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণের ক্ষমতা (ability to see difference and similarities among objects, i. e., perceptual ability—'P');

(ঙ) কোন সমস্যার উপলব্ধি কিংবা সমাধানের জন্য মূলসূত্র কিংবা ধারণা সমূহ আবিষ্কারের ক্ষমতা অর্থাৎ বিচারশক্তি (ability to discover principles or concepts for understanding or solving problems, i. e., reasoning—'R')

অর্থ ভালোভাবে বোঝবার ক্ষমতা (ability to define and understand word, i. e., Verbal Comprehension—'V') ; এবং (২) বাক্‌পটুতা, অর্থাৎ দ্রুত ভাষার সাহায্যে চিন্তা করার ক্ষমতা কিংবা দ্রুত ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা (ability to think rapidly of words, i. e., Word Fluency—'W')। এখানে ভাষার অর্থ উপলব্ধি এবং দ্রুত ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাকে বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চিন্তন বা চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গেও ভাষার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। এই সম্পর্কের স্বরূপ ভালভাবে বুঝতে হলে চিন্তনের স্বরূপ অর্থাৎ চিন্তনকার্য কিভাবে সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। চিন্তন হচ্ছে এক ধরণের মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে হয় আমরা কোন কিছু উপলব্ধি করি কিংবা কোন সমস্যার সমাধান করি। চিন্তনকার্য কিভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে চিন্তনকার্য কেবলমাত্র আমাদের মনের সচেতন স্তরে সংঘটিত হয় না, অচেতন স্তরেও সংঘটিত হয়। সেইজন্য চিন্তন কার্যের স্বরূপ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মনের সচেতন স্তরে যে চিন্তনকার্য সংঘটিত হয় মোটামুটিভাবে তার স্বরূপ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। চিন্তনকার্য প্রধানতঃ তিনটি বাহনের সাহায্যে সংঘটিত হয়। এই তিনটি বাহন হল (১) প্রতিরূপ (image) ; (২) প্রত্যয় বা ধারণা (concept) ; এবং (৩) প্রতীক (symbol)। কোন বস্তু বারবার প্রত্যক্ষ করার ফলে মনের মধ্যে তার যে ছাপ থেকে যায় তাকেই বলা হয় মানসিক প্রতিচ্ছবি কিংবা প্রতিরূপ (image)। জন্মের পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর মনে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়। এইসব প্রতিরূপের সাহায্যে কোন বিষয় সম্পর্কে শিশু চিন্তা করতে পারে। আবার প্রতিরূপের সাহায্য ছাড়াও শিশু চিন্তা করতে পারে। শিশু যখন কোন মূর্ত বস্তু (concrete object) সম্বন্ধে চিন্তা করে তখন সে প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সে কোন বিমূর্ত ধারণা (যেমন সততা, তেজস্বিতা, মহত্ব, প্রভৃতি) সম্বন্ধে চিন্তা করতে চায় তখন কোন প্রতিরূপ তার চিন্তন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোন বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সময় চিন্তার বাহন হিসাবে কাজ করে প্রত্যয় কিংবা ধারণা (concept)। শৈশব থেকেই আমাদের মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নানারূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে ; যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কে ধারণা ; উচ্চতা, ওজন, আয়তন, গুণ, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানীরা সমস্ত রকম ধারণাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) ব্যক্তি কিংবা বস্তুবিশেষের ধারণা ; (২) জাতি বা শ্রেণীগত ধারণা ; এবং (৩) বিমূর্ত ধারণা। কোন একটি বিশেষ ধরনের প্রাণী বারবার দেখার ফলে ঐ প্রাণী সম্পর্কে জাতিগত ধারণার সৃষ্টি হয় ; যেমন, শিশু যখন প্রথম একটি 'কুকুর' দেখে তখন ঐ বিশেষ কুকুরটি প্রত্যক্ষ

চিন্তার তিনটি বাহন

করার মধ্য দিয়ে ঐ কুকুরটি সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণা জন্মে। তারপর অনেক কুকুর দেখার মধ্য দিয়ে কুকুর সম্পর্কে তার মনে একটা জাতিগত ধারণার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা গঠন এবং বিভিন্ন ধারণার সাহায্যে চিন্তন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভাষা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে ধারণা-গঠনের ব্যাপারেও ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ ধারণা গঠনের জন্য যে বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণের (synthesis) প্রয়োজন হয় তা ভাষার সাহায্যে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। মনোবিজ্ঞানী স্টাউটের মতে ভাষা ধারণাগঠন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সহায়ক।[১]

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা গঠন এবং ভাষাশিক্ষা একই সঙ্গে চলতে থাকে। কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ধারণা গঠিত হওয়ার পর ঐ ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করা কিংবা ঐ ধারণাটি অন্যের কাছে ব্যক্ত করা প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি প্রতীক (symbol) আমাদের সাহায্য করে। ভাষার অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ হল এইরূপ এক একটি অর্থবোধক প্রতীক। 'মা'—বাংলা ভাষার একটি অত্যন্ত পরিচিত শব্দ, এই শব্দটি যেমন একজন ব্যক্তির প্রতীক, তেমনি এটি একটি ভাব বা ধারণারও প্রতীক। আমরা যখন চিন্তা করি তখন আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার উপস্থিতি ঘটে। ভাষার অবলম্বন ছাড়া মনের ভিতরকার এই ভাবগুলি খুব সুস্পষ্ট আকার লাভ করতে পারে না। যে ভাষা যত উন্নত তার বিভিন্নপ্রকার ভাব বা ধারণা ধারণ ও বহন করার ক্ষমতাও তত বেশী। অতএব একথা বলা যেতে পারে যে উন্নত ভাষা উন্নত ধরনের চিন্তা করতে আমাদের সাহায্য করে। আবার একথাও সত্য যে চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করতে থাকে। উপরি উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভাষার সঙ্গে চিন্তা-প্রক্রিয়ার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা আমাদের সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করতে এবং চিন্তাকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

চিন্তার প্রধান বাহন ভাষা

ভাষার সাহায্যে আমরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিভিন্নপ্রকার ধারণা মনের মধ্যে ধ'রে রাখতে পারি এবং প্রয়োজনের সময় ভাষার সাহায্যেই আমরা ঐ ধারণাগুলি ব্যক্ত করতে পারি। 'শব্দ'-রূপ অসংখ্য প্রতীকের সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। বহু প্রাচীনকালে মানুষ অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। তারপর ধীরে ধীরে নানাবিধ অর্থবোধক শব্দের আবিষ্কারের মাধ্যমে বাচিক ভাষার (word language) প্রচলন হল। প্রথম অবস্থায় ভাষার কেবলমাত্র কথ্যরূপ প্রচলিত ছিল। পরে ভাষার লিখিতরূপ আবিষ্কৃত হল। কোন কোন ভাষার (যেমন প্রাচীন মিশরীয় ভাষা) প্রাচীন বর্ণমালা বিভিন্ন বস্তুর ছবি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মানব সভ্যতার বিকাশে ভাষার অবদান যে অসামান্য সেকথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। মানুষের চিন্তা-প্রক্রিয়ার প্রধান ধারক

ভাষার কাজ

১। Stout-এর মতে ভাষা হল 'an instrument of conceptual analysis and synthesis.'

ও বাহক হিসাবে ভাষা অতীতের অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতিকে সংরক্ষিত করে সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল যুগ-যুগান্তর ধ'রে সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আসছে।

বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষার যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে উপরি উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমাদের মাতৃভাষায় এই সম্পর্ক স্থাপন আরও সহজসাধ্য হয় কেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। জন্মের পর থেকে শিশু যে ভাষা-পরিবেশে (language-environment) বাস করে তা হল তার মাতৃভাষা। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং সেইসঙ্গে সে ধীরে ধীরে মাতৃভাষাও আয়ত্ত করতে থাকে। মাতৃভাষার শব্দসম্ভারের সাহায্যেই শিশু তার পরিবেশের অন্তর্গত যাবতীয় দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুকে চিহ্নিত করে। তার জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে যেসব ধারণা গঠন করে মাতৃভাষার অন্তর্গত শব্দসমূহের সাহায্যে সে সেগুলি মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই সে তার মনোভাব, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। এইভাবে দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে শিশুর বুদ্ধি ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে মাতৃভাষার একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়। শিশুর জীবনযাপন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজন মাতৃভাষার মাধ্যমে সিদ্ধ হয় ব'লে তার বুদ্ধি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক অতি সহজেই গ'ড়ে উঠতে পারে। শিশু তার জীবনের অধিকাংশ সময় তার মাতৃভাষা-পরিবেশের মধ্যে বাস করে বলেই মাতৃভাষায় উপরি উক্ত সম্পর্ক-স্থাপন খুব সহজসাধ্য হয়।

মাতৃভাষার উপযোগিতা

॥ শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা ॥

৪॥ শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করা কতখানি যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1977, '75, '73, '71]

অথবা, সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? ইহা প্রচলন করিবার পথে বাধাগুলি আমরা কিভাবে অপসারণ করিতে পারি।

[B. U. B. Ed. 1972]

উত্তর : বর্তমান যুগে মাতৃভাষাই যে সর্বস্তরের শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন সেকথা আজ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও বহুদিন হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার প্রচলন হয়েছে। উচ্চশিক্ষার স্তরে নীতিগতভাবে অনেকে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিলেও এখনও পর্যন্ত কিছু সনাতনপন্থী ও স্বার্থান্বেষী শিক্ষাবিদ

ভূমিকা

প্রধানতঃ মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা তুলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যাপারটিকে বিলম্বিত করতে চাইছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার আগে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার প্রশ্নটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম কি হবে সে সম্পর্কে নানারকম তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল সেখানেও ভাষা-মাধ্যমের প্রশ্নটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, আর পাশ্চাত্যবাদীরা ছিলেন ইংরাজী ভাষার পক্ষে। তবে উভয় মতবাদীরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে দেশীয় ভাষাগুলি তখনও শিক্ষার বাহন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। ১৮৩৫ সালে মেকলের সুপারিশ অনুযায়ী ইংরেজ সরকার ইংরাজীকে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার পর শিক্ষার জগতে ইংরাজী ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য শুরু হল। মেকলে বলেছিলেন যে ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে এসে আমাদের দেশের আধুনিক মাতৃভাষাগুলির উন্নতি ঘটবে এবং ভবিষ্যতে এই ভাষাগুলিই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের বিভিন্ন মাতৃভাষাসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ইংরেজ শাসনের আমলেই মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে ১৯৩৭ সালের আগে মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী ভাষাই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তারপর ইংরাজীর পরিবর্তে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার স্তর থেকে ইংরাজী ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা সম্ভবপর হয়নি।

মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার স্বীকৃতি

এখন শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করা কতখানি যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক মাধ্যম হল তার মাতৃভাষা। আবার মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সবচেয়ে অল্পায়াসে আয়ত্ত করতে পারে। কাজেই মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হ'লে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের পথে এক গুরুতর বাধার সৃষ্টি হয়। বিদেশী ভাষা যে কেবল শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে তাই নয়, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে সে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না ব'লে বাস্তবক্ষেত্রে সে তার

প্রয়োগও ঘটাতে পারে না। কাজেই বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলা ভাষা কিংবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দগত, উচ্চারণগত, পদবিন্যাসগত ও ভাবগত মিল প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হলে ছাত্রদের কেবলমাত্র মুখস্থবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ফলে যা কিছু তারা শিক্ষা করে তার সঙ্গে তাদের ভাবনা-চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে, "ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।...বাঙালি কখনই ইংরাজী ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।" [শিক্ষার হেরফের]

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার যুক্তি

মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হ'লে শিক্ষার মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার ঘটবে তার ফলে শিক্ষা আর কেবলমাত্র শুষ্ক পুঁথিগতবিদ্যার চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার মধ্য দিয়ে আমরা যেসব সুফল লাভ করতে পারি সেগুলি হল :—

প্রথমতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হ'লে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শিক্ষার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ থাকে না—সে শিক্ষার ব্যবহার কেবল অফিস, কাছারি, দলিল-দস্তাবেজ, কেরানির ফাইল ও বড়-সাহেবের নির্দেশনামার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে "উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আল্‌নায় ঝোলানো থাকে ; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি।" [রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষার বাহন]

দ্বিতীয়তঃ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটো পদার্থ জীবন হইতে

বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, একথা অতি পুরাতন।" [শিক্ষার হেরফের] একথা বলা বাহুল্য যে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই চিন্তা ও কল্পনার সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে সময়ের অযথা অপচয় বন্ধ করা যায়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে ছাত্রদের সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদেশী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করাও সম্ভবপর হয় না। ফলে শিক্ষালাভের জন্য তারা যে পরিমাণ পরিশ্রম করে তার তুলনায় তারা শিক্ষা অর্জন করে অনেক কম।

চতুর্থতঃ, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে ছাত্রদের মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার এবং ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উন্নতি ঘটে। ছাত্রদের মানসিক পুষ্টি ও চিত্তের প্রসারের জন্য প্রয়োজন তাদের আত্মপ্রকাশের চাহিদার পরিতৃপ্তি এবং অপরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার সুযোগ। মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা সবচেয়ে ভালভাবে আত্মপ্রকাশ ও ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। সেইজন্য শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হ'লে ছাত্রদের মানসিক পুষ্টি ও চিত্তের প্রসার ঘটে। এছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় ব'লে তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রেরও উন্নতি ঘটে। "বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

[রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষার হেরফের]

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হ'লে ছাত্রদের পক্ষে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ছাত্রেরা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তারফলে বাস্তবক্ষেত্রে ঐ জ্ঞানকে তারা সহজেই কাজে লাগাতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য রসাস্বাদনের ক্ষমতা, উন্নত রুচিবোধ এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়। মাতৃ-ভাষায় রচিত সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি পাঠ ক'রে ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ গ'ড়ে ওঠে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্তরাত্মার সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ ঘটে। সাহিত্য ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও অতীত সংস্কৃতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগায়। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় রচিত সাহিত্য ছাত্রদের জীবনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কারণ ছাত্রদের কাছে

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার অন্তর্গত শব্দগুলি যে আবেগমূল্য (emotional value) অর্জন করেছে, বিদেশীভাষার শব্দগুলির কখনই সে আবেগমূল্য থাকতে পারে না।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করলেও এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার স্তর থেকে ইংরাজী ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা সম্ভবপর হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চশিক্ষার স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিনা তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানারূপ তর্কবিতর্ক চলেছে এবং এখনও চলছে। বেশ কিছুদিন হ'ল সাধারণ ডিগ্রী স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের বিকল্প মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হলেও সাম্মানিক ডিগ্রী স্তর ও স্নাতকোত্তর স্তরে এখনও পর্যন্ত ইংরাজীকেই শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে রাখা হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তারপর দীর্ঘ একত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ ব্যাপারে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি। কাজেই এক্ষেত্রে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে সেগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার অবস্থা

ইংরাজীকে যাঁরা উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধ'রে রাখতে চান তাঁদের বক্তব্য হল মাতৃভাষায় এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান, দর্শন, কারিগরি ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে উপযুক্ত গ্রন্থ রচিত হয়নি। কাজেই যতদিন পর্যন্ত এই অভাব দূরীভূত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তাছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রেরা শিক্ষাগ্রহণ ক'রে থাকে বলে ইংরাজীই হচ্ছে শিক্ষাদানের উপযুক্ত মাধ্যম। মাতৃভাষায় রচিত উপযুক্ত পুস্তকের অভাব সম্পর্কে ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

উপযুক্ত বই-এর অভাব সম্পর্কে বক্তব্য

"বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।" আজ থেকে বহুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি মনীষীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা ক'রে একথা প্রমাণ করেছেন যে বাংলা ভাষায় মাধ্যমেও উন্নত ধরনের বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে উন্নত ধরনের বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখা যায় না বলে মনে করেন তাঁরা মাতৃভাষাও ভাল ক'রে জানেন না এবং বিজ্ঞানকেও তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারেন নি। **আসল কথা হল, ভবিষ্যতে যখন আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি হবে তখন আমরা তার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবো—এই মনোভাব নিয়ে যদি আমরা ব'সে থাকি তাহলে কোনদিনই আমাদের মাতৃভাষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে না। তার পরিবর্তে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ ক'রে বাস্তবক্ষেত্রে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হবে সেগুলি দূর করার ব্যবস্থা করলেই এ ব্যাপারে আমরা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হব।** এর সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত মানের গ্রন্থ রচনার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগগ্রহণ ও অর্থ সাহায্য করতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় পরিভাষা সংক্রান্ত সমস্যাটির সমাধানের জন্য আমরা প্রাচীন ভারতীয় ভাষা কিংবা বিদেশী ভাষায় সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। যেমন 'টেবিল', 'চেয়ার' প্রভৃতি সাধারণ ইংরাজী শব্দগুলিকে আমরা আমাদের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছি, তেমনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য যদি আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজী পরিভাষাকে সরাসরি গ্রহণ করি তাহলে তার দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে। আশার কথা এই যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত ধরনের পুস্তক রচনার জন্য শিক্ষকদের নানাভাবে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা করেছেন।

বাধাগুলি অপসারণের উপায়

বর্তমানে আমরা আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায় তার জন্য আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সর্বজনীন শিক্ষার একটি প্রধান শর্তই হল মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সেইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব মাতৃভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করাই হবে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

উপসংহার

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত জাপানের দৃষ্টান্ত :

"আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিবনা যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা চোখতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

"অথচ, জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধি-বৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ সিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।" [শিক্ষার বাহন : ১৩২২]

* * *

"জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা ক'রতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশের বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

"আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্খাও দরিদ্র।" [বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ১৯৩২]

২। পরিভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ :

"বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু পা'ও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আব্দার করি কোন্ লজ্জায়?"

[শিক্ষার বাহন : ১৩২২]

৩। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত:

"অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে, সাহস করে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।" [বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ১৯৩২]

৪। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত বক্তব্য তাঁর 'জীবন স্মৃতি' এবং 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ', 'ছাত্র সম্ভাষণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। নিচে ঐ প্রবন্ধগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল যেগুলি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হলেও আজও শিক্ষার উন্নতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য:

"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে। তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদক বস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন

চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরাজী পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত মেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"

* * *

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"

* * *

আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না।

* * *

এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।"

* * *

"বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি-কেন, ফরাসি, জার্মান শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?"

* * *

"এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যে জন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য?

* * *

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

* * *

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।"

* * *

ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সঙ্কল্প চাই।

* * *

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।"

* * *

"ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোটবইয়ের শাসন, আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?"

* * *

যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও একসময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানিনে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয়, 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেসটিজ-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

* * *

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজিশিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।"

৫। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) অভিমত:

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়টি কমিশন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। কমিশন এ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রশ্নটির সঙ্গে ভাবপ্রবণতা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিবেচনা করা কষ্টকর।

দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারতীয় ভাষার সাহায্যে ইংরাজীকে অপসারণ করা সম্পর্কে জাতীয় দাবী ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিদেশী ভাষার আধিপত্য জাতির আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী ব্যক্তিরা আশা করেছিলেন যে শীঘ্র প্রাদেশিক যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তাদের

যখন বলা হল প্রশ্নটি বেশ জটিল এবং এর আশু সমাধান সম্ভব নয়, তাঁরা কিছুটা বিস্মিত ও আহত হলেন।

এই সমস্যার জটিলতা নিহিত আছে ভারতের আয়তন ও জনসমষ্টির চরিত্রের মধ্যে। পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাষার বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারটি বেশ জটিল।

ভারতে উপভাষার সংখ্যা অজস্র হলেও সাহিত্য সম্পদ বিশিষ্ট প্রধান ভাষাসমূহ যেগুলি শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার দাবী রাখে, তাদের সংখ্যা বারটির বেশী নয়। হিন্দী ভাষার পিছনে অধিক জনসমর্থন থাকায় ঐ ভাষার স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে ঐ ভাষা যাতে উন্নত ধরনের চিন্তাধারা প্রকাশের বাহন হতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে হিন্দী ভাষা আইন, বিচার বিভাগ কিংবা শাসনকার্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতালাভ করেনি। এইসব কাজের জন্য হিন্দী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে। অপরপক্ষে আমাদের দেশের ঐক্য গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে অনেকাংশে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে। ইংরাজী ভাষার অবর্তমানে আবার পূর্বেকার বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। উপরন্তু, আধুনিক সভ্যতার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে পরিচিতি, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষা আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে। তাছাড়া ইংরাজী হল আন্তর্জাতিক ভাষা এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী বিশ্বজনীন ভাষায় (world language) পরিণত হবে। এইসব কারণে ইংরাজী ভাষার চর্চা আমাদের বন্ধ করলে চলবে না।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার পর কমিশন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে যে সুপারিশগুলি করেন তা হল :

(ক) রাষ্ট্রভাষাকে বিভিন্নভাবে তার শব্দভাণ্ডারের উন্নতি ঘটাতে হবে।

(খ) **আন্তর্জাতিক কারিগরি ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিভাষা গ্রহণ করতে হবে।**

(গ) **উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে।**

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রকে তিনটি ভাষা জানতে হবে —(১) আঞ্চলিক ভাষা ; (২) রাষ্ট্রভাষা এবং (৩) ইংরাজী।

(ঙ) রাষ্ট্রভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **ভাষার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের নিয়ে একটি বোর্ড করতে হবে।** এবং প্রাদেশিক সরকারকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে, ডিগ্রী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যাতে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারি।

৬। (ক) **শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনের (১৯৫২-৫৩) অভিমত :**

সাধারণভাবে একথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে শিশুর শিক্ষারম্ভের সময় মাতৃভাষাই হল সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যম। বিভিন্ন বিদেশী ভাষার মত আঞ্চলিক ভাষাগুলিও যদি যথেষ্ট উন্নত হত তাহলে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরেই শিক্ষার মাধ্যম হতে পারত। যেহেতু আঞ্চলিক ভাষা একটি অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীদের ব্যবহারের ভাষা, সেইজন্য সেই ভাষা শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। কোন অঞ্চলে যেখানে খুব ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠী নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সেখানে ঐসব ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। তবে যেখানেই সম্ভব হবে সেখানেই ঐসব সম্প্রদায়কে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ দেবার চেষ্টা করতে হবে।[১]

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে ১৯৩৭ সালের আগে মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী ভাষাই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তারপর ইংরাজীর পরিবর্তে মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য—(১) যে-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা ইংরাজী সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে রাখতে দেওয়া হয় এবং (২) যেসব ছাত্রকে তাদের পিতামাতার চাকরীর সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয় এবং যারা সহজে একটি নতুন আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না তাদের জন্য কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়।

১। "It is ordinarily accepted that the mother-tongue is the most suitable language as a medium of instruction for the child beginning its study. If the same advance had taken place in regional languages as has taken place in many foreign languages, mother-tongue or regional language would have been the medium of instruction at all stages of the educational ladder. As the regional language is likely to be the language used by the majority in the region it is desirable to acquire knowledge of this language, In view of the difficulties in particular regions to cater to the needs of very small groups and the paucity of teachers of the particular language linguistic minorities isolated in different regions who would not come under the provisions of the Resolution passed by the Central Advisory Board of Education in this behalf may have to adopt the regional language as the medium of instruction. However, we have already referred to the provision in some states for linguistic minorities to be given the option of having their children taught through the mother-tongue, and we believe this is a wise policy in the general interest of all concerned."

—Report of the Secondary Education Commission (1952-53)

(খ) মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনের (১৯৫২-৫৩) অভিমত:

বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ভাষা পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যে মাতৃভাষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। একথা বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন এইজন্য যে, অতীতে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ ও শিক্ষাবিদদের একটি বৃহৎ অংশ মোটেই সচেতন ছিলেন না এবং এখনও তাঁরা যথেষ্ট সচেতন নন। যেসব শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব সামান্য তাঁদের মাতৃভাষা পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হত। মাতৃভাষা শিক্ষার অর্থ এই নয় যে ছাত্রেরা কেবল মাতৃভাষা পড়তে ও লিখতে শিখবে এবং তাদের শব্দভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটবে। ছাত্রদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব-গঠনের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা হ'ল সবচেয়ে কার্যকরী এবং ব্যাপক একটি মাধ্যম। **একজন ভাল শিক্ষক মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করার শিক্ষা দিতে পারেন,** যা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির অন্যতম। **তিনি ছাত্রদের প্রাঞ্জল এবং সুনির্বাচিত ভাষায় আত্মপ্রকাশের শিক্ষা দিতে পারেন**—এর দ্বারা কেবল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে তা-ই নয়, এটা সফল গণতান্ত্রিক নাগরিকতারও একটা আবশ্যকীয় গুণ। **তিনি ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য রসাস্বাদনের ক্ষমতা ও উন্নত রুচিবোধ সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদের আবেগ-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিতে পারেন।** সাহিত্য হল চরিত্র-গঠনের শিক্ষার একটি মাধ্যম। সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি পাঠ করে ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ গ'ড়ে ওঠে, সাহিত্যের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। সাহিত্য আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তোলে এবং অতীত সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগায়। কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়েই কেবল উপরি উক্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ হতে পারে। এই দিকগুলি হল—পঠন, লিখন ও কথনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, জীবনের দর্পণ হিসাবে সাহিত্য পাঠ ও তার রসাস্বাদন; কেবল পাঠ্যপুস্তকের চর্চা না ক'রে ছাত্রদের উপযুক্ত অন্যান্য উৎকৃষ্ট ধরনের বই পড়বার অভ্যাস গঠন এবং ব্যাকরণ ও শব্দের পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে সাহিত্যপাঠের আনন্দকে হত্যা না ক'রে আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা করা। যদি উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা এইরূপ উদ্যোগ নিয়ে মাতৃভাষা শেখানোর কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটতে পারে।

৭। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) অভিমত:

শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে কি স্থান দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে ঐ ভাষাগুলির বিকাশের ব্যাপারটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার মাধ্যম এমন হবে যা ছাত্রদের সুবিধাজনকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে

সাহায্য করবে, তাদের সুস্পষ্টভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে সাহায্য করবে এবং তাদের সঠিকভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এই দিক থেকে বিচার করলে, মাতৃভাষার দাবী সর্বাগ্রে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার সময় **রবীন্দ্রনাথ** এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন :

"ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ছাত্রের ভাষার সঙ্গে শিক্ষার ভাষার এ রকম বিচ্ছেদ দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে জাপানের দীক্ষা নেওয়ার ঘটনার পর এখনও একশ বছর অতিক্রান্ত হয়নি। প্রথমে জাপানকে বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করা। এর কারণ জাপান তার নাগরিকদের কিছু নির্বাচিত অংশের শোভা বৃদ্ধির জন্য এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেনি, সকল নাগরিককে শক্তি ও সংস্কৃতি (power and culture) দেবার জন্যে সে এই শিক্ষাকে তার দেশের সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল। পাশ্চাত্য কলা ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য (যে ব্যুৎপত্তি তাকে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় সরবরাহ করেছিল) এবং বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য জাপান সমস্ত রকম কষ্ট স্বীকার করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বিদেশী ভাষার বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে তা সহজে লাভ করতে না পারার কৃপণসুলভ নির্বুদ্ধিতা সে করেনি।"

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে ছাত্রদের মুখস্থ করার উপর সমস্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। উপরন্তু, উন্নত শিক্ষানীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম সাধারণতঃ একই হওয়া উচিত। ১৯৩৭ সালের পূর্বে এ ব্যাপারে একটা সামঞ্জস্য ছিল। কারণ তখন স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। যেহেতু বিদ্যালয় স্তরে আমরা সঠিকভাবেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে গ্রহণ করেছি, সেইজন্য উচ্চশিক্ষার স্তরেও আমাদের সেগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

আবেগমূলক সংহতি সমিতির (Emotional Integration Committee) মতে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলির ব্যবহার জাতীয় সংহতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংহতি সংসদ (National Integration Council : June 1962) এই মত সমর্থন করে বলেছেন, 'শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করা যতটা সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক দিক থেকে প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন বিষয়বস্তুকে বোঝা এবং উপলব্ধি করার শিক্ষাগত উপযোগিতার দিক থেকে। দেশের মধ্যে যে প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় আছে তার বিকাশ ব্যাহত হবে

যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ব্যবহার করা না হয়।

আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শিক্ষায় মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের লক্ষ্য হলেও, আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এর অর্থ ইংরাজীকে বাদ দেওয়া নয়। বস্তুতঃ, 'পাঠাগার ভাষা' হিসাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেই। ইংরাজীতে কিছুটা দখল না থাকলে কোন ছাত্রকে এম. এ. ডিগ্রী লাভের উপযোগী ব'লে বিবেচনা করা উচিত নয়। একথার মধ্যে দুটি বক্তব্য নিহিত আছে : উচ্চ শিক্ষাস্তরের সমস্ত শিক্ষককে আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরাজী এই দুটি ভাষায় শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং এই স্তরের সমস্ত ছাত্র, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরাজীতে বক্তৃতা শোনা ও বই পড়ায় অভ্যস্ত হতে হবে।

যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে, শিক্ষার মাধ্যমের জটিলতার জন্য তাদের অগ্রগতি যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ছাত্র যখন কলেজে প্রবেশ করে তখন সে দেখে যে কলেজে স্কুলের তুলনায় তার বোঝবার ও মনঃসংযোগ করবার অনেক বেশি ক্ষমতার প্রয়োজন হচ্ছে। এর সঙ্গে যদি হঠাৎ শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তনজনিত অসুবিধার মধ্যে তাকে পড়তে হয় তাহলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং পড়াশুনায় তার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য নিম্ন-স্নাতক স্তরের প্রথমদিকে বেশি পরিমাণে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষার উপর ছাত্রের দখল বৃদ্ধি পেলে, শ্রেণীকক্ষে ইংরাজীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়াতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে এখনও আরও কিছুদিন পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে ইংরাজীর প্রাধান্য থাকবে।

* * *

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতিকল্পে ভাষাচর্চার উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র (Centre of Advanced Study) স্থাপন করতে হবে যাতে ঐ ভাষাগুলি উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

* * *

আমরা নিশ্চিতভাবে এই অভিমত পোষণ করি যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কোন ভাষা আবশ্যিকভাবে শেখানো উচিত হবে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষাগুলি ঐচ্ছিকভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আবশ্যিকভাবে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হলে অতিরিক্ত বোঝার চাপে প্রয়োজনীয় 'বিষয়গুচ্ছ'গুলির (Combination of subjects) শিক্ষা ব্যাহত হবে। আমরা দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি যে, একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন-স্নাতক স্তরে মোট প্রাপ্য সময়ের শতকরা ৫০ ভাগ কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় একথা সুস্পষ্ট যে, প্রধান বিষয়গুলির শিক্ষা এর ফলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার মানও অনুন্নত থাকে।

৮। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে :

ভারতীয় সংবিধানে ১৫টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটিই সাহিত্য ও ভাষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে উন্নত। এগুলি ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে আরও ৭২০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলির কোনটিই এক লক্ষের বেশি লোকের ভাষা নয়। এই ভাষাগুলি অনুন্নত এবং কোন কোনটির আবার লিপি পর্যন্ত এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এইসব কারণে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। **কোঠারি কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা।** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রোমান হরফ কিংবা আঞ্চলিক ভাষার হরফ ব্যবহার ক'রে এই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে। এই সময় তারা মুখে মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার শিখবে। তারপর তৃতীয় শ্রেণী থেকে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৫॥ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্পর্কেও আপনার অভিমত সর্বাংশে প্রযোজ্য কিনা তাহা যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করুন।
[C.U. B.T. 1966]

অথবা, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
[N.B. U. B. T. 1969]

উত্তর : ১৯৩৭ সাল থেকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়েছে ঐ সময় থেকেই। পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন অবশ্য আরও পরের ঘটনা। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৯৩৭ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে স্বাধীনতা-লাভের পর সুদীর্ঘ তিনটি দশক অতিক্রান্ত হলেও আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের প্রবণতা সমাজের বিত্তবান সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বেশি পরিমাণে

পরাধীন ভারতে মাতৃভাষার স্বীকৃতি

দেখা দিয়েছে যে ইংরাজী-মাধ্যমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় সেইসব মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে যাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মত যোগ্যতা রয়েছে; অর্থাৎ যেসব ভাষা যথেষ্ট উন্নত, যেমন বাংলা ভাষা। কারণ একথা বলাই বাহুল্য যে অনুন্নত কোন ভাষার শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা যে শিক্ষা লাভ করে তার দ্বারা তার প্রকৃত মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটতে পারে। মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই ছাত্রদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে তারা যদি শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহলে তাদের চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। তার ফলে একদিকে তারা যেমন শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ (assimilate) করতে পারে, অপরদিকে সেই জ্ঞানকে তারা বাস্তব জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজেও লাগাতে পারে। অপরপক্ষে কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা যে শিক্ষা লাভ করে তাকে কখনই তারা পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করার সময় অধিকাংশ ছাত্রকে মুখস্থবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে পরীক্ষায় সাফল্য হয়তো অর্জন করা যায়, কিন্তু অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এবং শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছাত্রসম্ভাষণ' নামক প্রবন্ধে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা এবং বিদেশী ভাষার অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?"

রবীন্দ্রনাথের মত

যে-কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয় এইজন্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তিতে অধিকাংশ নাগরিকের বিধিবদ্ধ শিক্ষার (formal education) শেষ হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ছাত্রদের যাতে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও স্বচ্ছ বিচার শক্তির বিকাশ ঘটে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দ্বারাই কেবলমাত্র ছাত্রদের মধ্যে এইজাতীয় চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর। এছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়; ছাত্রদের মানসিক পুষ্টি ও চিত্তের প্রসার ঘটে; তারা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা লাভ করতে পারে; তাদের পক্ষে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হয় এবং তাদের সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রহের প্রকৃত বিকাশ ঘটে।

স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ

মাতৃভাষাকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয় হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য যে-কোন বিষয় চর্চা করার সময় ছাত্রেরা যাতে তাদের ধারণাকে মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ (appropriate) ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ মাতৃভাষার ক্লাশ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় পড়াবার সময় ছাত্রেরা যাতে সঠিকভাবে মাতৃভাষার ব্যবহার করতে শেখে শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। কারণ মাতৃভাষা কেবল শিক্ষার বাহনই নয়, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। মাতৃভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে তবেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হয়। এইদিক থেকেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে মাইকেল ওয়েষ্ট (Michael West) বলেছেন, "বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করে। অতুলনীয়, কারণ ইহা মৌলিক। মাতৃভাষার উপর অন্যান্য প্রত্যেকটি বিষয়ের সাফল্য নির্ভর করে। মাতৃভাষার উপর শিক্ষার সামগ্রিক ফলাফলও নির্ভর করে।[১]

অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রভাব

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কেবল শিক্ষার বাহন হিসাবেই মাতৃভাষা একান্ত অপরিহার্য। এটা খুবই বাঞ্ছনীয় যে ছাত্রেরা যে-ভাষায় শিক্ষালাভ করবে সেই ভাষাতেই তারা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেবে। যেহেতু শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট, পরীক্ষার বাহন হিসাবেও যে তা সর্বোৎকৃষ্ট হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। কোঠারী কমিশন শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম একই ভাষা করার পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন, "We would like to emphasize that the medium of classroom commu-

১। "The mother-tongue occupies a unique position in the school curriculum. It is unique because it is fundamental: on it depends the efficiency of every other subject; on it depends the efficiency of the total result of the education."

—Michael West.

nication and examination should generally be the same.")। পরীক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে-কোন ভাষা হলে ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয়গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু নিছক মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না। মুখস্থ বিদ্যার কুফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট-বুক সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।" পরীক্ষার সাহায্যে যদি আমরা, ছাত্রেরা যে শিক্ষা লাভ করেছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে চাই তাহলে অবশ্যই মাতৃভাষাকে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষার বাহন হিসাবে উপযোগিতা

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবেও আমাদের মাতৃভাষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ১৯৭৪ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমেই এই বিষয়গুলির শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই এই বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। ১৯৭৪ সালের পূর্বে যে একাদশ-শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেখানে ঐচ্ছিক বিষয়গুলিকে সাতটি পাঠপ্রবাহে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 'বিজ্ঞান'—পাঠপ্রবাহে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় যেমন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমেই ১৯৫৭ সাল থেকে এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল; যদিও সে সময়ে মাতৃভাষায় রচিত এই স্তরের উপযোগী বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির পাঠ্যপুস্তক ছিল না বললেই চলে। মূলতঃ ষাটের দশকের গোঁড়া থেকেই বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু হয়। তারপর দুটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। প্রথমদিকে পরিভাষা সংক্রান্ত যে অসুবিধা ছিল তা বেশীর ভাগই কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। ইতিপূর্বে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যখন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চা করতে হত তার তুলনায় মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চা করতে ছাত্রেরা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে এবং পূর্বের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার অধিকতর প্রসার ঘটছে। এরদ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা প্রমাণিত হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষা

॥ পাঠক্রমে মাতৃভাষার স্থান ॥

৬॥ শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1974]

অথবা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান কোথায় আলোচনা করুন। [K. U. B. T. 1966]

উত্তর ঃ পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ছিল একান্তভাবে অবহেলিত। তখন ইংরাজী ভাষার আধিপত্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষাগুলির চর্চা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেও ইংরাজী ভাষার প্রভূত্ব ছিল বিস্ময়কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মাতৃভাষা ও ইংরাজীর অক্ষর-পরিচয় একই সঙ্গে করতে হত! ফলে শিক্ষারম্ভের সূচনা থেকেই একটি বিদেশী ভাষার চাপে ছাত্রেরা কখনই মাতৃভাষা চর্চা করার পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ লাভ করত না। ইংরেজ আমলের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে খর্ব করার এই চক্রান্ত খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারণ ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসনযন্ত্রকে চালু রাখবার জন্য ইংরেজী-জানা কিছু কেরানী ও রাজকর্মচারী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রতি ছিল তাদের ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার মনোভাব।

পরাধীন ভারতে ইংরাজীর প্রভূত্ব

ইংরেজ আমলেই কিন্তু ভারতীয় মনীষীরা মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যে নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহন রায় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি বাংলা ভাষারও উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুসরণ করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মনীষীরা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এদেশে জাতীয় চেতনার দ্রুত প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ বাংলাদেশকে কেন্দ্র ক'রে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল তার দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল—শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে স্বাধীনতা-লাভের পূর্বেই আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার স্থান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একথা

পরাধীন ভারতে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যে গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাতৃভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ছাত্রেরা যাতে যথাযথভাবে মাতৃভাষার চর্চা করতে পারে তারজন্য গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা রাখেন নি। কিন্তু জাতীয় নেতৃবৃন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের পূর্বেই একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় সরকার ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নয়। তবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার ১৯৩৭ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার মূল্য উপলব্ধি করতে জনসাধারণকে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে পরাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার অতিরিক্ত প্রভুত্বের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা তার যোগ্য মর্যাদা কখনই লাভ করতে পারেনি।

স্বাধীনতালাভের পর আশা করা হয়েছিল যে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা তার প্রকৃত মর্যাদা লাভ করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। স্বাধীনতালাভের পর প্রায় দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে ইংরাজীর জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫০ নম্বর (তিনটি পত্র); আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০০ নম্বর (দুটি পত্র)। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের দায়িত্ব ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ত যেসব শিক্ষাবিদ ও আমলাদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মাতৃভাষার জন্য এঁরা যে কেবল ইংরাজীর তুলনায় কম নম্বর বরাদ্দ করেছিলেন তা-ই নয়, দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকার ফলে এবং চাকুরি লাভের সুবিধার জন্য জনসাধারণের মনে ইংরাজী ভাষার প্রতি যে একটা অতিরিক্ত মোহ সৃষ্টি হয়েছিল, এইসব শিক্ষাবিদেরা তা দূর করার জন্য সক্রিয় কোন আন্দোলনেরও সূত্রপাত করেন নি।

স্বাধীন ভারতে মাতৃভাষার অবহেলা

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছিল যে "হিন্দী হবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা এবং সংবিধান চালু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ইংরাজী ভাষা যেমন সমস্ত সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা তেমনি চালু থাকবে।"[১] এইভাবে স্বাধীনতালাভের পর দেশীয় নেতৃবৃন্দ ইংরাজী ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে হিন্দী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ১৫ বছর সময় চেয়েছিলেন। সংবিধানের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা সূত্রের

১। "That the official language of the union shall be Hindi and that for a period of 15 years from the commencement of the constitution English language shall continue to be used for all official purposes of the union for which it was being used immediately before such commencement,"—The Constitution of India.

উদ্ভব হয়। এই সূত্র অনুযায়ী স্থির হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রদের তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে এই তিনটি ভাষা হবে—হিন্দী (মাতৃভাষা), ইংরাজী ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (দক্ষিণ ভারতের কোন একটি ভাষা হলে ভাল হয়); আর অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে এই তিনটি ভাষা হবে—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, ইংরাজী ও হিন্দী।

ত্রি-ভাষা সূত্র

আমাদের দেশে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে মোট কয়টি এবং কি কি ভাষা শেখানো হবে তা নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকায় এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে উপরিউক্ত ত্রিভাষা সূত্রটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়নি। তারফলে বিভিন্ন প্রদেশে মাতৃভাষার চর্চা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি অবশ্য বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে আছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঐসব রাজ্যগুলি ইংরাজী ভাষার প্রাধান্যকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে ভাষাশিক্ষার সমস্যাটির দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু সমাধান না ঘটায় এখানে মাতৃভাষা শিক্ষার মান ক্রমশই নিম্নগামী হয়ে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা ভাষাকে একমাত্র ভাষা হিসাবে রাখা হলেও তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছাত্রদের উপর ইংরাজী ভাষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার চর্চা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ফ্রান্স, জাপান, মিশর, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি যেসব দেশে বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে কোথাও চার বছর-ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হলে ইংরাজী ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করা হয় না। কাজেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে যদি পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে। এই সুযোগকে ভালভাবে কাজে লাগিয়ে সুযোগ্য শিক্ষক এবং উন্নত শিক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে যদি প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিকভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ ঘটবে এবং তারা পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করতে এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি ভাষা আয়ত্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপযুক্ত-ভাবে মাতৃভাষা শিক্ষার উপরে একদিকে যেমন শিশুর চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, সৌন্দর্যানুভূতি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, মননশক্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলির উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে, অপরদিকে তেমনি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলির শিক্ষার অগ্রগতিও বিশেষভাবে নির্ভর করছে ছাত্রেরা মাতৃভাষা কত

প্রাথমিক স্তরে মাতৃ-ভাষার স্থান

ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে তার উপর। কাজেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা চর্চার উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং উন্নতধরণের পাঠ্য-পুস্তক, মনস্তত্বসম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতি ও সুযোগ্য শিক্ষকের সাহায্যে ছাত্রদের মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত্তি যাতে সুদৃঢ় হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে) একসময় ছাত্রদের মাতৃভাষা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী—এই চারটি ভাষা শিখতে হত। এই ভাবে ভাষা শিক্ষার বিষয়টি তথাকথিত শিক্ষাবিদদের নির্বুদ্ধিতা অথবা দুরভিসন্ধির ফলে ছাত্রদের উপর একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। এর মারাত্মক ফল হয়েছিল এই যে অন্যান্য ভাষাগুলির জন্য সময় দিতে গিয়ে ছাত্রেরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং শিক্ষকসমাজ ও জনসাধারণও মাতৃভাষা-শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকায় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে সোচ্চার হন নি। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ভাষার সংখ্যা তিনটিতে এসে দাঁড়ায়—মাতৃভাষা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত অথবা হিন্দী। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে দুটি ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে এবং আধুনিক শিক্ষাবিদদের মত মাধ্যমিক স্তরে দুটির বেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। আমাদের দেশে এই নিয়ম অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলে মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেত এবং তারফলে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের শিক্ষার মান অনেকখানি উন্নত হত। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগের কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার স্থান

মাধ্যমিক স্তরে এই ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ কিভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোঠারি কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন—নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (১ম – ৪র্থ শ্রেণী) ছাত্রেরা কেবলমাত্র একটি ভাষা শিখবে—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা; উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে (৫ম—৭ম শ্রেণী) ছাত্রেরা দুটি ভাষা শিখবে—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দী অথবা ইংরাজী; নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে (৮ম—১০ম শ্রেণী) ছাত্রেরা তিনটি ভাষা শিখবে—অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে এই ভাষাগুলি হবে (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, (২) হিন্দী, এবং (৩) ইংরাজী। হিন্দীভাষী অঞ্চলে এই ভাষাগুলি হবে (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, (২) ইংরাজী, এবং (৩) হিন্দী ছাড়া অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে (১১শ—১২শ শ্রেণী) দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তার মধ্যে একটি হবে হয় মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার যে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে তাতে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে রয়েছে তিনটি ভাষা—বাংলা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত অথবা হিন্দী; এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে ইংরাজী ভাষার জন্য ১০০ নম্বর এবং বাংলা ভাষার জন্য ২০০ নম্বর ধার্য ক'রে পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই নতুন পাঠ্যক্রমে ৯ম ও

১০ শ্রেণীতে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত—এই তিনটি ভাষা শিক্ষার যে-ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ১৯৭৯ সাল থেকে তার পরিবর্তন ক'রে সংস্কৃত ভাষাকে তুলে দিয়ে অত্যন্ত ন্যায্যভাবে ভাষার বোঝা হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে পূর্বের তুলনায় মাতৃভাষার মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে একথা বলা যেতে পারে। তবে মাতৃভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য অন্যান্য যেসব ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন তা হল—(১) পঠন, লিখন ও কথনের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সুনির্বাচিত মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের শিক্ষাদান ; (২) মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য রসাস্বাদনের ক্ষমতা ও উন্নত রুচিবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করা ; (৩) জীবনের দর্পণ হিসাবে সাহিত্যপাঠ ও তার রসাস্বাদন। এরজন্য কেবল পাঠ্যপুস্তকের চর্চা না ক'রে ছাত্রদের উপযুক্ত বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য উৎকৃষ্ট ধরনের বই পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হবে এবং ব্যাকরণ ও শব্দের পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে সাহিত্যপাঠের আনন্দকে হত্যা না ক'রে, আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে সাহিত্যপাঠের ব্যবস্থা করতে হবে, (৪) আবৃত্তি, অভিনয়, দেওয়াল-পত্রিকা, বিতর্ক ও আলোচনা সভা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মাতৃভাষার চর্চাকে আরও প্রাণবন্ত ক'রে তোলা ; এবং (৫) উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা যাতে উদ্দীপনা সহকারে মাতৃভাষা শিক্ষার কাজে এগিয়ে আসেন তার ব্যবস্থা করা। এইসব ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে পারলে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা যে তার আপন গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মাতৃভাষা চর্চার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

সম্প্রতি স্নাতকস্তরের কলা ও বাণিজ্য শাখার পাঠ্যক্রমে আবশ্যিকভাবে ইংরাজী ও বাংলা (কিংবা অন্য কোন ভারতীয় ভাষা) শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দিয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় ঐচ্ছিকভাবে ১০০ নম্বরের ইংরাজী অথবা বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন মহলে এই ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হলেও আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আবশ্যিকভাবে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই ভাষাশিক্ষার বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ঐচ্ছিক ক'রে সুবিবেচনারই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষার স্থান

॥ অনুশীলনী ॥

১। শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্য ও পাঠের যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে আপনার স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে ব্যক্ত করুন।

[C. U. B. Ed. 1976]

২। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করার নীতিটি কতখানি বাস্তব এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1975]

৩। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? গত দশ বৎসরে এই গুরুত্ব-বোধের পরিবর্তন হইয়াছে কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে হইবে। [C. U. B. T. 1957]

৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছাত্রদের সম্যক আত্ম-বিকাশের জন্য শিক্ষার মাধ্যমরূপে ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের মাতৃভাষার কিরূপ শিক্ষা দিবেন? [C. U. B. T. 1963]

৫। বৈজ্ঞানিক যুগে ভাষা ও সাহিত্য পড়ানোর সার্থকতা কি? মাতৃভাষা অন্য কোন ভাষা হইতে শিক্ষায় বিশেষ সহায়ক কেন? [C. U. B. T. 1966]

৬। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করুন। উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবেও মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1971]

৭। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন। [K. U. B. T. 1968]

৮। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়া (অনধিক ৪৫০ শব্দের মধ্যে) একটি প্রবন্ধ লিখুন। [C. U. B. T. 1961]

৯। সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন। [C, U. B. Ed. 1973]

২

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাতৃভাষা শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতিসমূহ

[Aims of teaching the mother-tongue, principles and methods of teaching]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অভিমত।

॥ মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥

১॥ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

উত্তর : বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় সার্থকভাবে শিক্ষাদান করতে হ'লে ঐ বিষয়টি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে শিক্ষককে পরিপূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও শিক্ষকের যদি সঠিক ধারণা না থাকে তাহলে তিনি কখনই সার্থকভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কাজে সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হবেন না। উদ্দেশ্যহীন এবং গতানুগতিকভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদান করলে ছাত্রেরা মাতৃভাষার কাজ-চলা গোছের কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে বটে, কিন্তু তার ফলে মাতৃভাষা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাজেই মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলি কি সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল :

প্রথমতঃ, ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যমটি আয়ত্ত করতে সাহায্য করা। মাতৃভাষা হ'ল ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা সবচেয়ে ভালভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে মনের ভাব প্রধানতঃ দুভাবে প্রকাশ করতে হয়—মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে। সেইজন্য মাতৃভাষার শিক্ষককে ছাত্রদের এমনভাবে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সরল ও সুস্পষ্টভাবে যা বলতে চায় তা বলতে পারে এবং যা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে চায় তা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের মানসিক, আবেগমূলক ও নৈতিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা। ছাত্রদের মানসিক বিকাশ বলতে তাদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। মাতৃভাষার যথাযথ শিক্ষার উপর এই মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে। ছাত্রদের মধ্যে আনন্দ, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ক্রোধ, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি যেসব আবেগ রয়েছে

সেগুলি যথাযথ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হলে সেগুলি যাতে সহজ-সরল ও অকপট-ভাবে বহিঃপ্রকাশ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ছাত্রদের এই আবেগগুলি নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষাও দিতে হবে। এই কাজে মাতৃভাষা শিক্ষককে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। ছাত্রদের নৈতিক বিকাশ বলতে তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সাধুতা-অসাধুতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা। যেহেতু, এই ধারণাগুলি বিমূর্ত, সেইজন্য এগুলি গ'ড়ে তোলায় কাজে মাতৃভাষার সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গঠন করা। এই অভ্যাস এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ছাত্ররা তথ্য সংগ্রহ করা এবং আনন্দলাভ করা এই দুইপ্রকার উদ্দেশ্যেই পড়তে উৎসাহ বোধ করে। ধীরে ধীরে তারা যাতে মহৎ গদ্য-সাহিত্য ও কবিতা পড়ার আনন্দ লাভ করতে পারে তার শিক্ষা তাদের দিতে হবে এবং বই প'ড়ে তারা কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তাও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থতঃ, ছাত্রেরা যাতে তাদের সৃজনমূলক প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে তার জন্য তাদের সাহায্য করা। ছাত্রদের মধ্যে যে সৃজনীশক্তি আছে মাতৃভাবার মাধ্যমে নানাভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। মাতৃভাষার ক্লাসে ছাত্রেরা যদি গল্প লেখা, রচনা লেখা, পদ্য বা ছড়া লেখা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা, ডায়েরী লেখা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথাযথ চর্চার সুযোগ পায় তাহলে তাদের সৃজনমূলক প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে। মাতৃভাষা শিক্ষার এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

পঞ্চমতঃ, ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা, উন্নত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করা। মানুষের মনে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্য সম্ভোগের একটি চিরন্তন আকাঙ্খা রয়েছে। এই মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টি করেছে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা, উন্নত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হয়। সাহিত্য হল জীবনের দর্পণ। মহৎ সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে এমন এক সামগ্রিক ধারণার সৃষ্টি হয় যা তাদের মনকে তুচ্ছতা ও দীনতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত ক'রে মহৎ জীবনের উদার পরিবেশে বিচরণ করতে সাহায্য করে। সাহিত্যের মধ্যে ছাত্রেরা যতই জীবনের মহত্ত্বের সন্ধান পায় ততই তারা আরও বেশি পরিমাণে সাহিত্য-পাঠের আগ্রহ অনুভব করে এবং এইরূপে তাদের সাহিত্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শৈশবে ছাত্রদের প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি জৈব-মানসিক শক্তিগুলি অপরিমার্জিত অবস্থায় থাকে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর অমার্জিত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ও অনুভূতিশক্তির উন্নতি সাধিত হয় এবং তার মধ্যে সুন্দর ও অসুন্দরকে উপলব্ধি করার ক্ষমতার সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠতঃ, ছাত্রদের সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলীর বিকাশসাধন ও চরিত্র গঠন। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সার্থক সমাজজীবনযাপনের জন্য এই গুণগুলির বিকাশ ঘটা খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ এগুলির অভাবে ছাত্রেরা অহংসর্বস্ব, অসামাজিক ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে তেজস্বীতা, মহত্ব, মানবিকতা, পরহিতৈষণা প্রভৃতি আত্মিক গুণগুলিরও বিকাশ ঘটে। এছাড়া সাহিত্য হল চরিত্রগঠনের শিক্ষার একটি মাধ্যম। মাতৃভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি পাঠ করে ছাত্রদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ গ'ড়ে ওঠে এবং তাদের চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

সপ্তমতঃ, ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করা। মাতৃভাষাকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্গত কেবল একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয় হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। মাতৃভাষা, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। মাতৃভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হ'লে তবেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হয়।

অষ্টমতঃ, জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অগ্রগতি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করা। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। স্বাধীনতা দিবস, মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তী প্রভৃতি পালন করা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো যেতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অগ্রগতি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। এছাড়া বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার জগতে যেসব অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নানাভাবে সমাজজীবনে তার প্রতিফলন ঘটে। এইভাবে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

নবমতঃ, স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশের মাধ্যমে সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে ছাত্রদের গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। একজন উৎকৃষ্ট নাগরিকের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে এই দুটি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কোন ছাত্রই একজন উৎকৃষ্ট নাগরিক হিসাবে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে পারে না যদি না সে যথাযথভাবে তার মাতৃভাষা ব্যবহারের এবং মাতৃভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর মূল্য উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করে।

মাতৃভাষা শিক্ষার দুটি দিক আছে—একটি হল গ্রহণের দিক আর অপরটি হল প্রকাশের দিক। এই দুটি দিকই খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহণের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় হল ছাত্রেরা পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে যে চিন্তা ও অনুভূতি আছে তা যেন বুঝতে পারে এবং তারা পড়া ও লেখার কৌশলগুলি যেন ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে। আর প্রকাশের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রথম থেকেই ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। প্রথমদিকে তাদের কাজ সন্তোষজনক না হলেও, উৎসাহ এবং সুযোগ পেলে তারা এ বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। ক্রমশঃ মাতৃভাষার উপর তার দখল বাড়বে। মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ ক'রে সে আনন্দ লাভ করবে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে তার চিন্তা ও অনুভূতি শক্তিরও বিকাশ ঘটবে। অতএব মাতৃভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারলে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হবে।

॥ প্রাসঙ্গিক তথ্য ॥

বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা (প্রথম ভাষা) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অভিমত :

শিশুর শিক্ষাসূচীতে ভাষার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাষা ভাবচিন্তার ধারক এবং ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই অনুভূতি, মনোভাব, রূপকল্পনা, মৌখিক, লিখিত বা ভাষার অন্য প্রকার প্রকাশের ভিতর দিয়া যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষার উপর সাবলীল অধিকার ছাড়া চিন্তার যথাযথ প্রকাশ বা মনের ভাবের স্বচ্ছতা কখনোই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে তাহার দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-ভাবনার সহিত পরিচিত করানো হয়। ইহার ভিতর সে খুঁজিয়া পায় সুরুচি, সৌন্দর্য প্রকাশের পথ, আনন্দের উৎস এবং সৃজনাত্মক উপাদান। যথাযোগ্যভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোহর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ বহুলাংশে ইহারই উপর নির্ভর করে।

এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং শিক্ষার্থী-দিগের বয়স ও মননশক্তির ক্রমবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া সেই অনুসারে পাঠ্যবিষয়ের গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য

(ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী)

মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে, ছাত্র-ছাত্রীগণ যেন—

১। স্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থপ্রকাশকভাবে এবং সঠিক স্বরভঙ্গিতে পদ্য ও গদ্য রচনা পড়িতে পারে, একঘেয়ে শ্রুতিক্লান্তিকর পাঠ অভ্যাস বর্জন করিতে হইবে।

২। ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে কথা বলিতে ও কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সমর্থ হয়।

৩। স্পষ্ট, সুন্দর ও মোটামুটি দ্রুত হস্তাক্ষরে লিখিতে অভ্যস্ত হয়।

৪। তাহার জ্ঞান-পরিধির বহির্ভূত নয় এমন পাঠ্য-বিষয় নীরবে পড়িয়া বুঝিতে পারে।

৫। প্রতিদিনকার ঘটনা, আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা, কোন বিশেষ কাজ বা পর্যবেক্ষণের বিবরণ সহজ সাবলীল ভাষায় লিখিতে সক্ষম হয়।

৬। অভিধান ইত্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে।

৭। স্বীকৃত লেখকদিগের রচনা বা সংক্ষেপিত অংশ-বিশেষের সহিত পরিচিত হয়।

নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ক্রমে মাতৃভাষার জগতে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে ইহার গঠন ও সম্পদ, বিস্তার ও স্বপ্নকল্পনার সহিত তাহাদের পরিচয় হইবে।

উপরের শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে :

১। মাতৃভাষার মৌল গঠন, ব্যাকরণের মূল রীতি ও বাগ্বিধির সহিত ছাত্র-ছাত্রীর পরিচয় সাধন।

২। পূর্বে দেখা এবং অ-দেখা রচনাংশ অর্থ প্রকাশকভাবে, দ্রুত এবং যথার্থ স্বরভঙ্গীতে পাঠ করিতে ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করা ; সে যেন নীরবে দ্রুত পাঠ করিয়া রচনার অর্থ বুঝিতে পারে।

৩। ছাত্র, ছাত্রী যেন—

(ক) সঠিকভাবে, ভদ্রভাবে এবং জড়তাবিহীনভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়।

(খ) নিজের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

(গ) কোন বিষয়ের আলোচনায় ও পরস্পর ভাব আদান-প্রদানের সময় সহজ ও স্বাভাবিক সৌজন্য সহকারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

৪। সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন, তাহা হইতে আনন্দলাভ এবং তাহাতে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণে নিজের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিতে ছাত্রছাত্রী যেন উৎসাহী হয়।

৫। স্বাধীন চিন্তা ও সুরুচিকর আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মে ছাত্রছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করা।

[Curriculum and syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary Education, Classes VI to X, from 1974 ; West Bengal Board of Secondary Education.]

॥ মাতৃভাষা শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি ॥

২॥ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য যেসব নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন সেগুলি সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ বর্তমানযুগে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকে এক নতুন পথে পরিচালিত করেছে। মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এইরূপ কতকগুলি নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপর শিক্ষাবিদেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের নীতিগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

মাতৃভাষা শিক্ষার নীতি ঃ

১। **ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান**—মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আমাদের মনের প্রবেশ দ্বার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই বহির্জগতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। শিশুদের কাছে আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আবেদন সবচেয়ে বেশি। সেইজন্য মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্ত কোন পঠনীয় বিষয় শিশুর নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন যাতে তার দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঐ বিষয়ের আবেদন সরাসরি তার মনের মধ্যে গিয়ে পৌছায়। এই নীতি অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষাদান করার জন্য শিক্ষককে ছবি, মডেল, ফিল্ম-প্রজেক্টার, রেডিও, গ্রামোফোন, টেলিভিসন, বিতর্ক, অভিনয়, আবৃত্তি, গান, সরব পাঠ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

২। **কর্ম ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান**—আধুনিক শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে বক্তৃতাদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গতানুগতিক প্রথাটিকে অকার্যকরী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ শিক্ষকের বক্তৃতা অনুসরণ করে তা উপলব্ধি করার মত মানসিক পরিপক্কতা শিশুদের থাকে না। সেইজন্য অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ন্যায় মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিশুরা যাতে কর্মে অংশগ্রহণ করা এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় করার মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শৈশবকাল থেকেই শিশুদের মনে তাদের চারিপাশের বিভিন্ন জিনিসকে জানবার এক অদম্য কৌতূহল থাকে। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, বিভিন্ন বস্তুকে স্পর্শ ক'রে এবং নাড়াচাড়া ক'রে দেখা—এগুলি শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় শিশুদের এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। শৈশবকালে অর্থাৎ ৬বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মাতৃ-ভাষা শেখাবার সময় বিভিন্ন বস্তু ও খেলার সামগ্রী নিয়ে খেলা করার মাধ্যমে যাতে তারা মাতৃভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে

পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাল্যকালে অর্থাৎ ৬+ বছর থেকে ১২+ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষা শেখাবার সময় অনুসন্ধান ও গঠনমূলক কাজে তাদের নিয়োগ করার মাধ্যমে মাতৃভাষা শেখাবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই স্তরে শিক্ষককে ছাত্রদের মাতৃভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য শ্রেণীকক্ষে ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম খেলা, অঙ্গভঙ্গী সহ কবিতা ও ছড়ার আবৃত্তি, ছবির সাহায্যে গল্প রচনা, নাটকীয় ক্রিয়া, অভিনয় প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কৈশোরে অর্থাৎ ১২+ বছর থেকে ১৫+ বছর বয়স (দশম শ্রেণী) পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষা শেখাবার সময় বিচার বিশ্লেষণ, আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও সৃজনমূলক প্রক্রিয়াসমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩। **সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত প্রভৃতি নীতির সাহায্যে শিক্ষাদান**—শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে তোলার জন্য আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। এই নীতিগুলির মধ্যে সহজ বিষয় থেকে জটিল বিষয়ে যাওয়ার নীতি, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি, সমগ্র থেকে অংশে যাওয়ার নীতি, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যুক্তিনির্ভর জ্ঞানে যাওয়ার নীতি, এবং মনস্তত্ত্বসম্মত পথ থেকে যুক্তিসম্মত পথে যাওয়ার নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক যদি প্রয়োজনমত উপরি উক্ত নীতিগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্রেরা ভালভাবে আয়ত্ব করতে সক্ষম হবে।

৪। **শিখন সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতির সাহায্যে শিক্ষাদান**—শিশু কিভাবে শেখে সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা নানারূপ গবেষণা করেছেন। এইসব গবেষণাকে কেন্দ্র করে তাঁরা এ সম্পর্কে নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন থর্নডাইক (Thorndike) বলেছেন যে চেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial and Error) মধ্য দিয়েই শিশুরা সবকিছু শেখে। গেস্টলটবাদীরা বলেছেন অন্তর্দৃষ্টির (insight) সাহায্যেই শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ করে। আবার আচরণবাদীদের মতে অনুবর্তনই (Conditioning) হল শিশুর শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। আসলে শিশুর শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে এই তিনটি পদ্ধতিরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। 'মা' এই শব্দটি উচ্চারণ করলে শিশু মা'র কাছ থেকে সাড়া পায়। বারবার এইরূপ সাড়া পাওয়ার ফলে 'মা' এই শব্দটি তার মায়ের সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে যায়। মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে শিশু 'চেষ্টা ও ভ্রান্তি'র পদ্ধতিটিও অবলম্বন করতে পারে। যেমন বাক্যগঠন কিংবা উচ্চারণে ভুল হ'লে সে চেষ্টা ও ভ্রান্তির সাহায্যে তার ভুল সংশোধন করে নিতে পারে। থর্নডাইক তাঁর চেষ্টা ও ভ্রান্তির তত্ত্বটির উপর ভিত্তি ক'রে শিখনের তিনটি প্রধান ও পাঁচটি অপ্রধান

সূত্র গঠন করেছেন। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সূত্র বা নীতিগুলির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। থর্নডাইকের শিখনের প্রধান সূত্রগুলি হল—(১) **প্রস্তুতির সূত্র** :—এই সূত্রের মূল বক্তব্য হল কোন কিছু শিখতে হলে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। মানসিক প্রস্তুতি থাকলে সে শেখার কাজে আগ্রহী হবে, প্রস্তুতি না থাকলে সে বিরক্ত হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। (২) **অনুশীলনের সূত্র**—এই সূত্রটির মূল কথা হল অনুশীলন বা বারবার অভ্যাসের দ্বারা শেখা জিনিস বেশিদিন মনে রাখা যায়, আর অনুশীলনের অভাবে আমরা শেখা জিনিস ক্রমশঃ ভুলে যাই। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতিটি সমানভাবে প্রযোজ্য। (৩) **ফলভোগের সূত্র**—এই সূত্রটির মুল বক্তব্য হল কোন কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে সন্তোষ সৃষ্টি হলে সেই কাজের ফল স্থায়ী হয়, আর সেই কাজের দ্বারা যদি তার মনে বিরক্তির সৃষ্টি হয় তাহলে সেই কাজের ফল ক্ষণস্থায়ী হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও এই নীতিটি সমানভাবে কার্যকরী।

থর্নডাইকের শিখনের অপ্রধান সূত্র বা নীতিগুলি হল—(১) বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নীতি, (২) দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাবের নীতি, (৩) আংশিক কর্মের নীতি, (৪) সাদৃশ্যের নীতি, এবং (৫) সাদৃশ্যমূলক সঞ্চালনের নীতি। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গেস্টল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টির তত্ত্বটি আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যার সমগ্র রূপটি আগে উপলব্ধি করতে হবে, তার খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করলে চলবে না। কারণ খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা কখনই সমস্যাটির সমগ্ররূপ সম্পর্কে ধারণা করতে পারব না এবং তার সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অপরপক্ষে সমগ্র সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে হঠাৎ ঐ সমস্যাটির সমাধানের পথ আমরা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। এই হঠাৎ সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করাকেই গেস্টল্টবাদীরা অন্তর্দৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। অনুবর্তন এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে শিশু প্রধানতঃ যান্ত্রিকভাবে কোন কিছু শিখে থাকে। আর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন বিষয় সম্পর্কে শিশুর প্রকৃত মানসিক উপলব্ধি ঘটে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মানসিক উপলব্ধির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কবিতার মর্ম উপলব্ধি কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই ঘটতে পারে, চেষ্টা ও ভ্রান্তির মাধ্যমে নয়।

মাতৃভাষা শিক্ষার পদ্ধতি :

আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মাতৃভাষা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিগুলিও মনোবৈজ্ঞানিক

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল :

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিগুলিতে শ্রেণীকক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিবেশের বিশেষত্ব হল এখানে একটি সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দময় ও স্বাধীন আবহাওয়া বিরাজ করে। এই পরিবেশে ছাত্রেরা নতুন বিষয়কে জানবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ বোধ করে এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চর্চা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিগুলিতে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। এই উভয় প্রকার শক্তির বিকাশের সঙ্গে মাতৃভাষা ব্যবহারের দক্ষতার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রেরা যাতে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও চিন্তা-শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে সঠিকভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারে, শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিগুলি শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের পূর্বেকার ভূমিকার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। পূর্বে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক বক্তার এবং ছাত্র শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের ভূমিকা উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা, ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা এবং প্রয়োজনমত তাদের সাহায্য করার মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রেরা যাতে বেশি পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে আধুনিক মাতৃভাষা শিক্ষার পদ্ধতিগুলিতে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

আধুনিক মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা নিষ্প্রভ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রেরা শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তাদের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করবে শিক্ষকের সঠিক পরিচালনা কিংবা পথ-প্রদর্শন করার উপর। ছাত্রদের কোন বিষয় বুঝতে সাহায্য করা, সাহায্যকারী পুস্তকের সন্ধান দেওয়া, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি দেখিয়ে দেওয়া, রসোপলব্ধিতে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তাকে খর্ব না করে তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে সঠিক পথে পরিচালিত করা—এই সব বিষয়গুলি মাতৃভাষা শিক্ষকের কাজকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ক'রে তুলেছে।

চতুর্থতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষার অগ্রগতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের পরিণতির (maturity) বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষার

বিষয়গুলি হবে সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিল। অর্থাৎ শিশু যত বড় হবে ততই সে মাতৃভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত অধিকতর জটিল বিষয়গুলি আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জন করবে। মাতৃভাষা শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করবার সময় এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষককে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের নিচের শ্রেণীগুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষা দেবার সময় প্রধানতঃ মাতৃভাষায় রচিত কোন সরল রচনা প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছোট ছোট নির্ভুল বাক্যের সাহায্যে কোন ঘটনা কিংবা কোন জিনিসের বর্ণনা লিখিত আকারে প্রকাশ করতে পারা, সহজ সরল কবিতার অর্থ বুঝতে পারা এবং তার ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অপরপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উপরের শ্রেণীগুলিতে ছাত্রেরা যাতে মাতৃভাষায় রচিত অপেক্ষাকৃত জটিল বাক্য সমন্বিত রচনাগুলির অর্থ বুঝতে পারে, নিজেদের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ মাতৃভাষার শিক্ষাকে নিম্নশ্রেণীতে সহজ সরল ও বস্তুভিত্তিক বিষয় দিয়ে শুরু করে ক্রমশঃ বিচার-বিশ্লেষণ, অনুভূতি ও ভাবমূলক বিষয়ের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, মাতৃভাষা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিগুলিতে ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত আগ্রহ সঞ্চার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার না হলে ছাত্রেরা ঐ বিষয়টি শেখার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না। সেইজন্য মাতৃভাষার শিক্ষককে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক ক'রে উপস্থিত করার চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঞ্চার হয়। শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মাতৃভাষার শিক্ষককে নানাবিধ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এইসব উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি, মডেল, চার্ট, মানচিত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ফিল্ম-প্রজেক্টার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব উপকরণ ছাড়াও আবৃত্তি, অভিনয়, নানারূপ খেলা প্রভৃতির সাহায্যেও শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার (learning by doing) নীতিটি মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কর্ম বলতে এখানে নিছক লেখা-পড়া বা মুখস্থ করাকে বোঝানো হচ্ছে না। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণপদ্ধতিতে কর্মের একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। তা হল, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী এমন একটি কাজে অংশ গ্রহণ করে যাতে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায় এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য একই সঙ্গে তার অঙ্গ সঞ্চালন ও মস্তিষ্কের চর্চা ঘটে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্লাসে ছাত্রেরা কোন গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চস্থ করতে পারে, কিংবা কোন ভ্রমণে অংশগ্রহণ ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারে, কিংবা কোন বিশেষ কাজ বা পর্যবেক্ষণের বিবরণ মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে

পারে। এই প্রসঙ্গে ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা অতি সহজেই পাঠ্যবিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা যায় বলে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে।

সপ্তমতঃ, বর্তমানে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতির (inductive method) প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়াকে আরোহ পদ্ধতি বলে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে কোন পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যের পুনরাবিষ্কার করতে পারে কিংবা কতকগুলি উদাহরণকে বিশ্লেষণ ক'রে নিজেরাই কোন সূত্র গঠন করতে পারে। এইভাবে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার ফল স্থায়ী হয় এবং ছাত্রেরাও জ্ঞানের রাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের আনন্দ লাভ করতে পারে।

অনুশীলনী

১। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

২। মাতৃভাষা শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অভিমত কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৬

বাংলা ভাষা—মৌখিক ও লিখিত ; কথ্যভাষার উপর উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব ; ভাষাশিক্ষকের পক্ষে ধ্বনি-তরঙ্গের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

[Bengali—spoken and written The influence of local dialects on speech habits. The importance of the study of phonetics for language teachers.]

॥ বাংলা ভাষা : মৌখিক ও লিখিত ॥

[চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা]

১॥ বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

[C. U. B. Ed. 1975]

উত্তর : পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি জীবন্ত ভাষার দুটি রূপ লক্ষ্য করা যায়—একটি হল লিখিত বা সাহিত্যিক রূপ, আর অপরটি হল কথ্য বা মৌখিক রূপ। বাংলা ভাষাতেও এই দুটি রূপ বর্তমান। কিন্তু **বাংলা ভাষার সাধুরীতি ও চলিতরীতি এই দুটি রীতিই লিখিত বা সাহিত্যিক রূপের অন্তর্গত**—যদিও কথ্যভাষার উপর ভিত্তি করেই বাংলা ভাষায় চলিত রীতিটির উদ্ভব ঘটেছে। বাংলা ভাষায় চলিত রীতিটির সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লেখকদের হাতে। সেইজন্য বাংলা গদ্যের যে রীতিটি প্রথম বাংলা দেশে চালু হয়েছিল তার মধ্যে সংস্কৃত সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন সাহিত্য রচনার উপযোগী বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটেছিল তখন সেই বাংলা গদ্য ছিল সংস্কৃতঘেঁষা একটি কৃত্রিম ভাষা। পরবর্তীকালে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের হাতে সংস্কৃতঘেঁষা কৃত্রিম বাংলা গদ্য একটি সাবলীল ও আভিজাত্যপূর্ণ রূপ লাভ করে। **বাংলা গদ্যের এই সাহিত্যিক রূপটিকে বলা হয় সাধুভাষা।** বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই সাধুভাষাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলা সাধুভাষার পাশাপাশি বাংলা কথ্য-ভাষাকে সাহিত্য রচনায় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই ব্যাপারে যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী-প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে মার্জিত কথ্যভাষার

মাধ্যমে সাহিত্য রচনার এই রীতিটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। **বাংলা কথ্য-ভাষার এই মার্জিত রূপটিকে বলা হয় চলিত ভাষা।** এই চলিত ভাষার মূল ভিত্তি হল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা অঞ্চলের উপভাষা। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে উদ্ভবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাধুরীতির ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হল, এই রীতি তার প্রথম অবস্থার সংস্কৃত ঘেঁষা কৃত্রিমতাকে ক্রমশঃ পরিহার ক'রে মুখের ভাষার সাবলীলতাকে আয়ত্ত করার দিকে অনেকখানি ঝুঁকেছে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলা সাধুভাষার মধ্যে প্রচুর তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অপরপক্ষে, চলিতরীতির ক্ষেত্রে যে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে তা হল, এখানে গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য অনেকক্ষেত্রে তৎসম শব্দের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য-গুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

বাংলা সাধুরীতির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য :

বাংলা সাধুরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে তৎসম শব্দের যথেষ্ট প্রাধান্য থাকে। তৎসম শব্দগুলি সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। বাংলা গদ্যের উত্তরকালে বাংলা সাধুরীতিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য বর্তমান বাংলা সাধুরীতির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তৎসম শব্দের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাধুরীতিতে বড় বড় সমাসবদ্ধপদ এবং যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দের ব্যবহারও খুব বেশি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল-বেগে গমন করিতেছে।"

এখানে আমরা বাংলা সাধুরীতির উপরি উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি; যেমন, এই উদ্ধৃতিটিতে 'আর্যে', 'প্রস্রবন', 'গিরি', 'শিখর' প্রভৃতি তৎসম শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এখানে সমাসবদ্ধ পদ এবং যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দেরও প্রাচুর্য রয়েছে।

বাংলা সাধুরীতির মধ্যে তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। তবে সাধুরীতিতে এই শব্দগুলির ব্যবহার চলিতরীতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। বাংলা সাধুরীতিতে সমাপিকা ক্রিয়াপদে 'ইতেছে', 'ইতেছি' প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তি এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদে 'ইয়া', 'ইতে' প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাংলা সাধুরীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, 'ইহা', 'তাহা', 'ইহারা', 'তাহারা', 'ইহাদের', 'তাহাদের' প্রভৃতি সর্বনাম পদের ব্যবহার। 'দ্বারা', 'দিয়া', 'নিমিত্ত', 'হেতু',

'অপেক্ষা', 'হইতে', 'নিকটে' প্রভৃতি অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্নগুলি কেবলমাত্র সাধু-রীতিতেই ব্যবহৃত হয় ; চলিত রীতিতে এগুলির রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা সাধুরীতিতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির যেসব উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বজায় থাকলেও বড় বড় সমাসবদ্ধপদের ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করা হয়। এছাড়া আধুনিক বাংলা সাধুভাষা এর জন্মলগ্নের সংস্কৃত-ঘেঁষা গুরুগম্ভীর ভাব যথাসম্ভব পরিহার ক'রে চলিত ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি, সাবলীলতা এবং সহজবোধ্যতার দিকে অনেকখানি ঝুঁকেছে। নিচে তুলনামূলকভাবে দুটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যা থেকে আমরা বাংলা সাধুরীতির এই দুপ্রকার ব্যবহারের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো—

(১) "অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রভাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না।" [দেবমন্দির : বঙ্কিমচন্দ্র]

(২) "পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" [বাহিরে যাত্রা : রবীন্দ্রনাথ]

বাংলা চলিত রীতির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য :

বাংলা চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সাধুভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এখানে কিছুটা সঙ্কুচিতভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন সাধুভাষায় ব্যবহৃত 'তাহারা', 'তাহাদের', 'তাহাকে', 'ইহার', 'ইহাকে' প্রভৃতি সর্বনামপদগুলি চলিত ভাষায় 'তারা', 'তাদের', 'তাকে', 'এর', 'একে' প্রভৃতি সঙ্কুচিত আকার লাভ করে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ব্যবহৃত 'দেখিতেছি' 'দেখিয়াছি', 'দেখিয়াছিলাম', 'দেখিব' প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি 'দেখছি', 'দেখেছি', 'দেখেছিলাম', 'দেখব' প্রভৃতি পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এছাড়া চলিত ভাষায় সাধারণতঃ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য বেশি থাকে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে চলিত ভাষায় গাম্ভীর্য সৃষ্টি করবার জন্য অনেক লেখক কিছুটা বেশি পরিমাণে তৎসম শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। নিচের উদাহরণ দুটির প্রথমটিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়টিতে অতৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকায় চলিত রীতিতে কিভাবে গাম্ভীর্য ও চটুল ভাব ফুটে উঠেছে তা দেখানো হল :

(১) "বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য, তার প্রয়োগবিদ্যা, তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইন-কানুন সমস্তই এমন অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে কোন মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে।" [শিল্পের অধিকার : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(২) যদি বল ও কথা বেশ ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব ? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে,

সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে-দিক হতেই আসুক না একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়।"

[বাঙ্গালাভাষা : স্বামী বিবেকানন্দ]

অতএব তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার যে চলিত ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য একথা বলা যায় না। আসলে লেখকের অভিরুচি এবং রচনার প্রকৃতির উপর তৎসম শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ অনেকখানি নির্ভর করে। আধুনিক চলিত রীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল **কথ্য ভাষার উচ্চারণের স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী বাক্যের পদবিন্যাস করা।** বাংলা প্রবচন ও বাগ্‌ধারাগুলি চলিত ভাষাতেই বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য এগুলিকে চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' প্রভৃতি প্রবচন এবং 'টনক নড়া', 'টেক্কা দেওয়া' প্রভৃতি বাগধারাগুলি চলিত রীতিতে ব্যবহারেরই উপযুক্ত, সাধুরীতিতে নয়।

বাংলা চলিত রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন, স্বরাগম, উচ্চারণে সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য ধ্বনি-পরিবর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **অভিশ্রুতিজনিত** স্বরধ্বনির পরিবর্তনের জন্য সাধুভাষায় ব্যবহৃত 'করিয়া', 'খাইয়া', 'আজি', 'রাতি', প্রভৃতি শব্দগুলি চলিত ভাষায় যথাক্রমে 'ক'রে', 'খেয়ে', 'আজ', 'রাত', প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়। **স্বর-সংগতিজনিত** পরিবর্তনের জন্য সাধুভাষায় প্রচলিত 'দেশী', 'বিকাল', 'বিলাতী' প্রভৃতি শব্দগুলি চলিত ভাষায় 'দিশি', 'বিকেল', 'বিলিতি' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হয়। **স্বরাগমের** ফলে 'স্কুল', 'স্টেশন' প্রভৃতি শব্দগুলি 'ইস্কুল', 'ইস্টেশন' প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়। উচ্চারণে সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্যও চলিত ভাষায় কিছু কিছু ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে ; যেমন, দুপর > দুপুর, উঁচা > উঁচু, ছুতার > ছুতোর, ছুতা > ছুতো ইত্যাদি।

২॥ বাংলা চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই সাধু-রীতির সহিত চলিতের এবং চলিত রীতির সহিত সাধুর সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে—এই ত্রুটির কারণ কি এবং কি উপায়ে ইহা নিবারণ করা সম্ভব তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।

[C. U. B. T. 1965]

উত্তর : [প্রথম অংশের জন্য পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।]

সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণের কারণ :

বাংলা ভাষার সাধু-রীতিটি কেবলমাত্র লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কথ্য ভাষার সঙ্গে সাধু-রীতির পার্থক্য অনেক। অপরপক্ষে বাংলা চলিত-রীতিটি কথ্য-ভাষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। শিশুরা যখন পড়তে ও লিখতে শেখে তখন তারা

বাংলা ভাষার সাধুরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা লেখাপড়ার চর্চা করে সাধুভাষায়, কিন্তু কথাবার্তা বলে কথ্য কিংবা চলিত ভাষায়। শিশুরা যতটুকু সময় সাধুভাষার চর্চা করে তারচেয়ে অনেক বেশী সময় তারা কথাবর্তার মাধ্যমে চলিত ভাষা ব্যবহার করে। ফলে চলিত ভাষার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সাধুভাষার চেয়ে অনেক বেশী। এইজন্য সাধুভাষায় যখন তারা কিছু লিখে প্রকাশ করতে যায় তখন স্বভাবতঃই সেই লেখার মধ্যে চলিত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাধু-রীতি ও চলিত-রীতির পার্থক্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা সৃষ্টির কোন চেষ্টা করা হয়না। ফলে তাদের লেখায় খুব স্বাভাবিক কারণেই সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণের ব্যাপারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে যায়। কারণ শিক্ষক পরীক্ষার খাতা দেখা কিংবা দু একটি রচনা-সংশোধন করার সময় ছাড়া ছাত্রদের এই জাতীয় ভুলের সঙ্গে পরিচিত হবার অন্য কোন সুযোগ পান না। ফলে এই ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের বিশেষ সাহায্যও করতে পারেন না। প্রচলিত শ্রেণী-শিক্ষণ ব্যবস্থায় ছাত্রদের ব্যক্তিগত সাহায্যদানের সুযোগ অনেক কম—সেই কারণেও ছাত্রদের মধ্যে সাধু-চলিতের মিশ্রণ জনিত যে ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাসের সৃষ্টি হয় শিক্ষক তা দূর করতে সক্ষম হন না।

তৃতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারটি নানা-কারণে বিশেষভাবে অবহেলিত হয়। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার একটা বড় কারণ হল ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি মাতৃভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষা শুরু হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রদের উপর ইংরাজী ভাষা শিক্ষার চাপ এসে পড়ে। ফলে তারা মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করার মত যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পায়না। এইজন্য তাদের মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অঙ্ক, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, জীবন-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের চাপ খুব বেশি থাকায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই মাতৃভাষা অপেক্ষা এইসব বিষয় আয়ত্ত করার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। মাতৃভাষার উপর ছাত্রদের দখল যত বৃদ্ধি পাবে অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে তত সহজ হবে—শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এই সাধারণ সত্যটিকে উপেক্ষা ক'রে মুখস্থ বিদ্যার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। ফলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব কার্যক্ষেত্রে দারুণভাবে অবহেলিত হয়। ছাত্রদের মাতৃভাষায় স্বাধীনভাবে 'আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে মুখস্থবিদ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া মাতৃভাষায় ছাত্রদের ভুলত্রুটির অন্যতম কারণ এবং এইসব ভুলত্রুটির মধ্যে সাধু ও চলিতের মিশ্রণের দোষ খুবই ব্যাপকভাবে ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়।

সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণের প্রতিকার :

সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণের প্রতিকার করতে হ'লে সবচেয়ে আগে যা প্রয়োজন তা হল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাই হল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত বিষয়। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হলে ছাত্রেরা আরও ভালভাবে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণের দোষও অনেক পরিমাণে দূর হবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সময় রচনা (Composition) শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। রচনা বলতে সারাংশ, সার-সংক্ষেপ, ভাবসম্প্রসারণ, প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি সবরকম রচনাকেই বোঝানো হয়। এইসব রচনা লেখার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে বাংলা গদ্য লেখার সুযোগ পাবে এবং সাধু ও চলিত-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলিও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, গদ্যাংশ পাঠের সময় শিক্ষক ছাত্রদের সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন। বিশেষ ক'রে সাধু ও চলিত-রীতির মধ্যে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের যে পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে ছাত্রদের বিশেষভাবে সজাগ ক'রে তুলতে হবে। কারণ এই দুটি ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ সর্বাপেক্ষা দোষের।

চতুর্থতঃ, ছাত্রদের মধ্যে সাধু থেকে চলিত এবং চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর করার অভ্যাস গঠন করতে হবে। নিয়মিতভাবে ছাত্রদের যদি এইজাতীয় রূপান্তর করার কাজ দেওয়া হয় এবং তাদের ভুলত্রুটিগুলি যত্নসহকারে সংশোধন করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের রচনায় সাধু চলিতের মিশ্রণজনিত ভুল খুব কম হবে।

পঞ্চমতঃ, বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ফলে যে স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয় ছাত্রদের সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। বাংলা ভাষার চলিত রীতিতেই যে স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ছাত্রদের তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ষষ্ঠতঃ, ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে লেখার অভ্যাস যাতে গ'ড়ে ওঠে তারজন্য তাদের ডায়েরী লেখা, ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা, গল্প লেখা প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এইসব লেখায় যাতে সাধু চলিতের মিশ্রণ না ঘটে ছাত্রদের সেদিকে মনোযোগী হবার জন্য বলতে হবে। 'ছবি দেখে রচনা লেখ' (Picture Composition) জাতীয় অনুশীলনের মাধ্যমেও ছাত্রেরা শুদ্ধ সাধুভাষা কিংবা শুদ্ধ চলিত ভাষা লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে।

সপ্তমত', আবৃত্তি, অভিনয়, আলোচনা, বিতর্ক, গল্পের বই পড়া প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রদের অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে। এইসঙ্গে বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রেরা যাতে নিম্নশ্রেণী থেকেই সচেতনতা অর্জন করতে পারে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছাত্রদের মধ্যে শৈশবকাল থেকেই যদি ভাষাগত সচেতনতা (language consciousness) সৃষ্টি করা যায় তাহলে সাধু ও চলিত-রীতির মিশ্রণের ত্রুটি তারা সহজেই পরিহার ক'রে চলতে শিখবে।

৩॥ ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonetics) জ্ঞান একান্ত আবশ্যক—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য ব্যক্ত করুন। [C. U. B. T. 1966, '68, '71, '76]

উত্তর : আমরা ভাষার সাহায্যে আমাদের মনের ভাবনা-চিন্তাকে বাইরে প্রকাশ করি। ভাষা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমরা বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যেসব ভাবপ্রকাশক ধ্বনি উচ্চারণ করি তাকেই ভাষা বলা হয়। এক-একটি ভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে ভাষা উচ্চারণের যে বিশেষ রীতি দেখা যায় তা দীর্ঘদিন ধরে ভাষা-ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই রীতিটি যে অপরিবর্তনীয় তা নয়—ভাষার গঠনভঙ্গীর ন্যায় তার উচ্চারণ-রীতিও নানাকারণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অন্যান্য বৃহৎ-ভূখণ্ডে প্রচলিত ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও কতকগুলি উপভাষা (dialect) আছে। এই উপভাষাগুলি হল—(১) রাঢ়ী, (২) বরেন্দ্রী, (৩) বঙ্গালী, (৪) কামরূপী এবং (৫) ঝাড়খণ্ডী। এই উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির কিছু-না-কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে এই উপভাষাগুলির কলকাতা ও ভাগীরথী অঞ্চলের উপভাষাই সাহিত্য-রচনা ও শিক্ষা-চর্চার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষক যখন ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবেন তখন তাঁকে বাংলা ভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। **উপভাষা কিংবা অন্য কোন ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি যেন বিকৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাতে হবে।** বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষকের যদি যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি ছাত্রদের বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি কখনই শেখাতে পারবেন না এবং ছাত্রদের উচ্চারণ-বিকৃতির সংশোধনও করতে পারবেন না।

অন্যান্য জীবন্ত ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও দুটি রূপ আছে—একটি হল কথিত রূপ, আর অপরটি হল লিখিত রূপ। ভাষার কথিত এবং লিখিত এই দুটি রূপের সঙ্গেই ধ্বনিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এখন কি কি কারণে ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহার করার নিয়ম-কানুন শেখানোর জন্য ব্যাকরণ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ব্যাকরণের যে-বিষয়গুলি ছাত্রদের পড়ানো হয় তাতে তারা কেমন ক'রে বাংলা ভাষায় নির্ভুল বাক্য গঠন করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু কেমন ক'রে বিশুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করতে হয় সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকলে তারা

ব্যবহারিক জীবনে সার্থকভাবে বাংলা ভাষার মৌখিক ব্যবহার করতে পারবে না। শিক্ষককে যদি ছাত্রদের বিশুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করার শিক্ষা দিতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য চারটি। এগুলি হল—(১) বাংলা ভাষা শুনে তার অর্থ বুঝতে পারা ; (২) বাংলা ভাষায় কথা ব'লে মনের ভাব ভালভাবে প্রকাশ করতে পারা ; (৩) লিখিত ভাষা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা, এবং (৪) লেখার মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণ রীতির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। কারণ শিক্ষক যদি বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে না বলতে পারেন তাহলে ছাত্রেরা তাঁর কথা শুনে সম্পূর্ণভাবে তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। আবার ছাত্রেরাও যদি শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে না পারে তাহলে তারাও অন্যের কাছে নিজেদের মনোভাব ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারবে না। কাজেই ভাষা-শিক্ষককে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করার জন্য এবং ছাত্রদেরও তা শেখানোর জন্য ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, কথা বলার ন্যায় সরব পঠনের ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা সঠিক উচ্চারণ এবং যতিচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে বাংলা গদ্য সরবে পড়তে পারে। কবিতা কিংবা পদ্যাংশ পড়াবার সময় সঠিকভাবে আবৃত্তি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ **সঠিক আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে কবিতার অর্ধেক রসোপলব্ধি হতে পারে।** কোন কবিতা সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে হলে সুস্পষ্ট উচ্চারণ, শ্বাসাঘাতের উপযুক্ত ব্যবহার, কণ্ঠস্বরের উঠানামা (intonation) এবং ছন্দের প্রকৃতি অনুযায়ী ছেদ ও যতির প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চারণের বিরতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান শিক্ষককে এই সব বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

চতুর্থতঃ, সমাজের বিভিন্ন পরিবেশ থেকে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে। সেইজন্য তাদের উচ্চারণে নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তার সঙ্গে অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তার অনেক পার্থক্য থাকে। তাছাড়া আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাবে কিংবা পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আগমনের ফলে ছাত্রদের বাংলা ভাষার উচ্চারণে অনেক দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। এই সব দোষ ত্রুটি সংশোধন করে যদি তাদের বাংলা ভাষার আদর্শ উচ্চারণ-রীতি শেখাতে হয় তাহলে শিক্ষককে অবশ্যই ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

পঞ্চমতঃ, অনেক সময় অভিভাবকদের ঔদাসীন্য কিংবা স্নেহাধিক্যের ফলে শিশুদের উচ্চারণে নানারকম দোষ দেখা যায় কিংবা তারা আধ-আধ স্বরে কথা বলে। শিশুদের উচ্চারণ ঘটিত এইসব দোষত্রুটি সংশোধন করতে হলে শিক্ষককে বিভিন্ন

ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করার জন্য কিভাবে বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা ভালভাবে জানতে হবে এবং সেজন্য তাঁকে ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করতে হবে। শিশুদের উচ্চারণ ঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ধ্বনিতত্ত্বে নানারকম সংশোধনমূলক অনুশীলনের (remedial exercise) ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করতে পারলে শিক্ষক অনায়াসেই শিশুদের উচ্চারণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সক্ষম হবেন।

ষষ্ঠতঃ, ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণের অন্তর্গত বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার বিজ্ঞান, আর ভাষার অন্তর্গত ধ্বনি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ধ্বনিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-রীতি নির্ণয় করা; কিভাবে এবং কোথায় কোথায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন হয় তা স্থির করা; বানান এবং উচ্চারণের মধ্যে যেসব অসঙ্গতি থাকে তা চিহ্নিত করা; বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে অন্যান্য উপভাষার উচ্চারণ-রীতির পার্থক্য নিরূপণ করা প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান না থাকলে তিনি কখনই ছাত্রদের শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ-রীতি শেখাতে পারবেন না।

সপ্তমতঃ, শিক্ষকের নিজের বাংলা ভাষার উচ্চারণ আদর্শ স্থানীয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ ছাত্রেরা তাঁর উচ্চারণকে অনুকরণ করেই শুদ্ধ উচ্চারণ শিখবে। নিজের উচ্চারণকে আদর্শ স্থানীয় করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ ধ্বনিতত্ত্বই শিক্ষককে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণের নিয়মকানুনগুলি জানতে সাহায্য করবে। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে জানবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা The Bengali Phonetic Reader বইটি অবশ্যই পড়া উচিত। এই বইটি থেকে শিক্ষক বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী নিজের এবং ছাত্রদের উচ্চারণকে পরিমার্জিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংলা ভাষাশিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

অতিরিক্ত সংযোজন :

যেসব ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্চারণ ভুল হয়, নিম্নে তার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল :—

(১) অ-ধ্বনির শুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ—

(ক) অ-ধ্বনির উচ্চারণ কোথাও কোথাও ও [o]-এর মত হয়।
যেমন, মতি = মোতি, এখানে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মত হবে ;

কিন্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ কেউ কেউ ম (অ) তি এরূপ উচ্চারণ করতে পারে।

(খ) অ-ধ্বনির উচ্চারণ কোথাও কোথাও [ɔ]-এর মত হয়।

যেমন, অসম্ভব=অস (অ)ম্ভব, এখানে স-এর পরবর্তী অ-এর উচ্চারণ অ-এর মত হবে।

কিন্তু ভুল উচ্চারণবশত: কেউ কেউ অসোম্ভব এরূপ উচ্চারণ করতে পারে।

সেইরূপ, অবলা, অনল অবিচল, অস্থির প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও অ-ধ্বনির এরূপ ভুল উচ্চারণ হতে পারে।

(২) এ-ধ্বনির শুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ—

(ক) এ-ধ্বনির উচ্চারণ কোথাও কোথাও এ [e]-এর মত হয়।

যেমন, লেখা=লে (এ) খা, এখানে এ-এর উচ্চারণ এ-এর মত হবে।

কিন্তু ভুল উচ্চারণবশত: কেউ কেউ ল্যাখা এরূপ উচ্চারণ করতে পারে।

সেইরূপ, দেশ, শেষ, রেবা, সেবা প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও এ-ধ্বনির এরূপ ভুল উচ্চারণ হতে পারে।

(খ) এ-ধ্বনির উচ্চারণ কোথাও কোথাও এ্যা [æ]-এর মত হয়।

যেমন, খেলা=খ্যালা, এ-এর উচ্চারণ এ্যা-এর মত হবে।

কিন্তু ভুল উচ্চারণবশত: কেউ কেউ খেলা এরূপ উচ্চারণ করতে পারে।

সেইরূপ, দেখা, একা, বেলা প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও এ-ধ্বনির এরূপ ভুল উচ্চারণ হতে পারে।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গের চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণতা ত্যাগ ক'রে উচ্চারণের দোষে তৃতীয় বর্গে পরিণত হয় ; যেমন, ভাত> বাত ; ঘর>গর ; ঝাল>জাল ইত্যাদি।

(৪) কখনও কখনও উচ্চারণের দোষে অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয় ; যেমন, কাক>কাগ ; শাক>শাগ ; ছত্র>ছাত>ছাদ ইত্যাদি।

(৫) কোথাও কোথাও আনুনাসিক স্বর উচ্চারণের দোষে লুপ্ত হয় এবং অনেক-ক্ষেত্রে তারজন্য অর্থবিপত্তিও ঘটে ; যেমন, কাঁটা>কাটা (অর্থবিপত্তি) ; বাঁধা> বাধা (অর্থবিপত্তি) ; চাঁদ>চাদ ; পাঁক>পাক (অর্থবিপত্তি) ইত্যাদি।

(৬) চ, ছ ও জ অনেক সময় উচ্চারণ বিকৃতির ফলে যথাক্রমে 'ৎস', 'স' এবং 'জ (z)'-এ পরিণত হয় ; যেমন, চলমান>ৎসলমান ; ছাওয়াল>সাওয়াল ; জাহাজ>জ়াহাজ় ইত্যাদি।

(৭) উচ্চারণের দোষে অনেকসময় হ-কারের লোপ হয় ; যেমন, হয়>অয় ; হংস>অংস ইত্যাদি।

(৮) উচ্চারণের দোষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শ' ও 'ষ' স এ পরিণত হয় ; যেমন, শেষ>সেস ; শোষণ>সোসোন, ইত্যাদি।

(৯) উচ্চারণবিকৃতির জন্য অনেক সময় স, শ এবং ষ, হ-কারে পরিণত হয় ; যেমন, শালা>হালা ; সে>হে ইত্যাদি।

(১০) উচ্চারণের দোষে অনেকক্ষেত্রে 'ড়' ও 'ঢ়', 'র'-এ পরিণত হয় ; যেমন, বাড়ি>বারি (অর্থবিপত্তি) ; দৃঢ়>দৃর, ইত্যাদি।

(১১) অনেক সময় উচ্চারণের দোষে 'ঙ্গ'>'ঙ'-তে পরিণত হয় ; যেমন, বাঙ্গাল>বাঙাল ; ভাঙ্গা>ভাঙা ; ইত্যাদি।

(১২) অনেক সময় উচ্চারণের দোষে শব্দের মধ্যস্থিত 'ই' কিংবা 'উ নিজের স্থান ত্যাগ ক'রে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হয়। এই জাতীয় উচ্চারণের ত্রুটিকে অপিনিহিতি বলে। যেমন, রাখিয়া>রাইখ্যা ; কন্যা>কইন্না ; সত্য> সইত্য, ইত্যাদি।

৪॥ বাংলা কথ্যভাষার উপর উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার কিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর ঃ যে বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে বাংলা ভাষা প্রচলিত তার সর্বত্র এই ভাষা হুবহু একইরকমভাবে লোকমুখে ব্যবহৃত হয়না। অঞ্চল ভেদে বাংলা ভাষার উচ্চারণে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। **আঞ্চলিক বিশেষত্ব দ্বারা চিহ্নিত কোন ভাষার একটি বিশেষ রূপকে উপভাষা বলে।** একটি ভাষার অনেক-গুলি উপভাষা থাকতে পারে। এইসব উপভাষাগুলিতে আঞ্চলিক বিশেষত্বযুক্ত শব্দপ্রয়োগ ও কথা বলার একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়। আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী বাংলা ভাষাকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) মধ্য পশ্চিম-বঙ্গের উপভাষা—**রাঢ়ী** ; (২) উত্তর পশ্চিম-বঙ্গের উপভাষা—**বরেন্দ্রী** ; (৩) দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা—**ঝাড়খণ্ডী** ; (৪) পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপভাষা—**কামরূপী** ; এবং (৫) পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আগত ব্যক্তিদের উপভাষা **বঙ্গালী**।

বাংলা ভাষার উপরি উক্ত পাঁচটি উপভাষা কিভাবে বাংলা কথ্যভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা জানতে হলে এই উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির নিজ নিজ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন ঃ

১। রাঢ়ী উপভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) এই উপভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অভিশ্রুতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন—করিয়া> ক'রে ; রাখিয়া>রেখে, ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন—দেশি>দিশি ; বিলাতি>বিলিতি, ইত্যাদি।

(খ) উচ্চারণের সময় অ-কারের ও-কার প্রবণতা দেখা যায়—যেমন, অতি> ওতি ; অতুল>ওতুল ইত্যাদি।

(গ) এই উপভাষায় আনুনাসিক স্বর লুপ্ত হয় না ; যেমন, চাঁদ, কাঁটা, ইত্যাদি। অনেক সময় অস্থানে আনুনাসিকের আগম হয় ; যেমন, হইছে ; চাঁ ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত থাকার ফলে শব্দের শেষ-ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা অথবা ঘোষবত্তা থাকে না ; যেমন, মধু>মদু (মহাপ্রাণতা লোপ) লর্ড> লাড>লাট (ঘোষবত্তা লোপ)।

(ঙ) কখনও কখনও অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ হয় ; যেমন, কাক>কাগ ; শাক> শাগ ইত্যাদি।

(চ) কোথাও কোথাও 'ল' স্থানে 'ন' হয় ; যেমন, লুচি>নুচি, লেবু>নেবু, ইত্যাদি।

২। বরেন্দ্রী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

পূর্বে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল, পরবর্তীকালে বিহারী ও বঙ্গালীর প্রভাবে রাঢ়ীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর কিছুটা তফাৎ হয়েছে। এই উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(খ) জ-কার কখনো কখনো জ় (z)-ধ্বনিতে পরিণত হয় ; যেমন, জল>জ়(z)ল।

(গ) পদের প্রথমে কখনও কখনও র-কারের লোপ হয়, আবার কখনও কখনও র-কারের আগম হয় ; যেমন, আমের রস>রামের অস।

(ঘ) সপ্তমীতে কামরূপী উপভাষার ন্যায় '-ত-' বিভক্তি দেখা যায়।

৩। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

(ক) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারকের ব্যবহার ; যেমন, জলকে চল।

(খ) নামধাতুর অতিরিক্ত ব্যবহার ; যেমন, পুখুরের জলটা গঁধাচ্ছে।

(গ) 'আছ্' ধাতুর স্থানে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার ; যেমন, করিব্টি=করছি, করিবটে=করছে।

৪। কামরূপী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

এই উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য কোন কোন বিষয়ে উত্তরবঙ্গ এবং কোন কোন বিষয়ে পূর্ববঙ্গের উপভাষার মত। তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই এই উপভাষার সম্পর্ক অধিকতর নিকট। এই উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) এই উপভাষায় বর্গের চতুর্থ বর্ণ পদের প্রথমে বজায় থাকে, অন্যত্র তা তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায়।

(খ) 'ড়' ও 'ঢ়'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে 'র' ও 'রহ্' হয়।

(গ) 'চ', 'জ' এবং 'স (শ)'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে 'ৎস', জ় (z) এবং 'হ' হয়।

(ঘ) শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

৫। বঙ্গালী উপভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

(ক) অপিনিহিতি স্বরের পরিবর্তন হয় না ; যেমন, রাখিয়া>রাইখিয়া>রাইখা ; করিয়া>কইরিয়া>কইরা ইত্যাদি।

(খ) য-ফলায় এবং যুক্তব্যঞ্জনে 'ই'-কারের আগম হয় ; যেমন, সত্য>সইত্ত ; রাক্ষস>রাইক্‌খস ইত্যাদি।

(গ) প্রায়ই এ-কার অ্যা-কারে এবং ও-কার উ-কারে পরিণত হয় ; যেমন, লেখা>ল্যাখ্যা, বোন>বুন ইত্যাদি।

(ঘ) কোথাও পদমধ্যস্থিত হ-কার লুপ্ত হয়, আবার কোথাও স (শ, ষ)-ধ্বনি হ-কারে পরিণত হয় ; যেমন, হয়>'অয় ; সে>হে ইত্যাদি।

(ঙ) শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

(চ) কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গের চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণতা ত্যাগ ক'রে তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয় ; যেমন, ভাত>বাত, ঘর>গর ইত্যাদি।

(ছ) ড় ও ঢ়, র-এ পরিণত হয় ; যেমন, বাড়ি>বারি, দৃঢ়>দৃর, ইত্যাদি।

(জ) চ, ছ ও জ-এর উচ্চারণ যথাক্রমে 'ৎস', 'স' ও 'জ় (z)' হয় ; যেমন, চলমান>ৎসলমান, ছাওয়াল>সাওয়াল, জাহাজ>জ়াহাজ় ইত্যাদি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। রচনায় সাধু ও চলিত এই দুইটি ভাষা যাহাতে মিশিয়া না যায়, ইহা ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য রচনা শিক্ষার্থীকে সাধু ও চলিত বাংলার রূপগত পার্থক্য কিরূপ নির্দেশ দিবেন? [C. U. B. Ed. 1964]

২। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে আপনি কোন্‌টি ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং কি কারণে পক্ষপাতী, তাহা যুক্তি সহকারে প্রকাশ করুন। [C. U. B. T. 1969]

৩। বাংলা ভাষায় সাধুরীতি ও চলিত রীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন। চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করুন। [C. U. B. T. 1971]

৪। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন :—বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। [C. U. B. Ed. 1975]

৫। বাংলা ভাষার চলিতরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষিত করুন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে প্রায়ই সাধু-চলিত রীতির সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে তাহার কারণ ও নিবারণের উপায় উল্লেখ করুন। [B. U. B. T. 1967]

৬। কথ্য ও লেখ্য ভাষার পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন। ভাষার এই দুই রূপের সঠিক পরিচয় দেবার জন্য শিক্ষকের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? [C. U. B. Ed. 1970]

৭। বাংলা ভাষার চলিত-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। ছাত্রছাত্রীরা যে প্রায়ই সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণ করিয়া ফেলে, তাহার কারণ ও নিবারণের উপায় উল্লেখ করুন। [K. U. B. Ed. 1972]

৮। ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ধ্বনিবিদ্যা ও ছন্দোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক।—যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক এই মন্তব্যের সার্থকতা বিচার করুন। [C. U. B. T. 1968]

৯। ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।—এই মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করুন। [C. U. B. T. 1971]

১০। "ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonetics) জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।"—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য ব্যক্ত করুন। [N. B. U. B. T. 1970]

১১। "ভাষা-শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনি-বিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।" এই মন্তব্যের সমর্থনে বাংলার আদর্শ উচ্চারণ-রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1973]

১২। ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে স্বরবর্ণ 'অ' এবং 'এ'-র বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাংলার বিভিন্ন সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের উদাহরণ দিয়া প্রতিপন্ন করুন যে, ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান বাংলা ভাষার শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। [B. U. B. T. 1968]

১৩। উচ্চারণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অশুদ্ধতা কি কি কারণে পরিলক্ষিত হয়? বিভিন্ন ধরণের অশুদ্ধ উচ্চারণের উদাহরণ দিন। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন লিখুন। [B. U. B. T. 1962]

8

বাংলা ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর—পদ্ধতি, শিক্ষাদানের সুযোগ ও মানের পার্থক্য

[Stages in the learning of Bengali—Differences in methods, scope and standards]

॥ প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রণালী ॥

১॥ প্রাথমিক স্তরের ছাত্রকে বাংলা (মাতৃভাষা হিসাবে) শিখাইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করা সঙ্গত তাহা যুক্তি-সহকারে বিবৃত করুন।

[C. U. B. T. 1962]

উত্তর : প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সময়-কালকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণতঃ ছয় থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করে। বাংলাভাষা (মাতৃভাষা হিসাবে) শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্তরের গুরুত্ব যে খুবই বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই স্তরের ছাত্রদের যথাযথভাবে বাংলা ভাষা শেখাতে না পারলে সামগ্রিকভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়-শিক্ষার ভিত্তিও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়বে। সেইজন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত পদ্ধতি এবং বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সাহায্যে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে বয়স অনুসারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রেরা বাল্যকালের অন্তর্গত। কাজেই একদিকে যেমন বাল্যকালের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে, অপরদিকে তেমনি তাদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ; বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতা ; কবিতা, ছড়া ও ছন্দের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ভাষাশিক্ষা দিতে হবে। বাল্যকালে ছাত্রদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য খুব বেশি থাকে। এই বয়সে ছাত্রদের মধ্যে অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চেনবার প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। বাল্যকালে ছাত্রেরা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায় এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপলব্ধি করতে চায়। পারিপার্শ্বিক জগতকে জানা, চেনা ও বোঝার ব্যাপারে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা ছাত্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের উপযোগী বাংলা ভাষা-শিক্ষার সঠিক প্রণালী নির্ণয় করতে হলে বাল্যকালের এইসব বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাতে হলে যাতে তারা নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে :

(ক) বাংলা ভাষা শুনে বক্তব্য বিষয় বুঝতে পারা ;
(খ) বাংলা ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা ;
(গ) বই প'ড়ে অর্থ বুঝতে পারা ;
(ঘ) লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা ;
(ঙ) বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারা।

অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ন্যায় বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টিও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপার নয়—মূলতঃ দক্ষতা অর্জনের ব্যাপার। কাজেই যেসব পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রেরা উপরিউক্ত দক্ষতাগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারবে সেইসব পদ্ধতি বা প্রণালীকেই উপযুক্ত ব'লে বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমতঃ, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষা শুনে বক্তব্য বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারে তারজন্য **গল্প-বলা পদ্ধতির** (Story-telling Method) সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাথমিক স্তরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে খুবই ভালবাসে। গল্পের প্রতি শিশুদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে তাকে যদি আমরা সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা শেখানোর কাজে লাগাতে পারি তাহলে ছাত্রেরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিখতে এগিয়ে আসবে। শিক্ষক গল্প বলার সময় এমন সব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করবেন যাতে ছাত্রেরা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারে। সেইসঙ্গে কিছু কিছু নতুন শব্দ ব্যবহার করার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষকের উচ্চারণ যাতে স্পষ্ট হয় এবং গল্পটি যাতে ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহী হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। 'গল্প বলা' ছাড়াও কোন স্থান, বস্তু কিংবা প্রাণীর বর্ণনা, ভ্রমণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রভৃতির সাহায্যেও শিক্ষক ছাত্রদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষার অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষমতার উন্নতি সাধন করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষা ব্যবহার ক'রে তাদের মনের ভাব ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে তারজন্য **'দেখ এবং বল' পদ্ধতি** (Look and Say Method) এবং **গল্প-বলা পদ্ধতির** সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। 'দেখ এবং বল' পদ্ধতিতে নানারকমের ছবির সাহায্যে ছাত্রদের মৌখিকভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। প্রাথমিক স্তরের গোড়ার দিকে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্রদের নানারকম বস্তু অথবা প্রাণীর ছবি দেখানো হয়। ছাত্রেরা তাদের চারপাশে যেসব বস্তু ও প্রাণী দেখতে পায় কিংবা যেসব বস্তু ও প্রাণী তারা চেনে তাদের ছবিই প্রধানতঃ ছাত্রদের দেখানো হয়। সেইসঙ্গে কিছু কিছু অচেনা বস্তু ও প্রাণীর ছবিও থাকে। ছাত্রদের ছবিগুলি দেখিয়ে কোন বস্তু বা প্রাণীর নাম বলতে বলা হয়। ছাত্রদের উচ্চারণে ভুল থাকলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দেন। ছাত্রেরা কোন বস্তু বা প্রাণীর নাম বলতে না পারলে শিক্ষক তা বলে দেন। এর

পরবর্তী পর্যায়ে ছবির সাহায্যে কোন ঘটনা বর্ণনা করা থাকে—ছবি দেখে ছাত্রদের ঐ ঘটনা বিবৃত করতে বলা হয়। যেমন, ধরা যাক ছবিতে আঁকা আছে মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এবং শিশুটি কাঁদছে। শিক্ষক এই ছবিটির বিষয়বস্তু ছাত্রদের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন এবং এইভাবে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়বস্তুর উপর আঁকা ছবির সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। ছবির ব্যবহার ছাড়াও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষক কোন স্থান কিংবা অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে বলতে পারেন। 'গল্প-বলা' পদ্ধতিও এ ব্যাপারে শিক্ষককে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে গল্প না ব'লে ছাত্রদের গল্প বলতে বলবেন।

তৃতীয়তঃ, ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষায় লেখা বই প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে তারজন্য তাদের অক্ষর পরিচিতি ও শব্দের বানান শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বে বর্ণ-ক্রম পদ্ধতিতে (Alphabetic Method) ছাত্রদের অক্ষর-পরিচয় করানো হত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রেরা প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি চিনতে শিখত—তারপর তারা শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে পরিচিত হত। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিকে কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও অমনোবৈজ্ঞানিক ব'লে পরিত্যাগ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে বর্তমানে ছাত্রদের বাংলা ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্য **শব্দ-ক্রম পদ্ধতি** (Word Method) এবং **বাক্য-ক্রম পদ্ধতি** (Sentence Method) ব্যবহার করা হয়। শব্দ-ক্রম পদ্ধতিতে ছাত্রদের বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণ না শিখিয়ে প্রথমে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করা হয়। তারপর ঐ শব্দগুলিকে ভেঙ্গে সেগুলির বানান এবং বর্ণ সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য-ক্রম পদ্ধতির সাহায্যও গ্রহণ করা দরকার। কারণ ছাত্রেরা ভাষা-শিক্ষার সূচনায় কিছুদিন বিচ্ছিন্ন শব্দ ব্যবহার করলেও শীঘ্রই ছোট ছোট বাক্য কিংবা খণ্ড বাক্যের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। বাক্য-ক্রম পদ্ধতিতে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে এমন কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য বড় বড় ছাপা হরফে লেখা থাকে এবং বাক্যগুলির পাশে সেগুলির অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবি আঁকা থাকে। শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে ঐ বাক্যগুলি বারবার সরবে পাঠ করান এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করেন। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলবার জন্য পাঠ্য-পুস্তকে ব্যবহৃত ছাপা-অক্ষর যাতে বেশ সুস্পষ্ট আকারের হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রদের ছোট ছোট সহজ-আকারের বাক্য পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তোলার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলিতে যাতে তারা ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত জটিল বাক্য প'ড়ে তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের গোড়ার দিকে সরব পাঠের উপর গুরুত্ব দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাতে ছাত্রেরা নীরব পাঠে অভ্যস্ত হয়ে

উঠতে পারে সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তারজন্য দ্রুতপঠন-পুস্তকের (Rapid Reader) সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থতঃ, ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষা লিখে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তারজন্য তাদের প্রথমে হস্তাক্ষর লেখা-শেখানো দরকার। হাতের লেখা যাতে ভাল হয় তারজন্য ছাত্রদের নিয়মিতভাবে হাতের লেখা অভ্যাস করাতে হবে। হাতের লেখার গতি বাড়াবার জন্য এবং সঠিক বানান লিখতে ছাত্রদের অভ্যস্ত করার জন্য **শ্রুতিলিখনের** (dictation) সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছাত্রেরা যাতে লিখিতভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তারজন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্রদের রচনা লেখার অভ্যাস করাতে হবে। প্রথমদিকে এই রচনা লেখা হবে খুবই সহজ-সরল আকারের। ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে এই সময় ছাত্রেরা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক ছবির সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ক্রমশঃ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচনা লেখা আরম্ভ হবে, সেইসঙ্গে ছাত্রদের চিঠিপত্র লেখার অভ্যাসও গঠন করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে ছাত্রেরা প্রাণী বিষয়ক রচনা, ঋতু বিষয়ক রচনা, মেলা ইত্যাদির বর্ণনা প্রভৃতি লিখতে শিখবে। **'ছবির সাহায্যে গল্প-লেখা'** (Picture Composition) নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের রচনা শেখানোর একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের ডায়েরী লেখা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার অভ্যাসও করানো যেতে পারে। এছাড়া ছাত্রেরা কোন আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা কিংবা কোন বিশেষ কাজ অথবা সভা-সমিতির বিবরণ সহজ-সরল ভাষায় লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে তারজন্য সহজ সরল অথচ সাহিত্যগুণ-সমন্বিত বাংলা গদ্য এবং প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের উপযোগী ছড়া, পদ্য ও কবিতা পড়াবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে বাংলা পড়াবার দায়িত্ব দিতে হবে। শিক্ষক নিজে যদি বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে না পারেন তাহলে কখনই তিনি ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করতে পারবেন না। অনেকে মনে করেন যে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি সৌন্দর্যবোধ গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে না পারলেও প্রাথমিক স্তরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ গদ্য ও পদ্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। একথা উপলব্ধি করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সহজপাঠ' বইগুলিতে সাহিত্যরস-বিশিষ্ট গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে শিশুদের মনের খোরাক জোগাবার চেষ্টা করেছেন। **আবৃত্তি** (recitation), **সরব পাঠ** (loud reading) ও **সমবেত পাঠের** (group reading) সাহায্যে শিক্ষককে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট ক'রে তুলতে হবে।

এইভাবে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য শিক্ষককে শব্দ-ক্রম পদ্ধতি, বাক্য-ক্রম পদ্ধতি, গল্প-বলা পদ্ধতি, দেখ ও বল পদ্ধতি, আবৃত্তি প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সেইসঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষকের পাঠদান ছাত্রদের নিকট আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রণালী :

২॥ নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে কিভাবে সরস, আকর্ষণীয় ও প্রকৃতপক্ষে ভাষা শিক্ষার সহায়ক করা যায় তাহা বিবৃত করুন।

উত্তর : নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সময়কালকে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণতঃ এগারো থেকে তের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানের স্তরবিভাগ অনুযায়ী বার বছর বয়স থেকে কৈশোরকালের সূচনা হয়। অতএব নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটিকে বাল্যকাল ও কৈশোরকালের সন্ধিস্থল বলা যেতে পারে। এইসময় ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্ষমতার দ্রুত উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। ছাত্রদের জানার আগ্রহের পরিধিরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। এইসময় ছাত্রেরা একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্রপূর্ণ কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চায় অপরদিকে তেমনি শিল্প ও সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতি এদের মধ্যে একটা সক্রিয় আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা তাদের বাংলা ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের কাছে সরস ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এরজন্য যেসব ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা দরকার তা হল :—

॥ এক ॥ বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনের সুকুমারবৃত্তিগুলি চর্চা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলা ভাষায় রচিত এই স্তরের উপযোগী গল্প, কবিতা, বর্ণনামূলক রচনা প্রভৃতির মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তির যেসব উদাহরণ পাওয়া যায় তা পাঠ করে ছাত্ররা একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করে, অপরদিকে তেমনই উন্নত মানবিক গুণাবলীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। **প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পাঠের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা।** মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে এই গুণাবলীর বিকাশ যত ভালভাবে হতে পারে অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে তা কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে যাতে বেশি

সংখ্যায় মানবিক গুণাবলীসমৃদ্ধ রচনা সন্নিবেশিত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ **দুই** ॥ বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের আবেগের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষার সঙ্গে ছাত্রদের একটা প্রাণের যোগ রয়েছে। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই ছাত্রেরা তাদের আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতির অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করতে পারে। কাজেই বাংলা ভাষা যাতে ছাত্রদের আবেগ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের যথার্থ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। আবেগের প্রশিক্ষণের অর্থ হল আবেগের সুনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশের শিক্ষা। অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য-আলোচনা, পাঠচক্র, পাঠাগারের ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ছাত্রেরা যাতে মার্জিতভাবে তাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় বাংলা ভাষার শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ **তিন** ॥ বাংলা ভাষা চর্চা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের কল্পনাশক্তির যাতে বিকাশ ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। (নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট কল্পনাপ্রবণ। তারা এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানারকম স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। শিক্ষককে মাতৃভাষার সাহায্যে ছাত্রদের এই কল্পনাশক্তির বিকাশ এমনভাবে ঘটাতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে তাদের কল্পনাশক্তিকে পরিচালিত করতে পারে। এরজন্য ছাত্রেরা যাতে সৃজনশীল সাহিত্য চর্চায় নিজেদের নিয়োগ করতে পারে তারজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। ছাত্রেরা যাতে গল্প লেখা, ভ্রমণকাহিনী লেখা, ডায়েরী লেখা, কবিতা লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে তারজন্য শিক্ষককে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে।

॥ **চার** ॥ বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে সরস, আকর্ষণীয় ও ভাষা-শিক্ষার সহায়ক ক'রে তুলতে হলে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরীক্ষার যে অহেতুক ও অতিরিক্ত প্রাধান্য রয়েছে তা অপসারণ করতে হবে। প্রচলিত পরীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো হবে তা-ই নির্ধারিত হয় না, বাংলা ভাষার শিক্ষণ পদ্ধতিও এর দ্বারা নিরূপিত হয়। বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশে বর্তমানে পরীক্ষার প্রভাব এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে ছাত্র ও শিক্ষকদের বাংলা ভাষা শেখার ও শেখানোর সমস্ত প্রচেষ্টা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের কাছে পরীক্ষা-পাশের জন্য নিরানন্দময় মুখস্থ-বিদ্যার চর্চায় পর্যবসিত হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে পরীক্ষার অহিতকর প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষাকে যে একেবারে তুলে দেওয়া হবে তা নয়—তবে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপের জন্যই কেবল পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করা হবে; পরীক্ষা-পাশ করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না।

॥ পাঁচ ॥ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। এই বিষয়বস্তু যাতে ছাত্রদের বয়সের উপযোগী, বৈচিত্র্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক এবং সহজবোধ্য হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিত্তাকর্ষক ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাসের অংশবিশেষ, বর্ণনামূলক রচনা প্রভৃতি নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাত্রদের বয়স এবং চিন্তাশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক দু একটি প্রবন্ধও বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করতে হবে। কবিতা নির্বাচনের সময় ঋতুবিষয়ক, প্রকৃতির সৌন্দর্যবর্ণনামূলক, কাহিনীবর্ণনামূলক, উপদেশাত্মক, দেশাত্মবোধক প্রভৃতি কবিতা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গদ্য রচনা এবং কবিতার ভাষা যাতে সহজ-সরল এবং ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ ছয় ॥ ব্যাকরণের নিয়মকানুন শিক্ষার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ ক'রে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টিকে ছাত্রদের নিকট শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ ক'রে তোলা চলবে না। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করলেই বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না—এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী বাংলা বাক্য পুনঃপুনঃ ব্যবহারের দ্বারা আয়ত্ত করা।

॥ সাত ॥ বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এই জাতীয় পদ্ধতির মূল কথা হল ছাত্রদের আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বাংলা ভাষা-শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার জন্য এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের (Teaching aids) সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এছাড়া মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মূলনীতিগুলি, যেমন সরল থেকে জটিল বিষয়ে যাওয়ার নীতি, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ে যাওয়ার নীতি প্রভৃতি অবলম্বন করার ফলে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের কাছে সরস ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

॥ আট ॥ নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা-শিক্ষার বিষয়টিকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার জন্য ভাষা-শিক্ষার সহায়ক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর (Co-curricular Activities) সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। যেসব সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বাংলা ভাষা শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারে সেগুলির মধ্যে আবৃত্তি, বিতর্ক, অভিনয়, গল্প-বলা, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য-আলোচনা, দেওয়াল-পত্রিকা, মুদ্রিত-পত্রিকা, প্রস্তুতিহীন-বক্তৃতা (Extempore speech) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ নয় ॥ পাঠাগারের উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ভাষা-শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যেতে পারে। আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল

মাত্র পাঠ্যপুস্তকের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ছাত্রদের বাংলা-ভাষার চর্চাকে আবদ্ধ রাখলে তাদের ভাষা-শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতিও ঘটবে না এবং ভাষা শিক্ষার প্রকৃত আনন্দও তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। তার পরিবর্তে যদি আমরা পাঠাগারের সহায়তায় ছাত্রদের মনের উপযোগী শিক্ষামূলক গল্পের বই, ভ্রমণকাহিনী, আবিষ্কার কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা, মহাপুরুষদের জীবনী, বিখ্যাত উপন্যাসগুলির কালোপযোগী সংস্করণ প্রভৃতি বই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে ছাত্রেরা একদিকে যেমন তাদের কৌতূহল ও প্রাণশক্তির খোরাক সংগ্রহ করতে পারবে, অপরদিকে তেমনি এই জাতীয় পড়াশুনা তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং এর দ্বারা তাদের দ্রুত-পঠনের (Rapid Reading) ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

মাধ্যমিক স্তর :

নবম ও দশম শ্রেণীকে নিয়ে মাধ্যমিক স্তর গঠিত হয়। সাধারণতঃ ১৪ ও ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই স্তরটি হল বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার শেষ পর্যায়। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে কৈশোরকালের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। নিম্নমাধ্যমিক স্তরের তুলনায় এই স্তরের ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্ষমতার অনেক বেশি পরিপক্কতা ঘটে। এই বয়সের ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে পায় এবং তার জন্য তারা তাদের চারিপাশের সমাজ-জীবনে যে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে না। এই বয়সে কিশোরেরা এমনভাবে সমাজের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে চায় যাতে অন্যেরা তাদের যোগ্যতার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে এবং তারা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা পেতে পারে। কিশোরদের এই আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করার ব্যাপারে বাংলা ভাষা তাদের নানাভাবে সাহায্য ক'রে থাকে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাবার সময় তাদের মধ্যে যেসব বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে সেগুলির পরিতৃপ্তির ব্যাপারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থেকে যদি আমরা ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি তাহলে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টি অবশ্যই তাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। এরজন্য যেসব ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন তা হল :—

॥ এক ॥ বাংলা ভাষা শিক্ষাকে নিছক গদ্য-পদ্য পাঠ ও শব্দার্থ শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য ও সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। এরজন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যেসব গদ্যরচনা ও কবিতা আছে সেগুলির রসোপলব্ধিতে যেমন ছাত্রদের সাহায্য করতে হবে, তেমনি তাদের উপযোগী বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট সাহিত্য পুস্তক পাঠ ক'রে তারা যাতে আনন্দ লাভ করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ দুই ॥ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, আত্মঅভিব্যক্তির চাহিদা, জীবনদর্শন ও নীতিবোধের চাহিদা, নতুন জ্ঞানের চাহিদা, সমাজজীবনের চাহিদা প্রভৃতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা রয়েছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে যদি সেগুলির পরিতৃপ্তির কিছুটা ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ছাত্রদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়টি আনন্দজনক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ছাত্রেরা যদি মৌখিক ও লিখিতভাবে নিজেদের মনোভাব ও বক্তব্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে সুস্পষ্ট আকারে ও যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে তাহলে তাদের আত্মস্বীকৃতি ও আত্মঅভিব্যক্তির চাহিদার অনেকখানি পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা, বিতর্ক, সাহিত্যালোচনা, গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে আত্মপ্রকাশের আনন্দ অনুভব করতে পারে এবং অপরের প্রশংসা লাভ করতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মধ্যে যে জীবনদর্শন ও নীতিবোধের চাহিদা রয়েছে তার জন্য তাদের মনে মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জাগে। তারা জানতে চায়, কিভাবে মানুষের জীবন সার্থক হয়ে উঠতে পারে এবং মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য কি? **ছাত্রদের সৎ সাহিত্য পাঠ ও তার রসাস্বাদনে উৎসাহিত করলে তারা উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্য ও কবিতার মধ্যে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে সচেষ্ট হবে।**

॥ তিন ॥ নবম ও দশম শ্রেণীর কিশোরদের মধ্যে অজানাকে জানার আকাঙ্খা খুব প্রবল থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের অসংখ্য অজানা তথ্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বাংলা ভাষায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন রকম বই প'ড়ে ছাত্রেরা তাদের জ্ঞানস্পৃহাকে চরিতার্থ করতে পারে। বাংলা ভাষার উপর ছাত্রেরা যদি সাবলীল অধিকার অর্জন করতে না পারে তাহলে কখনই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই প'ড়ে আনন্দলাভ করতে পারবে না। কাজেই বাংলা ভাষার শিক্ষককে বিভিন্নপ্রকার মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বাংলা ভাষায় প্রচলিত বাক্যের গঠন, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, চলিত ও সাধুভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সঙ্গে ছাত্রদের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাতে হবে যাতে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের প্রবণতা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে।

॥ চার ॥ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও মননশীলতার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত গদ্যরচনা ও কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন বীরত্ব, সাহসিকতা, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার উন্নত ভাবের প্রকাশ থাকবে, অপরদিকে তেমনি প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, কুসংস্কারমুক্ত সমাজচিন্তা, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনাও যাতে স্থান লাভ করে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচিত এইরূপ উন্নতভাব সম্বলিত গদ্য ও পদ্যরচনাগুলি এমনভাবে ছাত্রদের পড়াতে

হবে যাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের মনে যথার্থ অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে।

॥ পাঁচ ॥ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাবার সময় আরোহী পদ্ধতির (Inductive Method) সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলি ছাত্রেরা নিজেরাই তৈরী করতে পারে। এরজন্য শিক্ষক প্রথমে ছাত্রদের সামনে কতকগুলি উদাহরণ উপস্থিত করেন এবং উপযুক্ত প্রশ্নের সাহায্যে তিনি ছাত্রদের ঐ উদাহরণগুলি থেকে সূত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বের ক'রে নিতে সাহায্য করেন। পরে ঐ তথ্যের সাহায্যে ছাত্রেরা সূত্র গঠন করে। এইভাবে ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে তারা না-বুঝে সূত্র মুখস্থ করার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ করে এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ ছয় ॥ ছাত্রদের রচনা (composition) শিক্ষাদান করার সময় তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিষয়ের (topic) উপর রচনা লেখার সুযোগ দিতে হবে। অনুবাদ-চর্চার (Translation) সময় যাতে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ছাত্রেরা মূল বক্তব্য বিষয়টি ভাষান্তরিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরের ছাত্রদের দ্রুত-পঠনের (Rapid Reading) অভ্যাস গ'ড়ে তোলার জন্য পাঠাগারের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রেরা যাতে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের নামকরা বইগুলি প'ড়ে সৎ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং ঐসব পুস্তকে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে পারে তারজন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

॥ সাত ॥ নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শেখাবার সময় মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অপেক্ষা তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ এই বয়সের ছাত্রদের যুক্তি ও বিচারশক্তির যথেষ্ট পরিপক্বতা ঘটেছে। তবে শিক্ষককে প্রয়োজনবোধে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যও গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি শিক্ষক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে তারপর তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধ্যাপক কে. কে. মুখার্জীর ভাষায়, "Every teacher should make it a point to go beyond the Psychological method as soon as possible to improve the child-mind and make it logical, but it is definitely true that he must begin by having recourse to the Psychological method at the outset."।

বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণের (Teaching aids) সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

॥ আট ॥ ভাষা-শিক্ষার সহায়ক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর (Co-curricular

Activities) সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য যেসব সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হবে সেগুলি হল আবৃত্তি, বিতর্ক, অভিনয়, গল্প-বলা, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য-আলোচনা, দেওয়াল-পত্রিকা, মুদ্রিত-পত্রিকা, প্রস্তুতিহীন বক্তৃতা (Extempore speech), সাময়িক পত্র-পত্রিকা (Periodicals) পাঠ প্রভৃতি। ছাত্রদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় কিংবা তাদের পাঠ্য তালিকায় বহির্ভূত অথচ তাদের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিতর্ক অথবা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যারা বিতর্ক ও অভিনয়ে আগ্রহী নয় তাদের জন্য আবৃত্তি, সঙ্গীত, সাহিত্য-রচনা, সাহিত্য-আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে যার যে-বিষয়ে আগ্রহ আছে তাকে সেই বিষয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৩॥ বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের প্রথম স্তরের পাঠ্য-পুস্তক ও পাঠদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করুন। [B. U. B. Ed 1970.]

উত্তর: বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম স্তর অথবা প্রাথমিক স্তর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই স্তরের ছাত্রদের যথাযথভাবে বাংলা ভাষা শেখাতে হলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সঠিক পাঠদান পদ্ধতি অবলম্বন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করার সময় তাদের বয়সের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। বয়স অনুসারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রেরা বাল্যকালের অন্তর্গত। বাল্যকালে ছাত্রদের মধ্যে অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চেনবার প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। বাল্যকালে ছাত্রেরা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সবকিছু জানতে চায়, 'বুঝতে' চায় এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপলব্ধি করতে চায়। পারিপার্শ্বিক জগতকে জানা, চেনা ও বোঝার ব্যাপারে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাভাষা ছাত্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠদান-পদ্ধতি অবলম্বন করার সময় শিক্ষককে এইসব বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য:

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ছড়ার সাহায্যে বর্ণপরিচয় করানোর জন্য ছড়া ও ছবির ব্যবহার করা হয়। ছড়াগুলি যাতে সহজ-সরল ও যুক্তাক্ষর-বর্জিত ভাষায় রচিত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সাদাকালো রং-এর ছবি অপেক্ষা রঙীন ছবির আকর্ষণ অনেক বেশি। সেইজন্য ছড়াগুলির পাশে রঙীন ছবি ব্যবহার করতে হবে। ছাত্রেরা

যাতে বাংলা বর্ণের আকৃতির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে পারে তারজন্য পাঠ্যপুস্তকের হরফগুলি বড় বড় আকারের হবে। সামগ্রিকভাবে বাংলা পাঠ্যপুস্তককে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রচ্ছদপট, কাগজ ও বাঁধাইয়ের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ম নির্দিষ্ট বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ছোটদের উপযোগী সহজ এবং মজার গল্প, ছড়া, হাসির কবিতা, পরিবেশ-পরিচিতি, হিতোপদেশের গল্প, প্রকৃতি ও পরিবেশ-বর্ণনামূলক কবিতা প্রভৃতি যাতে স্থানলাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে ছবির ব্যবহার, হরফের আকৃতি, প্রচ্ছদপট, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে ছাত্রেরা সহজ-সরল ভাষায় লেখা বাংলা পাঠ্যপুস্তক মোটামুটিভাবে পড়তে শেখে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে তাদের বাংলা বই পড়ার ক্ষমতার আরও উন্নতি হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্ম বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। এই পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ছাত্রেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দুই-ই শিক্ষা করবে। ছাত্রদের গদ্যসাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য উপদেশমূলক গল্প, রূপকথার গল্প, মহাপুরুষদের আত্মজীবনীর অংশবিশেষ, পরিবেশ-পরিচিতিমূলক রচনা, শিকার-কাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সহজ-সরল প্রবন্ধ প্রভৃতি এবং পদ্যসাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য প্রকৃতি-বর্ণনামূলক কবিতা, শিশুমনের কল্পনাবিষয়ক কবিতা, প্রার্থনা-বিষয়ক কবিতা, গ্রাম অথবা শহরের বর্ণনামূলক কবিতা, ঋতুবিষয়ক কবিতা, কাহিনী-বর্ণনামূলক কবিতা প্রভৃতি বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলন করতে হবে। এই সমস্ত লেখাগুলি যাতে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা থেকে সংগ্রহ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। লেখাগুলির সঙ্গে রঙীন ছবি থাকবে। হরফের আকৃতি পূর্ববর্তী শ্রেণীর তুলনায় ছোট হবে। প্রচ্ছদপট, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি যাতে উন্নতধরনের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের উপযোগী বিভিন্ন পাঠদান-পদ্ধতি ঃ

১। **বর্ণ-ক্রম পদ্ধতি** (Alphabetic Method) :—ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বহুকাল যাবত অনুসৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই পদ্ধতিটির অসারতা প্রমাণিত হলেও এটি এখনও বাংলা ভাষা শিক্ষার সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুকে বাংলা বর্ণমালার ক্রম-অনুযায়ী প্রথমে স্বরবর্ণ ও তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো হয়। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা ছাত্রেরা বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে যখন ভালভাবে পরিচিত হয় তখন তাদের া, ু, ূ, ি, ী প্রভৃতি মাত্রার সাহায্যে শব্দের বানান শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ণ-ক্রম পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল ছাত্রদের বর্ণের আকৃতি ও উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি (sound) উচ্চারণের শিক্ষাও দেওয়া হয় ব'লে অনেকে এই পদ্ধতিকে **ধ্বনি শিক্ষার পদ্ধতি** (Phonic Method)

এই নামেও অভিহিত করেন। এই পদ্ধতির একমাত্র গুণ হল—এর সাহায্যে ছাত্রেরা ভাষা শিক্ষার শুরু থেকেই শব্দের বানান শেখবার সুযোগ পায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক কার্যকলাপে পরিণত করে বলে এটি একটি অমনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের কিছু করবার থাকে না। তাছাড়া অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিকভাবে এই পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা করতে হয় ব'লে ছাত্রদের মনে আনন্দের পরিবর্তে ইহা যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করে। তথাপি শিক্ষকের দিক থেকে এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজসাধ্য ব'লে এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

২। **শব্দ-ক্রম পদ্ধতি** (Word Method):—এই পদ্ধতিতে 'শব্দ'কে ভাষার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র একক ব'লে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য বর্ণের পরিবর্তে ছাত্রদের শব্দ শেখানোই হল এই পদ্ধতির মূলকথা। ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার শব্দ শেখানোর জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত নানারকম শব্দের মধ্য থেকে কিছু শব্দ নির্বাচন ক'রে ছাপা-অক্ষরে সেগুলির লিখিত রূপ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয়। তারপর শিক্ষক ছাত্রদের ঐ শব্দগুলির উচ্চারণ শিক্ষা দেন। এইভাবে ছাত্রেরা শব্দগুলির চাক্ষুষরূপের (visual form) সঙ্গে পরিচিত হয় এবং কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর প্রতীক হিসাবে সেগুলিকে চিনতে শেখে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বানান ক'রে শব্দ শিক্ষা করতে হয় না ব'লে তারা এইভাবে ভাষা শিখতে আগ্রহ বোধ করে। তবে এই পদ্ধতির ত্রুটি হ'ল এতে কোন শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে উপেক্ষা ক'রে ছাত্রদের মনে সমগ্র-রূপ গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে কোন শব্দকে চিনতে হলে তার অন্তর্গত বর্ণগুলি এবং তাদের ক্রমকে চিনতে হবে। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে বানান ক'রে শব্দ উচ্চারণ করার রীতিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।[১] শব্দ-ক্রম পদ্ধতিতে 'দেখ এবং বল' এই নীতি অনুসরণ করা হয় এবং শব্দের সমগ্র-রূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'ফ্ল্যাশ কার্ড' (flash card), ঘটনা-প্রধান খেলাধূলা (action games), বস্তুর গায়ে শব্দ লিখে দেওয়া (labelling objects) প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান গুণ হল এর দ্বারা সহজেই ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করা যায়। আর এটির সবচেয়ে বড় দোষ হল এর দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে একটি একটি ক'রে শব্দ পড়বার খারাপ অভ্যাস তৈরী হয়।

৩। **বাক্য-ক্রম পদ্ধতি** (Sentence Method):—এই পদ্ধতিতে শব্দের পরিবর্তে বাক্যকে চিন্তন প্রক্রিয়া এবং ভাষাকে একক হিসাবে ধরা হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শিশুরা বাক্যের সাহায্যেই কথা বলে, বিচ্ছিন্ন শব্দের সাহায্যে নয়।

১। This 'whole word' recognition is usually referred so as the 'Look and Say' principle, but it is as much the alphabetic, because ultimately the recognition of a word depends upon recognition of the component letters and their sequence.
—Thompson and Wyatt

শিশুদের কথা বলার এই স্বাভাবিক রীতিকে স্বীকার ক'রে নিয়েই তাদের ভাষা শেখানোর জন্য বাক্য-ক্রম পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সমগ্র বাক্যের অর্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সেইসঙ্গে বাক্যের মধ্যে শব্দের যে বিন্যাস থাকে তার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে সমগ্র বাক্যের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে তারপর বাক্যটিকে ভেঙ্গে ফেলে শব্দগুলিকে পৃথক করে দেখানো হয়। বাক্যগুলিকে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার সময় উপযুক্ত ছবির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষা শেখাবার জন্য সুনির্বাচিত বাক্য-সম্বলিত উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য প্রথমে নির্বাচিত বাক্যগুলিকে বড় বড় হরফে লিখে ছাত্রদের সামনে এক-একটি ক'রে উপস্থিত করা হয়। বাক্যগুলির পাশে সেগুলির বক্তব্য অনুযায়ী ছবি আঁকা থাকে। শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে এক-একটি বাক্য বারবার উচ্চারণ করান। তারফলে ছাত্রেরা একদিকে যেমন বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ শেখে অপরদিকে তেমনি শব্দগুলির লিখিত রূপ বারবার দেখার ফলে সেগুলির অন্তর্গত বর্ণের রেখা-বিন্যাস সম্পর্কে তাদের মনে একটা ধারণা জন্মে। বর্তমানে এই পদ্ধতিটি শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই পদ্ধতির গুণগুলি হল :

(ক) এই পদ্ধতিতে সমগ্র থেকে অংশে যাওয়ার মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসরণ করা হয়।

(খ) ইহা দ্রুত নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করতে ছাত্রদের সাহায্য করে।

(গ) ইহা বাংলা ভাষা পাঠের গতি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

এই পদ্ধতির দোষগুলি নিম্নরূপ :

(ক) এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের শব্দভাণ্ডার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় না।

(খ) ছাত্রেরা দৈনন্দিন জীবনে যে সব শব্দ ব্যবহার করে তারমধ্যে খুব অল্প-সংখ্যক শব্দই এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের শেখানো যায়।

৪। **গল্প-বলা পদ্ধতি (Story Method) :—**এই পদ্ধতিতে গল্পের প্রতি শিশুদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে ভাষা শিক্ষা দেবার সময় তার সাহায্য নেওয়া হয়। শিশুরা গল্প শুনতে খুবই ভালবাসে। সেইজন্য গল্পের আকারে পড়বার বিষয়বস্তু ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয়। শিক্ষক ছাত্রদের এমনভাবে পরিচালিত করেন যাতে তারা গল্পে ব্যবহৃত বাক্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং সেগুলির অর্থ বুঝতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা দেবার সময় গল্পের বিষয়বস্তু যাতে আকর্ষণীয় এবং ছাত্রদের বয়সের উপযোগী হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। গল্পে ব্যবহৃত বাক্যগুলি হবে ছোট ছোট এবং সহজ-সরল শব্দ সম্বলিত। গল্পগুলির আকার ছোট হবে এবং সেগুলিতে শিশুমনের উপযুক্ত খোরাক থাকবে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি শিশুদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এই পদ্ধতির দোষ ও গুণগুলি বাক্য-ক্রম পদ্ধতির অনুরূপ।

৫। **ধ্বনিভিত্তিক পদ্ধতি** (Phonetic Method) :—এই পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের ধ্বনির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ছাত্রদের ঐ ধ্বনিগুলি শেখাবার চেষ্টা করা হয়। এরজন্য যেসব শব্দের শেষে একই রকমের ধ্বনি আছে সেগুলির মধ্য থেকে কিছু শব্দ নির্বাচন ক'রে ছাত্রদের দিয়ে সেগুলি বারবার উচ্চারণ করানো হয়। যেমন—বল, ফল, জল, চল, দল, ইত্যাদি।

মাত্রাচিহ্নযুক্ত শব্দগুলিও এইভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে ; যেমন—ফুল, ভুল, মূল, চুল, তুল, ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতে ভাষা-শিক্ষা দিলে ছাত্রদের মধ্যে ছন্দ ও মিল সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করার সময় ধ্বনির সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে যাতে ছাত্রদের অজানা শব্দ নির্বাচন করতে না হয় সেদিকে বিশেষ-ভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

৬। **'দেখ এবং বল পদ্ধতি** (Look and Say Method) :—এই পদ্ধতিতে নানারকমের ছবির সাহায্যে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের নানারকম বস্তু অথবা প্রাণীর ছবি দেখিয়ে সেগুলির নাম বলতে বলা হয়। ছাত্রেরা তাদের চারপাশে যেসব বস্তু ও প্রাণী দেখতে পায় কিংবা যেসব বস্তু ও প্রাণী তারা চেনে তাদের ছবিই প্রধানতঃ ছাত্রদের দেখানো হয়। ছাত্রেরা কোন বস্তু অথবা প্রাণীর নাম উচ্চারণ করতে ভুল করলে শিক্ষক তা সংশোধন ক'রে দেন। শিক্ষক ছাত্রদের ছবিতে অঙ্কিত বস্তু বা প্রাণীর নাম বারবার উচ্চারণ করতে বলবেন। তার ফলে ঐ নামের ধ্বনিরূপের সঙ্গে ছাত্রেরা পরিচিত হবে। তারপর ঐ নাম বা শব্দটিকে বড় বড় হরফে লিখে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। ছাত্রেরা ঐ শব্দটির বর্ণবিন্যাস পর্যবেক্ষণ করে বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। ছবির সাহায্যে ছাত্রদের সামনে যে শব্দগুলি উপস্থিত করা হবে সেগুলি সহজ থেকে কঠিন এই ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে। শব্দগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে ছাত্রেরা যেসব বর্ণ শিখবে সেগুলির সাহায্যে পরে তাদের আবার ঐ শব্দগুলি গঠন করতে দেওয়া হবে। তারপর ঐ শব্দগুলিকে অবলম্বন করে তাদের বাক্যগঠন করার শিক্ষাও দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা আগ্রহের সঙ্গে বর্ণ, বানান ইত্যাদি শিখতে পারে। কিন্তু ছাত্রেরা মনোযোগের সঙ্গে শব্দের গঠন লক্ষ্য করছে কিনা শিক্ষককে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭। **আবৃত্তি** (Recitation) :—ছড়ার প্রতি শিশুদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। সেইজন্য ভাষা-শিক্ষা শুরু হবার অনেক আগেই শিশুরা মা-ঠাকুমার কাছ থেকে মুখে-মুখে অনেক ছড়া শিখে ফেলে। ছড়া এবং শিশুদের উপযোগী কবিতা যদি শিক্ষক ভালভাবে ছাত্রদের সম্মুখে আবৃত্তি করতে পারেন তাহলে তারা বাংলা ভাষা শেখার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করবে এবং শিক্ষককে অনুকরণ ক'রে ঐ ছড়া ও কবিতাগুলি সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে শিখবে। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করার সময় শিক্ষককে সুস্পষ্ট উচ্চারণ, ছন্দ, যতি, ভাব প্রভৃতির দিকে বিশেষভাবে

লক্ষ্য রাখতে হবে। ছড়া ও কবিতাগুলি আবৃত্তি করার সময় শিক্ষক উপযুক্ত ছবির সাহায্য গ্রহণ করবেন যাতে ছড়া ও কবিতার বিষয়বস্তু আঁকা থাকবে। ছবিগুলির পাশে সংশ্লিষ্ট ছড়া ও কবিতাগুলি বড় বড় হরফে লেখা থাকবে। এক-একটি ছড়া কিংবা কবিতা মুখস্থ করার পর ছাত্রেরা সেটির লিখিত রূপ পর্যবেক্ষণ করে ধীরে ধীরে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। ছড়ার প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে বলে আবৃত্তির সাহায্যে ভাষা-শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা ভাষা শিখতে যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করে।

৮। **লিঙ্গোয়াফোন পদ্ধতি** (Linguaphone Method) :—এই পদ্ধতিতে ভাষা শেখানোর জন্য গ্রামোফোন কিংবা রেকর্ড-প্লেয়ারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের ভাষা শেখানোর জন্য কতকগুলি মনো-বিজ্ঞানসম্মত পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করে উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা সেগুলি রেকর্ড করা হয়। পরে ঐ রেকর্ডগুলি বাজিয়ে ছাত্রদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল, এতে ছাত্রেরা বিশেষজ্ঞ (Expert) শিক্ষকদের উন্নতধরনের পাঠদানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু ভাষা শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয় না। কারণ শিক্ষক নিজে যেমন ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর পড়ানোর ধারাকে কিছুটা অদল-বদল ক'রে নিতে পারেন, লিঙ্গোয়াফোন পদ্ধতিতে তার কোন অবকাশ থাকে না। তাছাড়া অল্পবয়সী ছাত্রদের কাছে এই পদ্ধতি নিষ্প্রাণ ও একঘেয়ে বলে মনে হতে পারে।

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগ (scope) ও মানের (standard) পার্থক্য :

বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের কৌশল অবলম্বন করতে হলে শিক্ষককে ছাত্রদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কিরূপ সুযোগ (scope) রয়েছে তা জানতে হবে এবং সেইসঙ্গে এই স্তরগুলিতে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান (standard) অর্থাৎ বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ছাত্রদের ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) **প্রাক-প্রাথমিক স্তর** (২ থেকে ৫ বছর); (২) **প্রাথমিক স্তর** (৬ থেকে ১০ বছর—প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী); (৩) **নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর** (১১ থেকে ১৩ বছর—ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী); এবং (৪) **মাধ্যমিক স্তর** (১৪ থেকে ১৫ বছর—নবম ও দশম শ্রেণী)।

॥ এক ॥ **প্রাক-প্রাথমিক স্তর** (২ থেকে ৫ বছর) :—জন্মের পর বিভিন্ন শিশুর মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশ ঠিক একইভাবে ঘটেনা। তবে মোটামুটি-ভাবে একজন সুস্থ-সবল শিশু নয়-দশ মাস বয়স থেকেই দু-একটি অসংলগ্ন ধ্বনি উচ্চারণ

করতে শেখে। তারপর এক বছর থেকে দু বছর বয়সের মধ্যে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা বস্তুবাচক বিচ্ছিন্ন শব্দসমূহ উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে শিশুর ভাষা শিক্ষার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। দেড় কিংবা দু বছর বয়স থেকে শিশুরা মোটামুটিভাবে দুই-পদ-বিশিষ্ট বাক্যের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে পারে। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে শিক্ষাবিদেরা শিশুদের ভাষাশিক্ষার **প্রস্তুতিকাল** হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে শিশুরা বড়দের অনুকরণ ক'রে তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাছাড়া তাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই তাদের মেলামেশার পরিধি বাড়তে থাকে ততই ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য এই বয়সের শিশুদের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণ কথা বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই স্তরটি অনেকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরের মত। কারণ বড়দের অনুকরণ করে অনেক কথা শিশুরা মুখে বললেও তখনও পর্যন্ত অনেক কথাই তারা স্থায়ীভাবে রপ্ত করতে পারেনি। এই স্তরের শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেবার সময় এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে এই বয়সের শিশুদের জীবনে মাতৃস্নেহের প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ভাষাশিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষিকাদের উপর ন্যস্ত করতে পারলে ভাল হয়।

বাংলা ভাষা শিক্ষা-দানের সুযোগ

এই স্তরের শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। তা না হলে তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। দেড় বছর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত শিশুরা সাধারণতঃ এক-পদ-বিশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। দেড় বছর বয়সের পর শিশুদের ব্যবহৃত বাক্য প্রথমে দুই-পদ-বিশিষ্ট তারপর তিন-পদ-বিশিষ্ট এইভাবে ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে থাকে। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ব্যবহৃত বাক্যের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তিন বছর বয়স থেকে শিশুরা তিন/চার-পদ-বিশিষ্ট ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করতে পারে। সর্বনাম, ক্রিয়া ও বচনের সঠিক ব্যবহারও এইসময় থেকে তারা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে। চার বছর বয়স থেকে শিশুরা ভালভাবে বাংলা বাক্য ব্যবহার করতে শেখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত বাক্যে ছয় কিংবা আটটি পর্যন্ত শব্দ থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেবার সময় তারা যাতে যথাযথভাবে তাদের বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইসঙ্গে ভাষা শিক্ষার প্রস্তুতিপর্বে শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় (যেমন অস্পষ্ট কিংবা ভুল উচ্চারণ, তোতলানো, দ্রুত কথা বলা, আধ-আধ স্বরে কথা বলা প্রভৃতি) সেগুলি যত্নসহকারে সংশোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্তরের ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার জন্য খেলাধূলা, ছবি, ছড়া, গান, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা ভাষা-শিক্ষার মান

॥ দুই ॥ **প্রাথমিক স্তর** (৬ থেকে ১০ বছর : প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) :— এই স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কিরূপ সুযোগ রয়েছে তা জানতে হলে বাল্যকালে ছাত্রদের মধ্যে কি কি চাহিদা দেখা দেয় এবং বাল্যকালের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি কি সে সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। বয়স অনুসারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রেরা বাল্যকালের অন্তর্গত। বাল্যকালে শিশুদের মধ্যে যেসব চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির মধ্যে ভালবাসার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, প্রশংসালাভের চাহিদা, নূতনত্বের চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাল্যকালে শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক মেলামেশার পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের বাইরের বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ এই দুই সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা এবং লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের ঐসব চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটে। এ ব্যাপারে মাতৃভাষা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে। বাল্যকালে শিশুদের মধ্যে কতকগুলি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইসময় শিশুদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য খুব বেশি থাকে। তাদের মধ্যে অজানাকে জানবার ও অচেনাকে চেনবার প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। বাল্যকালে শিশুরা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায় এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপলব্ধি করতে চায়। পারিপার্শ্বিক জগতকে চেনা, জানা ও বোঝার ব্যাপারে মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শিশুদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। বাল্যকালে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সময় শিক্ষককে এই বয়সের ছাত্রদের মানসিক চাহিদা ও তাদের সহজাত সামাজিক প্রবণতাগুলির কথা মনে রেখে তাদের জন্য বাংলা ভাষার উপযুক্ত পাঠ্যসূচী রচনা করতে হবে। এই পাঠ্যসূচীতে একদিকে যেমন এই বয়সের ছাত্রদের উপযোগী প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি থাকবে, অপরদিকে তেমনি তাদের শিশুমনের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো, তাদের প্রাণচাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ, তাদের সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির সঙ্গে বাংলা ভাষা-শিক্ষার সংযোগ ঘটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য খেলাধূলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কাজকর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলা ভাষা শিক্ষা-দানের সুযোগ

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান অনুযায়ী শিক্ষককে তাদের এই ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। প্রথম শ্রেণীর গোড়ার দিকেই ছাত্রদের অক্ষর পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তারপর তারা ছোট ছোট বাক্য, ছড়া, গল্প ইত্যাদি পড়তে শেখে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যতই ছাত্রেরা বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে ততই তাদের লিখিত ভাষা পড়বার ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

বাংলা ভাষা-শিক্ষার মান

পায়। প্রাথমিক স্তরের প্রথম দিকে সরব পাঠের (loud reading) প্রাধান্য থাকলেও তৃতীয় শ্রেণী থেকে যাতে তাদের মধ্যে নীরব পাঠের (silent reading) অভ্যাস গড়ে ওঠে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে শব্দের অর্থ, শব্দের বানান, জানা-শব্দের পরিধি, বিভিন্নপ্রকার বাক্যের অর্থগ্রহণের ক্ষমতা, বাক্য রচনার ক্ষমতা, সরব ও নীরব পাঠের ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে যে মানের পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষককে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তা না হলে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না।

॥ তিন ॥ **নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর** (১১ থেকে ১৩ বছর : ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) :—এই স্তরের ছাত্রেরা বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। সেইজন্য এই স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগের সঙ্গে কৈশোরকালের ছেলেমেয়েদের মানসিক বৈশিষ্ট্য ও চাহিদাগুলির বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। কৈশোরকালে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্ষমতার যথেষ্ট উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। মানুষের জীবনে কৈশোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়েই ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। কৈশোরে ছেলেমেয়েরা উন্নত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদাগুলি হল স্বাধীনতার চাহিদা, নতুন জ্ঞানের চাহিদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, নীতিবোধের চাহিদা, জীবনদর্শনের চাহিদা প্রভৃতি। কৈশোরকালে ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে পায় এবং তারা তাদের চারপাশে যে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে না। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের এইজাতীয় মানসিকতা ও বহুমুখী চাহিদাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ঠিক কতখানি সুযোগ রয়েছে তা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে মাতৃভাষা-ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সেইজন্য কিশোর বয়সের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাবার সময় বাংলা ভাষার চর্চার দ্বারা যাতে তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্য পাঠ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবার এবং তাদের সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্য-রস আস্বাদন করার ক্ষমতার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেইসঙ্গে আবৃত্তি, অভিনয়, গান, সাহিত্য-রচনা, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য-আলোচনা, দেওয়াল পত্রিকা ও মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি সহপাঠ-ক্রমিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান সম্পর্কে শিক্ষককে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এই স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান এমন হবে যাতে

তারা—(১) স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সঠিক স্বরভঙ্গির সাহায্যে পদ্য ও গদ্য রচনা এমনভাবে পড়তে পারে যাতে শ্রোতারা তার অর্থ বুঝতে পারে ; (২) বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে ; (৩) তাদের জ্ঞান-পরিধি বহির্ভূত নয় এমন পাঠ্যবিষয় নীরবে প'ড়ে বুঝতে পারে ; (৪) স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষরে এবং মোটামুটি দ্রুত গতিতে বাংলা ভাষা লিখতে পারে এবং (৫) কোন ঘটনা, অভিজ্ঞতা, স্থান কিংবা বস্তু সম্পর্কে সহজ ও সাবলীল বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে পারে এবং ব্যবহারিক বিষয়ে সহজ ভাষায় চিঠিপত্র রচনা করতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও যে মানের তারতম্য থাকবে শিক্ষককে সে কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

বাংলা ভাষা-শিক্ষার মান

॥ চার ॥ মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৫ বছর : নবম ও দশম শ্রেণী) :—

এই স্তরের ছাত্রদের মধ্যে কৈশোরকালের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরও পরিণত আকারে প্রকাশ পায়। এই বয়সের ছাত্রদের মধ্যে আত্মস্বীকৃতি ও আত্মঅভিব্যক্তির যে প্রবল চাহিদা রয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় এই স্তরের ছাত্রদের মধ্যে জীবনদর্শনের চাহিদা, নীতিবোধের চাহিদা, নতুন জ্ঞানের চাহিদা, বৃহত্তর সমাজজীবনে অংশগ্রহণের চাহিদা প্রভৃতি চাহিদাগুলি আরও তীব্রভাবে দেখা দেয়। সেইজন্য এই স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রেরা সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন এবং তা থেকে আনন্দ লাভ করতে পারে এবং সৎ সাহিত্যের মধ্যে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে উৎসাহিত হয়। এই বয়সের ছাত্রদের মধ্যে অজানাকে জানাবার যে তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে তা পরিতৃপ্ত করার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার মানকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ছাত্রেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের প্রবণতা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও মননশীলতার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। সেইসঙ্গে এই বয়সের ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার অনুশীলন এবং সৃজনক্ষমতার বিকাশের জন্য বিতর্ক, আবৃত্তি, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য-রচনা, সাহিত্য-আলোচনা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার মান পূর্ববর্তী স্তরের মানের চেয়ে আরও উন্নত হবে। এই স্তরের ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষার মৌল গঠন, ব্যাকরণের মূল রীতি ও বাগ্বিধির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরের ছাত্রেরা যেন—(১) পূর্বে দেখা এবং অ-দেখা রচনাংশ দ্রুত ও যথার্থ স্বরভঙ্গিতে পাঠ ক'রে শ্রোতার কাছে তার অর্থ পরিস্ফুট করতে পারে ; (২) নীরবে দ্রুত পাঠ

ক'রে রচনার অর্থ বুঝতে পারে ; (৩) নিজের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং (৪) বর্ণনামূলক এবং চিন্তা ও বিশ্লেষণমূলক রচনার মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখাবার সময় শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে যে **যথাযোগ্যভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোহর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ বহুলাংশে ইহারই উপর নির্ভর করে।**

॥ অনুশীলনী ॥

১। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সম্যক আত্মবিকাশের জন্য শিক্ষার বাহনরূপে ও কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের মাতৃভাষার কিরূপ শিক্ষা দিবেন? [C. U. B. T. 1963]

২। নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে কিভাবে সরস, আকর্ষণীয় ও প্রকৃতপক্ষে ভাষা-শিক্ষার সহায়ক করা যায় তাহা বিবৃত করুন। [B. U. B. T. 1968]

৩। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার সুযোগ (scope) ও মানের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৫ [ক]

লেখার ও বাগ্‌যন্ত্রের কাজ।

[Written and Oral Work :

(i) Loud reading and silent reading : Qualities of good reading—accuracy, speed, comprehension, expression—Intensive and Extensive reading—Rapid reading ;

Types of prose reading : stories, essays, other forms—Methods of teaching ; Types of poetry —Nursery Rhymes—Methods of teaching—Literary appreciation ;

: Requisites of a good reader.]

সরব পাঠ ও নীরব পাঠ : আদর্শ পাঠের গুণাবলী—নির্ভুলতা, গতি, উপলব্ধি, অভিব্যক্তি—পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও ব্যাপক পাঠ—দ্রুত পঠন ;

বাংলা গদ্যের শ্রেণীবিভাগ : ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি—গদ্য শিক্ষাদানের পদ্ধতি ;

বাংলা কবিতার শ্রেণীবিভাগ : ছড়া—কবিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতি—সাহিত্যরসাস্বাদন ; ভাল পাঠ্যপুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

॥ সরব পাঠ ও নীরব পাঠ ॥

১॥ ভাষা শিক্ষায় পঠনের গুরুত্ব কতখানি এবং এই প্রসঙ্গে সরব পঠনের উপযোগিতাই বা কতদূর —একজন ভাষা-শিক্ষকরূপে আপনি প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করুন। [C. U. B. Ed. 1975]

উত্তর : ভাষার সাহায্যে আমরা অন্যের কাছে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করি, কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করি। ভাষার দুটি রূপ—একটি মৌখিক, অপরটি লিখিত। একটি ভাষা-পরিবেশে (language environment) জন্মগ্রহণ করার ফলে কোন ব্যক্তি তার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঐ ভাষায় কথা বলতে শেখে। মুখের কথার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য কোন ভাষার প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০-এর মত শব্দ এবং ২৫০ থেকে ৩০০-র মত বাক্যের ছাঁচ (pattern) আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু যখন আমরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞান-

বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে চাই, তখন ভাষায় লিখিত রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হয়। এরজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় বর্ণ-পরিচিতির, তারপর ধীরে ধীরে শব্দ ও বাক্যের লিখিত রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন সে সরবে বানান ক'রে শব্দকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ ক'রে কোন বই পড়ে পঠিত বস্তুর অর্থ বোঝবার চেষ্টা করে। ডঃ মাইকেল ওয়েস্ট পঠনকে দেখা-ধ্বনিউৎপাদন-অর্থউপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া ("process of sight-sound-sense") হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পঠনের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠকের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। ভাষার লিখিত রূপ পর্যবেক্ষণ ক'রে তার অর্থ বুঝতে পারাই হল পঠনের উদ্দেশ্য। শিশুর পড়বার অভ্যাস যত পরিণত হতে থাকে ততই সে পূর্বাপেক্ষা কম সময়ে পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারে।

পঠনের প্রয়োজনীয়তা

কোন ভাষাশিক্ষার আশু লক্ষ্য চারটি—(১) কানে শুনে ভাষার অর্থ বুঝতে পারা; (২) কথা ব'লে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা; (৩) পঠনের সাহায্যে ভাষার অর্থ বুঝতে পারা; এবং (৪) লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে প্রথম দুটিতে অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও দৈনন্দিন জীবনে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বেশ কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু শেষ দুটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষাগত দক্ষতা বিচারের মাপকাঠি হল সে ভাষার লিখিত রূপ প'ড়ে কতখানি বুঝতে পারে এবং লেখার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য কতটা প্রকাশ করতে পারে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে আবার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে লিখন (writing) অপেক্ষা পঠনের (reading) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে লিখনের প্রয়োজনীয়তা কিছু চিঠিপত্র লেখা, দরখাস্ত লেখা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেকটি শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কাজেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের গুরুত্ব যে অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পঠনের সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ ক'রে আমরা মানবসমাজের বিপুল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হই। পঠনের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে। পঠনের অভ্যাস আমাদের অবসর বিনোদনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সাহিত্য ও কাব্যপাঠের মাধ্যমে আমাদের চিত্তের প্রসার ঘটে এবং আমাদের সৌন্দর্য ও রুচিবোধ গ'ড়ে ওঠে। অতএব পঠন আমাদের আত্মবিকাশ ও ব্যক্তিত্বগঠনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এছাড়া ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে পঠনের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে; কারণ পঠনের সাহায্যে আমরা নতুন নতুন শব্দ ও বাক্যরীতির সঙ্গে পরিচিত হই এবং তারফলে আমাদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে পাঠের দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে পঠনের গুরুত্ব

ছাত্রদের মধ্যে পাঠের দক্ষতা সৃষ্টি করতে না পারলে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ই তারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। পাঠের দক্ষতা অর্জন করার পর ছাত্রদের পাঠের অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। এই পাঠের অভ্যাসই আমাদের সারা জীবন ধ'রে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। অতএব ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পঠন অথবা পাঠ প্রধানতঃ দু'প্রকারের—**সরব পাঠ** (loud reading) এবং **নীরব পাঠ** (silent reading)।

সরব পাঠ ও তার উপযোগিতা :

সরব পাঠের বৈশিষ্ট্য

যে পাঠে রব বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় সরব পাঠ। সরবে পাঠ করার জন্য প্রথমে পাঠককে শব্দের লিখিত রূপকে চিনতে হয়, তারপর ঐ শব্দগুলিকে ধ্বনিতে রূপান্তরিত ক'রে উচ্চারণ করতে হয়। পড়বার জন্য পাঠককে এমনভাবে তার দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করতে হয় যাতে সে একসঙ্গে কয়েকটি ক'রে শব্দকে অর্থপ্রকাশের সুবিধা অনুযায়ী দলবদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে। সরব পাঠের ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরে সরব পাঠ শিক্ষাদানের লক্ষ্য হল (১) উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বরের ওঠানামা (intonation) অভ্যাস করানো ; এবং (২) ছাত্রদের সঠিকভাবে পড়বার ক্ষমতা পরীক্ষা করা। শিক্ষককে ছাত্রদের এমনভাবে সরব পাঠ শিক্ষা দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শব্দ এবং শব্দাংশ (syllable) শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্র শুনতে পায় এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে এবং পঠিত বিষয়ের অর্থ অন্যদের হৃদয়ঙ্গম করাতে পারে। সঠিকভাবে সরব পাঠ করার জন্য ছাত্রকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের অর্থ শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রেরা যাতে শুনে বুঝতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

সরব পাঠের উপযোগিতা

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। বিশেষ ক'রে শিশুদের মধ্যে পঠনশক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য সরব পাঠের একান্ত প্রয়োজন। শিশুরা নীরবে পাঠ করতে অস্বস্তিবোধ করে। এই অস্বস্তিবোধের কারণ হল নীরব পাঠে কোন ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। অথচ কথা বলার মত সরব পাঠে ধ্বনি উৎপন্ন হয় বলে শিশুদের কাছে নীরব পাঠের চেয়ে সরব পাঠ অনেক বেশি আনন্দদায়ক। তাছাড়া সরব পাঠে দক্ষতা অর্জন না করলে নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করা সম্ভবপর নয়। সরব পাঠ ভাষাশিক্ষাকে শিশুদের কাছে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। সরব পাঠের মধ্য দিয়ে শিশুরা সঠিক উচ্চারণ-রীতি শিখতে পারে এবং তাদের উচ্চারণে কোন ত্রুটি থাকলে শিক্ষক তা সংশোধন ক'রে দিতে পারেন। সঠিক উচ্চারণ-রীতি ছাড়াও সরব পাঠের মাধ্যমে ছাত্রদের সঠিক বাচনভঙ্গি ও কথন-শৈলীও শিক্ষা দেওয়া যায়। কবিতা

পড়ানোর ক্ষেত্রে সরব পাঠ একান্ত অপরিহার্য। কবিতার রসাস্বাদন সার্থক আবৃত্তির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে সঠিকভাবে কবিতার সরব পাঠ করতে পারলে অর্ধেক রসাস্বাদন হয়ে যায় ('Half the appreciation is done through the correct reading of the poem.")। সবশেষে সরব পাঠের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হল সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত শব্দের পেছনে লেখকের যে ভাব বা অনুভূতি বর্তমান থাকে সার্থক সরব পাঠের মাধ্যমে তা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে সরব পাঠ শিল্প সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

নীরব পাঠ ও তার উপযোগিতা :

যে পাঠে কোন রব বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় না তাকে বলা হয় নীরব পাঠ। কিন্তু নীরব পাঠের ক্ষেত্রে সরব পাঠের সমস্ত মানস-দৈহিক (Psychophysical) প্রক্রিয়াগুলি বর্তমান থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলি হল—শব্দের লিপিরূপ পরিচিতি, ধ্বনি-উৎপাদন এবং অর্থ উপলব্ধি। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে ধ্বনি-উৎপাদনের ব্যাপারটি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। সরব পাঠের ন্যায় নীরব পাঠে ছাত্রদের প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয় না। নীরব পাঠের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা (skimming)।

নীরব পাঠের বৈশিষ্ট্য

ভাষা-শিক্ষার প্রথম স্তরে ছাত্রদের সরব পাঠ শেখানো উচিত। ছাত্রেরা সরব পাঠে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করলে, তাদের মধ্যে নীরব পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরব পাঠের ক্ষমতা নীরব পাঠের দক্ষতা অর্জন করতে ছাত্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের চোখ পঙ্‌ক্তি-বরাবর একই রকম গতিতে অগ্রসর হয় না। মাঝে মাঝে চোখের গতির বিরাম ঘটে। একটি লাইনে সাধারণতঃ চার কিংবা পাঁচ বার চোখের গতির বিরাম ঘটে। চোখ যখন চলতে থাকে তখন অর্থের উপলব্ধি হয় না, বিরতির সময় অর্থের উপলব্ধি হয়। অভ্যাসের দ্বারা নীরব পাঠের গতি বাড়ানো যায়। নীরব পাঠের গতি বাড়ার অর্থ হল চোখের গতির বিরতির সংখ্যা কমে যাওয়া, অর্থাৎ একটানে যত বেশি সংখ্যক শব্দ প'ড়ে ফেলার অভ্যাস হবে, ততই নীরব পাঠের গতি বৃদ্ধি পাবে।

ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে এবং সাহিত্যের রসাস্বাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে সরব পাঠের উপযোগিতা থাকলেও, সামগ্রিকভাবে সরব পাঠ অপেক্ষা নীরব পাঠের উপযোগিতা যে অনেক বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ, নীরব পাঠের সাহায্যে ছাত্রেরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। নীরব পাঠের সময় ছাত্রদের প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয় না ব'লে এবং পাঠ্যবস্তুর মূল বক্তব্য আহরণ করার দিকে তাদের লক্ষ্য থাকে ব'লে খুব কম সময়ের মধ্যে তারা অনেক কিছু প'ড়ে

নীরব পাঠের উপযোগিতা

ফেলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে সরব পাঠ অপেক্ষা নীরব পাঠের প্রয়োজন অনেক বেশি। সেইজন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে ভালভাবে নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ, নীরব পাঠের গতি সরব পাঠের চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্য আধুনিক যুগের জীবনযাত্রায় নীরব পাঠের গুরুত্বও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থতঃ, নীরব পাঠের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক ছাত্র শিক্ষালাভ করতে পারে। তারজন্য কোন গোলমাল সৃষ্টি হয় না কিংবা কারো মনোযোগ ব্যাহত হয় না। পঞ্চমতঃ সরব পাঠ অপেক্ষা নীরব পাঠে অনেক বেশি পরিমাণে মনঃসংযোগ করা যায়। তাছাড়া নীরব পাঠে বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার প্রচ্ছন্ন থাকে ব'লে ছাত্রদের পরিশ্রম অনেক কম হয় এবং তার ফলে তারা বেশিক্ষণ ধ'রে পড়াশুনা করতে পারে।

২ ॥ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে সরব ও নীরব পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করুন ॥

[C. U. B. Ed. 1979]

উত্তর : ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। ভাষার লিখিত রূপ পর্যবেক্ষণ করে তার অর্থ বুঝতে পারাই হল পঠনের উদ্দেশ্য। পঠন অথবা পাঠ প্রধানতঃ দু'প্রকারের—**সরব পাঠ** এবং **নীরব পাঠ**। যে পাঠে স্বর বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় সরব পাঠ ; আর যে পাঠে কোন স্বর বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় না তাকে বলা হয় নীরব পাঠ। তবে নীরব পাঠের ক্ষেত্রে সরব পাঠের সমস্ত মানস-দৈহিক (Psycho-phisical) প্রক্রিয়াগুলি বর্তমান থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলি হল—শব্দের লিপিরূপ পরিচিতি, ধ্বনি-উৎপাদন এবং অর্থ উপলব্ধি। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে ধ্বনি-উৎপাদনের ব্যাপারটি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। সরব পাঠের ন্যায় নীরব পাঠে ছাত্রদের প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয় না। নীরব পাঠের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাঠ্যবস্তুর মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা (skimming)। এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে সরব ও নীরব পাঠের তুলনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন :

॥ এক ॥ নিম্নশ্রেণীতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ একান্ত অপরিহার্য। অপরপক্ষে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের সূচনা থেকেই নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এর কারণ হল ভাষা শিক্ষার প্রথমদিকে কথা বলার সঙ্গে সরব পাঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় শিশুরা সরব পাঠের মধ্য দিয়ে আনন্দলাভ করে। তাছাড়া সরব পাঠে দক্ষতা অর্জন না করলে নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য ভাষাশিক্ষার শুরুতে শিশুদের পক্ষে নীরবে পাঠ করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সরব পাঠ ভাষা শিক্ষাকে শিশুদের কাছে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলে।

॥ দুই ॥ নীরব পাঠের গতিবেগ সরব পাঠের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্য আধুনিক যুগের জীবনযাত্রায় নীরব পাঠের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান যুগে একজন ছাত্রকে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইসব পড়াশুনা শেষ করতে হলে নীরব পাঠের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। নীরব পাঠের দ্বারা অল্প সময়ে অনেক কিছু প'ড়ে ফেলা যায়। সরব পাঠের দ্বারা তা সম্ভব হয় না।

॥ তিন ॥ সরব পাঠের একটি সুবিধা হল এর সাহায্যে ছাত্রদের সঠিক উচ্চারণ-কৌশল ও বাগ্‌ভঙ্গী শিক্ষা দেওয়া যায়। তাছাড়া সরব পাঠের সাহায্যে ছাত্রদের উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গীর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি পরীক্ষা ক'রে সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা যায়। নীরব পাঠে এইসব সুযোগ পাওয়া সম্ভবপর নয়।

॥ চার ॥ সরব পাঠের দ্বারা বিদ্যালয় অথবা গৃহ পরিবেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়। একসঙ্গে অনেক ছাত্র সরবে পাঠ করতে আরম্ভ করলে যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তাতে কারো পক্ষেই পঠিত বস্তুর অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না। পাঠাগার কিংবা পঠন-কক্ষ (study room) যেখানে একসঙ্গে অনেক ছাত্রকে একসঙ্গে পড়াশুনা করতে হয় সেখানে নীরব পাঠই শিক্ষাগ্রহণের একমাত্র উপায়।

॥ পাঁচ ॥ সরব পাঠের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হল, এর মাধ্যমে সাহিত্য-রচনায় ব্যবহৃত শব্দের পেছনে লেখকের যে ভাব বা অনুভূতি বর্তমান থাকে শ্রোতার মনে তা সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া যায়। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ নীরব পাঠ হল পাঠকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়মাত্র। কিন্তু সরব পাঠকে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই প্রয়োজন সিদ্ধ করার কাজে লাগানো যেতে পারে।

॥ ছয় ॥ কবিতা পড়ানোর ক্ষেত্রে সরব পাঠ একান্ত অপরিহার্য। কবিতার রসাস্বাদন সার্থক আবৃত্তির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে সঠিকভাবে কবিতার সরব পাঠ করতে পারলে অর্ধেক রসাস্বাদন হয়ে যায় ("Half the appreciation is done through the correct reading of the poem")। অপরপক্ষে নীরব পাঠ কবিতার মর্মার্থ গ্রহণ ও গভীর-রসোপলব্ধিতে আমাদের সাহায্য করে।

॥ সাত ॥ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে সরব পাঠ অপেক্ষা নীরব পাঠের প্রয়োজন অনেক বেশি। অধিকাংশ ব্যক্তির কর্মজীবনে সরব পাঠের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অপরপক্ষে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই নীরব পাঠের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে ভালভাবে নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

॥ আট ॥ সরব পাঠে সক্রিয়ভাবে বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় ব'লে নীরব পাঠের তুলনায় ছাত্রদের পরিশ্রম বেশি হয়। সেইজন্য ছাত্রেরা একনাগাড়ে বেশিক্ষণ সরবে পাঠ করতে পারে না। অপরপক্ষে নীরব পাঠে সক্রিয়ভাবে বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় না ব'লে ছাত্রদের পরিশ্রম কম হয় এবং একনাগাড়ে তারা অনেকক্ষণ পড়াশুনা করতে পারে। তাছাড়া সরব পাঠের তুলনায় নীরব পাঠে অনেক বেশি পরিমাণে মনঃসংযোগ করা যায়।

॥ নয় ॥ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে সরব ও নীরব পাঠের তুলনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার সময় একটা কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ; সেটা হল সরব পাঠের মাধ্যমে পঠনের প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করার উপর নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেইজন্য একথা বলা যেতে পারে যে সরব পাঠ, নীরব পাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহায়ক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে উভয়েরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষকের কাজ হল প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রদের উভয়প্রকার পাঠে দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করা।

৩ ॥ আদর্শ পাঠের গুণাবলী কি কি ? পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও ব্যাপক পাঠ কাকে বলে ?

উত্তর : ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ পাঠের গুরুত্ব খুবই বেশি। কারণ আদর্শ পাঠ ছাড়া পঠিত বিষয়ের অর্থ যেমন ছাত্রেরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি আদর্শ পাঠের দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা কোন পাঠ্যবস্তু থেকে তার অর্থ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে আদর্শ পাঠের অভ্যাস গঠন করতে না পারার ফলে ছাত্রেরা পড়বার সময় বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলিকে অর্থপ্রকাশের সুবিধা অনুযায়ী গুচ্ছ-গুচ্ছভাবে (group-wise) সাজিয়ে নিয়ে পড়তে পারে না অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেক শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্রদের পাঠের গতিও থাকে খুব মন্থর এবং তারফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তাদের কোন জিনিস পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা ঐ সময়ের মধ্যে তা পড়ে শেষ করতে পারে না। এইসব কারণে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ পাঠের অভ্যাস গঠন করা খুবই প্রয়োজনীয়। এখন আদর্শ পাঠের গুণাবলী কি কি সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আদর্শ পাঠের গুণগুলি হল :

॥ এক ॥ **নির্ভুলতা (Accuracy) :**

পাঠ্যবিষয় সঠিক ও নির্ভুলভাবে পড়তে পারা আদর্শ পাঠের প্রধান গুণ। সরব পাঠের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে পড়ার অর্থ হল—শব্দগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ ক'রে সেগুলি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা, প্রতিটি শব্দ ও শব্দাংশ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা, বিরতি-চিহ্নগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন-অনুযায়ী বিরাম গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের (stress) ব্যবহার করা। কবিতার সরব পাঠ করার সময় ছন্দের প্রকৃতি অথবা পর্ব-বিভাগ অনুযায়ী বিরাম-গ্রহণের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নীরব পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের উপর মনোযোগ দিতে হয় না ঠিকই, কিন্তু অর্থগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দগুলির (key-words) প্রতি চোখের দৃষ্টি যদি ঠিক ঠিকভাবে না পড়ে তাহলে পাঠ্যবিষয়ের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য নির্ভুলভাবে নীরব পাঠ করার অর্থ হল চোখের দৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ

শব্দগুলির উপর এমনভাবে নিক্ষেপ করা যাতে পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা যায়।

॥ দুই ॥ গতি (Speed) :

আদর্শ পাঠের আরেকটি গুণ হল বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার মান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট গতিতে পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন করা। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষেত্রে পঠনের গতি খুব বেশি দ্রুত হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ তখন পড়বার জন্য যে মানস-দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তা তারা সবেমাত্র আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু পড়াশুনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যাতে ছাত্রদের পঠনের গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের গতির মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে শিক্ষককে সেকথাও মনে রাখতে হবে। সরব পাঠের ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রত্যেকটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয় ব'লে নীরব পাঠের তুলনায় সরব পাঠের গতি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু নীরব পাঠের ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতিটি শব্দের উপর সমান মনোযোগ দিতে হয় না ব'লে এবং পাঠ্যবস্তুর মূল বক্তব্য আহরণ করাই পঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ব'লে নীরব পাঠের গতি সরব পাঠের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। কাজেই আদর্শ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় গতি সম্পর্কে বিচার করার সময় সরব পাঠ ও নীরব পাঠের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মাপকাঠি ব্যবহার করতে হবে।

॥ তিন ॥ উপলব্ধি (Comprehension) :

কোন বিষয় পাঠ ক'রে তার অর্থ ভালভাবে বুঝতে পারা আদর্শ পাঠের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ। পঠিত বস্তুর অর্থ বুঝতে না পারলে কিংবা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে পঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। পঠিত বস্তুর অর্থ বুঝতে পারা কিন্তু উপলব্ধির শেষ কথা নয়—এটা উপলব্ধির প্রাথমিক শর্ত। সঙ্কীর্ণ অর্থে উপলব্ধি বলতে বোঝায় পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারা। কিন্তু উপলব্ধির একটি ব্যাপক অর্থ আছে। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে উপলব্ধির ব্যাপক অর্থ হল বিষয়বস্তুর অর্থ বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যগুণ অর্থাৎ বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের কলা-কৌশল, বক্তব্যবিষয় উপস্থাপিত করার বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারা। কবিতার ক্ষেত্রে উপলব্ধির ব্যাপক অর্থ হল কবিতার বক্তব্য-বিষয় বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার ছন্দ, ভাব, রস ও ভাষার মাধুর্য আস্বাদন করতে পারা। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষেত্রে পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তারপর ছাত্রদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই তারা উচ্চতর শ্রেণীতে উঠবে ততই ব্যাপক অর্থে পঠিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ চার ॥ অভিব্যক্তি (Expression) :

আদর্শ পাঠের অন্যতম গুণ হল অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির অর্থ হল কোন গদ্য রচনা কিংবা কবিতার মধ্যে লেখকের যে অনুভূতি, ভাব ও আবেগ বর্তমান থাকে

সরব পাঠের মাধ্যমে পাঠকের কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যার পড়ার মধ্যে এই বহিঃপ্রকাশ যত ভালভাবে ঘটবে ততই সে আদর্শপাঠের এই গুণটি অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করতে পেরেছে ব'লে ধ'রে নিতে হবে। নীরব পাঠের ক্ষেত্রেও কিছুটা অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। নীরবে পাঠ করতে করতে অনেকে সময় পাঠক যখন লেখকের বক্তব্য বিষয়ের কিংবা প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে পড়ে তখন তার মুখমণ্ডলে সাহিত্যরসাস্বাদনের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ ও ব্যাপক পাঠ [Intensive and Extensive reading] :

কোন রচনা পড়বার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সাধারণতঃ দুরকম পদ্ধতি অবলম্বন করি। একরকম পদ্ধতি হ'ল, ঐ রচনায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে আমরা রচনাটির বক্তব্যবিষয় এবং ভাষাগত প্রকাশ-ভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি অথবা, রচনাটির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে তার মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করি। এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিস্তৃত পাঠ।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের উদ্দেশ্য হল ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা এবং ভাষার মাধ্যমে উন্নত ধরনের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের সাহায্যে ছাত্রেরা তাদের পঠনের দক্ষতার বিকাশ ঘটায়, তাদের শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটে এবং তারা ভাষার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের মাধ্যমে ছাত্রেরা যেসব শব্দ শেখে সেগুলি তারা তাদের রচনায় ব্যবহার করতে পারে।

অপরপক্ষে বিস্তৃত পাঠে ভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। এখানে প্রধানতঃ বিষয়বস্তুর উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিস্তৃত পাঠের দ্বারা ছাত্রেরা পঠনের প্রতি আসক্ত হয়, এবং সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে পড়বার ক্ষমতার বিকাশ হয়। এর দ্বারা কিন্তু ছাত্রেরা সক্রিয়ভাবে ভাষা ব্যবহারেরর দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। বিস্তৃত পাঠের সাহায্যে তারা পাঠ্যবস্তুর প্রধান বক্তব্যবিষয়গুলি আহরণ করতে পারে।

এই উভয়প্রকার পাঠের জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যপুস্তক রচনা করা প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়াবার সময় পুনঃপুনঃ অভ্যাসের মাধ্যমে ছাত্রদের ভাষাব্যবহারের দক্ষতার উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে। অপরপক্ষে, বিস্তৃত পাঠের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে সহজ ভাষায় লিখিত আকর্ষণীয় গল্প ও বর্ণনা-মূলক রচনা পড়বার ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠাগারের বই পড়ানোর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত পাঠের অভ্যাস গঠন করা যেতে পারে।

৪।। দ্রুত পঠনের উপযোগিতা কি? দ্রুতপঠন পুস্তক পড়াইবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কি? [B. U. B. T. 1963]

উত্তর: দ্রুত পঠনের উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের মধ্যে নীরবে এবং দ্রুতগতিতে পড়বার অভ্যাস গঠন করা। শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে এই জাতীয় অভ্যাসের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বর্তমান যুগে আমাদের যেরূপ কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করতে হয় তাতে আমরা যদি দ্রুত পঠনের অভ্যাস গঠন করতে না পারি তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য ও দর্শনের জগতে বিচরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটাও সম্ভবপর নয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। একমাত্র দ্রুতপঠনের অভ্যাস গঠন করতে পারলে আমাদের পক্ষে ঐ জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। একজন ছাত্রের পক্ষেও দ্রুত পঠনের অভ্যাস গঠন করা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ বর্তমানে ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে পড়াশুনা করতে হয়। কাজেই তারা যদি দ্রুত পঠনের অভ্যাস গঠন করতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি প'ড়ে শেষ করা সম্ভবপর হবে না।

দ্রুত পঠনের উপযোগিতা

দ্রুতপঠন পুস্তক পড়াবার জন্য একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই জাতীয় পুস্তক পড়াবার উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের মধ্যে নীরব পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলা এবং ছাত্রেরা যাতে পঠিত বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলি খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারে সে বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। নিম্নশ্রেণীতে দ্রুত পঠন পুস্তক পড়াবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি থাকা প্রয়োজন: (১) ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা; (২) ব্ল্যাকবোর্ডে কতকগুলি পূর্ব-রচিত প্রশ্ন (before question) লিখে রাখতে হবে এবং ছাত্রদের বলতে হবে যে পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট অংশ পাঠ ক'রে তাদের ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। ঐ অংশটি পাঠ করার জন্য কিছু সময় বরাদ্দ ক'রে দিতে হবে। প্রশ্নগুলি সামনে রেখে পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট অংশটি পড়তে হবে ব'লে ছাত্রেরা পড়ায় উৎসাহ পাবে এবং তারা বুদ্ধি সহকারে উদ্দেশ্যমূলক পঠনের অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে পারবে। পূর্ব-রচিত প্রশ্নগুলিতে মূল বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে—তুচ্ছ বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকবে না; (৩) ছাত্রেরা পড়বার সময় যদি কোন অজানা শব্দের সম্মুখীন হয় তাহলে শিক্ষক তাদের পূর্বাপর অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শব্দটির অর্থ অনুমান ক'রে নেবার নির্দেশ দেবেন। প্রয়োজন বুঝলে শিক্ষক ছাত্রদের কঠিন অজানা শব্দের অর্থ ব'লে দেবেন; (৪) সবশেষে ছাত্রদের বোর্ডে লিখিত প্রশ্নগুলির উপর জিজ্ঞাসা করার পর শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় পঠিত অংশটির সারাংশ বোর্ডে লিখে দেবেন এবং ছাত্রদের তা খাতায় তুলে নিতে বলবেন।

৫ ॥ "পাঠ ত্রিবিধ—চর্বনা (Critical appreciation), স্বাদনা (Appreciation), আয়ত্তীকরণ (Comprehension)।" এই তিন জাতীয় পাঠকে কিভাবে পৃথক করিবেন তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া দিন। [C.U.B.T. 1959]

উত্তর : বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের যেসব গদ্যরচনা পড়তে হয় সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং কবিতার উপযুক্ত রসাস্বাদনের জন্য প্রধানতঃ তিনপ্রকারের পাঠের প্রয়োজন হয়। এই তিনপ্রকারের পাঠ হল—

(১) **চর্বনা পাঠ** (Critical Study); (২) **স্বাদনা পাঠ** (Appreciation Study); এবং (৩) **আয়ত্তীকরণ পাঠ** (Comprehensive Study)। এই তিনপ্রকার পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথক। নিম্নে এই তিনপ্রকার পাঠের বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করা হল :—

॥ ১ ॥ **চর্বনা পাঠ** (Critical Study) :

যুক্তি-তর্কাশ্রয়ী ও বিচার-বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে হলে পাঠকের চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণক্ষমতাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা না হলে এই জাতীয় প্রবন্ধের বক্তব্যবিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। যে পাঠের দ্বারা যুক্তিতর্কাশ্রয়ী ও বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় তাকে চর্বনা পাঠ বলা হয়। কোন শক্ত খাদ্যদ্রব্যের রসাস্বাদনের জন্য যেমন তাকে চর্বন করা প্রয়োজন, তেমনি জটিল ও বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরচনার অর্থ উপলব্ধির জন্য বিচারমূলক (Critical) চিন্তাশক্তিকে প্রয়োগ করতে হয়।

॥ ২ ॥ **স্বাদনা পাঠ** (Appreciation Study) :

যে পাঠের সাহায্যে কোন সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ গদ্যরচনা কিংবা কোন কবিতার অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করা যায় তাকে স্বাদনা পাঠ বলে। যদিও গদ্যরচনা ও কবিতা এই উভয়প্রকার সাহিত্যসৃষ্টির রসাস্বাদনের জন্য স্বাদনাপাঠের প্রয়োজন হয়, তবু কাব্য-পাঠকে কেন্দ্র করেই স্বাদনা পাঠের ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশি। রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের যে সব গদ্যরচনা পড়ানো হবে সেগুলির বিষয়বস্তু তাদের নিকট আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া এইসব গদ্য-রচনায় এমন গুণ থাকা দরকার যার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আনন্দ ও সন্তোষের সৃষ্টি হবে, এবং তাদের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনের মৌলিক ও শাশ্বত সৌন্দর্য অর্থাৎ সত্য-শিব-ও সুন্দরের প্রতি ধাবিত হবে। কবিতার ক্ষেত্রে রসাস্বাদন বলতে বোঝায়, কবির গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি যা বিশিষ্ট-শব্দ-ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে তা পাঠ ক'রে আনন্দলাভ করা এবং কবিতা রচনার সময় কবির মনে যে এক অনির্বচনীয় হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়।

সেইজন্য বিদ্যালয়-শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য, বক্তব্যবিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

॥ ৩ ॥ **আয়ত্তীকরণ পাঠ** (Comprehensive Study) **:**

যে পাঠের উদ্দেশ্য হল কোন পাঠ্যবিষয় প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা তাকে বলা হয় আয়ত্তীকরণ পাঠ। আয়ত্তীকরণ পাঠের আর একটি নাম হল **ধারণা পাঠ**। এই জাতীয় পাঠে বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা রসাস্বাদনের কোন অবকাশ কিংবা প্রচেষ্টা থাকে না। সাধারণতঃ আয়ত্তীকরণ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে গল্প, উপন্যাসের অংশবিশেষ, ভ্রমণকাহিনী, বর্ণনামূলক রচনা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়। দ্রুত-পঠনের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তুই সাধারণতঃ ছাত্রেরা আয়ত্তীকরণ পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। এই জাতীয় পাঠের সাহায্যে ছাত্রদের চোখ-বুলিয়ে-অর্থগ্রহণ করার (skimming) ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

এখন এই তিনজাতীয় পাঠকে কি ভাবে পৃথক করা যায় দৃষ্টান্ত সহকারে তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উপরি উক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে চর্বনা পাঠে রয়েছে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রাধান্য, স্বাদনা পাঠে রয়েছে সাহিত্যরস আস্বাদনের প্রাধান্য এবং আয়ত্তীকরণ পাঠে রয়েছে মূল বক্তব্য-বিষয় বোঝার প্রাধান্য। চর্বনা-পাঠের আবেদন প্রধানতঃ মস্তিষ্কের কাছে, স্বাদনা পাঠের আবেদন প্রধানতঃ হৃদয়ের কাছে, আর আয়ত্তীকরণ পাঠের আবেদন বিশেষভাবে মস্তিষ্ক কিংবা হৃদয় কোনটির কাছেই নয়—সামগ্রিকভাবে অর্থগ্রহণের মধ্যে সীমবদ্ধ। পাঠসংকলনের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গদ্যরচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তিনপ্রকার পাঠের পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। নবম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট 'লুই পাস্তর' প্রবন্ধটির অর্থ উপলব্ধির জন্য বিচারমূলক চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। কারণ এই প্রবন্ধে যুক্তি-পরম্পরার সাহায্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব কেবল চর্বনা পাঠের দ্বারাই এই প্রবন্ধটির অর্থগ্রহণ করা সম্ভব। অপরপক্ষে, 'অচেনার আনন্দ' গদ্যাংশটির স্থানে স্থানে স্বাদনা পাঠের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে; যেমন, "ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত 'দিদি-দিদি, ছাখ্ ছাখ্ ঐদিকে'—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—'ঐ যে! ঐ গাছটার পেছনে! কেমন অনেকদূর না?' দুর্গা হাসিয়া বলিত, 'অনেকদূর—তাই দেখছিলি? দূর, তুই একটা পাগল।' এখানে বর্ণিত বিষয়টির আবেদন মস্তিষ্কের কাছে নয়, প্রধানতঃ হৃদয়ের কাছে। এখানে অপুর অনুভূতিকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা—তার সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অকারণ

মন-কেমন করাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। অতএব এখানে স্বাদনা পাঠের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কবিতার ক্ষেত্রে স্বাদনা পাঠই যে রসাস্বাদনের একমাত্র উপায় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি, যেমন 'জীবন স্মৃতি' (রবীন্দ্রনাথ), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি থেকে মূল বক্তব্য-বিষয় আহরণ করার জন্য আয়ত্তীকরণ পাঠের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা হল, এমন অনেক গদ্যরচনা আছে যার কোন অংশের রসগ্রহণের জন্য আয়ত্তীকরণ পাঠের প্রয়োজন হয় ; অর্থাৎ একই রচনার অংশ বিশেষের জন্য এক-একরকম পাঠের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষককে একথা মনে রেখে ছাত্রদের মধ্যে এই তিনপ্রকার পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

॥ বাংলা গদ্যের শ্রেণীবিভাগ ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি ॥

৬ ॥ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ॥

উত্তর : বাংলা গদ্য-সাহিত্য যে-সমস্ত বিভিন্ন ধরনের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ সেগুলিকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

(১) **উপন্যাস** ; (২) **ছোটগল্প** ; (৩) **নাটক** ; (৪) **প্রবন্ধ** ; (৫) **রম্যরচনা** (৬) **জীবনচরিত ও আত্মজীবনী** ; (৭) **ভ্রমণকাহিনী** ; ও (৮) **পত্রসাহিত্য**।

গদ্যসাহিত্যের এই সমস্ত শাখা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। **উপন্যাস** (Novel) :—উপন্যাস হল গদ্যে লেখা বৃহৎ গল্পবিশেষ। অবশ্য এইরূপ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা উপন্যাসের চরিত্রকে সঠিকভাবে বোঝানো সম্ভবপর নয়। সেইজন্য আরেকটু স্পষ্টভাবে উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে হলে একথা বলতে হবে যে, উপন্যাস হল গদ্যসাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে একটি বিরাট পটভূমিকায় নানা শাখা-প্রশাখা সম্বলিত মানব-সমাজের একটি মূল কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে ছোট-বড় নানারকম চরিত্রের সমাবেশ ঘটে এবং জীবনের নানাবিধ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি এক চরম পরিণতির দিকে এমনভাবে ধাবিত হয় যা পাঠ ক'রে মানব জীবনের চিরায়ত সত্য সম্পর্কে পাঠকের মনে একধরনের গভীর উপলব্ধি ঘটে এবং তার ফলে তার আত্মিক উদ্গতি সাধিত হয়।

উপজীব্য-বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী উপন্যাসকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) **সামাজিক উপন্যাস** :—কোন সামাজিক প্রথা কিংবা কোন সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে যে সব উপন্যাস রচিত হয় সেগুলিকে সামাজিক উপন্যাস বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', প্রভৃতি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

(খ) **ঐতিহাসিক উপন্যাস** :—কোন ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে যে সব উপন্যাস রচিত হয় সেগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্রের 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা', রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) **কাব্যধর্মী উপন্যাস** :—যে সব উপন্যাসে বাস্তবজীবনের বর্ণনা অপেক্ষা মুখ্য চরিত্রগুলির জীবন-সম্পর্কিত কাব্যিক উপলব্ধিগুলি প্রাধান্য লাভ করে সেগুলিকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলে। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) **মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস** :—যে সব উপন্যাসে ঘটনা-বর্ণনার চেয়ে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে সেগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে। বাংলা ভাষায় খাঁটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস খুব বেশি লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', বুদ্ধদেব বসুর 'রাতভোর বৃষ্টি' প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উদাহরণ।

(ঙ) **আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস** :—লেখক তাঁর নিজের কিংবা অন্যকোন ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতাগুলি যদি উপন্যাসের আকারে উত্তমপুরুষে ব্যক্ত করেন তাহলে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটি উদাহরণ।

(চ) **গোয়েন্দা উপন্যাস** :—খুন-জখম, গোয়েন্দাগিরি, রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা প্রভৃতি যেসব উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সেগুলিকে গোয়েন্দা-উপন্যাস বলা হয়। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা এই জাতীয় উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রকারের যে সব উপন্যাস রয়েছে সেগুলির মধ্যে বিপ্লবাত্মক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস, পত্রোপন্যাস, বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপন্যাস, উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২। **ছোটগল্প** (Short Stories) :—ছোটগল্প হল গদ্যে লেখা ছোট একটি কাহিনী কিংবা ঘটনার বর্ণনা যার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল, সমগ্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখকের একটি বিশেষ ভাবকল্পনা বা idea ফুটে উঠবে, ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা, গতি (speed) ও সুসংবদ্ধতা (compactness) থাকবে, গল্পের ঘটনাটি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে আগাগোড়া একটি উৎকণ্ঠা (suspense) বজায় থাকে এবং একটি চরম মুহূর্তের (climax) দিকে গল্পটি ধাবিত হবে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতা অনুযায়ী ছোটগল্পকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) **সামাজিক সমস্যামূলক ছোটগল্প :**—রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান', শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি।

(খ) **মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি।

(গ) **প্রেম-বিষয়ক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি', 'মানভঞ্জন'; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'লেডি ডাক্তার' প্রভৃতি।

(ঙ) **হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প :**—রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বউচুরি', 'খোকার কাণ্ড' প্রভৃতি।

(ঙ) **রূপক ও সাঙ্কেতিক ছোটগল্প :**—রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী', 'গুপ্তধন', জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রভৃতি।

(চ) **অতিপ্রাকৃতবিষয়ক ছোটগল্প**—রবীন্দ্রনাথের 'মণিহারা', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি।

এ ছাড়াও আরও নানাপ্রকারের ছোটগল্প রয়েছে, যেমন—ঐতিহাসিক ছোটগল্প, ভৌতিক ছোটগল্প, বিজ্ঞান-বিষয়ক ছোটগল্প, ডিটেকটিভ ছোটগল্প প্রভৃতি।

৩। **নাটক (Drama) :**—নাটক হল সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে মঞ্চে অভিনয় করবার উপযোগী সংলাপ ও ঘটনা-ভিত্তিক জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়। আখ্যান (plot) ও চরিত্র নাটকের প্রধান অবলম্বন হলেও নাটকীয়তা (dramatic action) ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব (conflict) নাটকের প্রাণস্বরূপ।

বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী নাটককে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) **সামাজিক নাটক :**—এই জাতীয় নাটকে সমাজ-জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', মনোজ বসুর 'প্লাবন' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

(খ) **পৌরাণিক নাটক :**—এই জাতীয় নাটকে রামায়ন, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আখ্যান (plot) সংগ্রহ করা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ।

(গ) **ঐতিহাসিক নাটক :**—কোন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে নাটক রচনা করা হলে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে; যেমন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবারপতন' প্রভৃতি।

(ঘ) **রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক**—যে সব নাটকের বক্তব্যবিষয় রূপকের আকারে কিংবা সাংকেতিকতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেগুলিকে রূপক ও সাংকেতিক নাটক বলে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা,' 'রক্তকরবী', 'রথের রশি' ইত্যাদি এই জাতীয় নাটক।

(ঙ) **একাঙ্ক নাটক** :—পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেখানে পাঁচটি অঙ্ক (act) থাকে সেখানে এই জাতীয় নাটকে একটি অঙ্কের মধ্যেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, ক্রমব্যাপ্তি ও চূড়ান্ত পরিণতি (climax) ঘটে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে একাঙ্ক নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জাতীয় নাটকের নাট্যকারদের মধ্যে রমেন লাহিড়ী, রতনকুমার ঘোষ, বাদল সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এইজাতীয় নাটকগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রকারের যে সব নাটক রয়েছে সেগুলির মধ্যে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, অতিনাটক, চরিত-নাটক, এ্যাবসার্ড ড্রামা, প্রচারমূলক নাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪। **প্রবন্ধ** (Essay) :—'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়ের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর এবং বক্তব্যের সঙ্গে ভাষার যে নিবিড় বন্ধন থাকে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়বস্তু অর্থাৎ বক্তব্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ কোন তত্ত্ব কিংবা তথ্যকে কেন্দ্র করেই প্রবন্ধ রচিত হয়। হৃদয়াবেগের পরিবর্তে প্রবন্ধে বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করে। প্রবন্ধ রচনা করার সময় প্রবন্ধকারকে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের (subjectivity) পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় ; কারণ নৈর্ব্যক্তিকতা হল প্রবন্ধের একটি বিশেষ লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা প্রবন্ধকারদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫। **রম্যরচনা** (Intimate Essays) :—প্রবন্ধের সঙ্গে রম্যরচনার পার্থক্য হল প্রবন্ধে যেখানে নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity) প্রাধান্য, রম্যরচনায় সেখানে আত্মমুখিতার (subjectivity) প্রাধান্য। রম্যরচনায় প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের পরিবর্তে দেখা যায় লঘু পদচারণা। প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর ও যুক্তিতর্কসম্বলিত বিষয়ের পরিবর্তে রম্যরচনায় হাল্কাচালের রসসমৃদ্ধ বক্তব্য প্রাধান্য লাভ করে। রম্যরচনার আসল রস হল ব্যক্তিগত রস ; সেইজন্য রম্যরচনাকে অনেকে 'ব্যক্তিগত রচনা' (Personal Essay) আখ্যা দিয়ে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত', প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতা', সৈয়দ মুজতাবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

৬। **জীবনচরিত ও আত্মজীবনী** (Biography and Autobiography) : —লেখক যখন অন্য কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি কিংবা মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত গদ্যের আকারে লিপিবদ্ধ করেন তখন তাকে বলা হয় জীবনচরিত। আর লেখক যখন

নিজেই নিজের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তাকে বলা হয় আত্মজীবনী। উৎকৃষ্ট জীবনচরিতের মধ্যে লেখকের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অপরপক্ষে আত্মজীবনীর মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যয়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রভৃতি বিখ্যাত জীবন-চরিত গ্রন্থের উদাহরণ। বিখ্যাত আত্মজীবনী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', বুদ্ধদেব বসুর 'আমার ছেলেবেলা' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭। **ভ্রমণ কাহিনী (Travels) :**—বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন স্থান পরিদর্শন ক'রে লেখক যখন তাঁর অভিজ্ঞতা চিত্তাকর্ষক-ভাবে লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁর রচনাকে ভ্রমণ-কাহিনী বলে। বাংলা ভাষায় রচিত বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনীগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়', সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৮। **পত্র সাহিত্য (Letters) :**—দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সব চিঠিপত্র লিখি তার মধ্যে সাহিত্যগুণ তেমন একটা কিছু থাকে না। কিন্তু লেখার গুণে যখন কোন চিঠি সকলের কাছে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে তখন তা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্র-সাহিত্যের উদাহরণ।

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে কোন্ কোন্ ধরনের বাংলা গদ্য পড়াতে হবে :

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা গদ্য শেখানোর যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নানা ধরনের বাংলা গদ্য পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিশ্বভারতীর সহায়তায় নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য 'পাঠসংকলন' নামে বাংলা পাঠপুস্তক প্রকাশ করেছেন। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিজস্ব কোন বাংলা পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে এই তিন শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে কি জাতীয় গদ্যাংশ পড়ানো হবে সে সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ ও সহায়ক পাঠ্যপুস্তকে (Rapid Reader) কি ধরনের গদ্যরচনা থাকবে সে সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ উদ্ধৃত করা হল :—

১। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশের জন্য ৪০ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে আনুমানিক ১০টি গদ্যরচনা থাকবে। "গদ্যাংশের জন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও মনীষীদের জীবনকথা, বৈচিত্র্যমূলক

সাহিত্যিক ও দেশাত্মবোধক রচনা, গল্প, উপাখ্যান, ভ্রমণকাহিনী, অভিযান ও আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনাংশ সংকলিত হইবে। সংকলনকারীর নিজস্ব রচনাও স্থান পাইতে পারে। গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক।"

"সহায়ক পাঠের জন্য একখানি গদ্য বা কবিতা পুস্তক থাকিবে। যে কোন একখানি মাত্র পড়ান হইবে। এই পুস্তকের আলোচ্য হইবে—ভারতে প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাহিনী, নীতিমূলক গল্প, মহাপুরুষদের জীবনকথা প্রভৃতির একটি বিষয়। গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪।"

২। **সপ্তম শ্রেণীর** বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশের জন্য ৫০ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে। **"গদ্যাংশের মধ্যে থাকিবে** (ক) **নানান সাহিত্যিক বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি ;** (খ) **স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বিষয়** (দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি ও জাতীয় গৌরব বিষয়ক রচনা) ; (গ) **জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনবৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা** (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ উনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত সময়ের কথা) ; (ঘ) **মহৎ-জীবন কথা** (সর্বভারতীয় মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত) ; (ঙ) **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান এবং** (চ) **একটি নাট্যাংশ।"**

"গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে।

সহায়ক পাঠ :—"(ক) ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক রচনা (বেশভূষার বৈশিষ্ট্য, শিল্পরুচি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যাদি, আতিথেয়তা ও জীবসেবাদির আদর্শবিষয়ক) ; (খ) ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষী তথা মহাপুরুষ-দিগের জীবন-বৃত্তান্ত ; (গ) আত্মস্মৃতি, ভ্রমণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযানের কাহিনী ; (ঘ) নানান সাহিত্যিক রচনা ; (ঙ) পুরাণাদির গল্প ও চরিত্র, বাংলা মঙ্গলকাব্য ও গীতিকার কাহিনী ও চরিত্র—এই বিষয়গুলির একটি অবলম্বনে গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে। গদ্যের ভাষারীতি সাধু ও চলিত হইবে।…গদ্য বা পদ্য 'একখানি পুস্তকই পড়ান হইবে। গদ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০।"

৩। **অষ্টম শ্রেণীর** বাংলা পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশের জন্য ৬৫ পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে। **গদ্যাংশের "বিষয় বস্তু সপ্তম শ্রেণী অনুযায়ী, তদুপরি জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবনী ও সংগ্রাম বিষয়ে রচনা থাকা বাঞ্ছনীয়** (পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ এবং উহা হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কার ঘটনাবলী অবলম্বনীয়)। গদ্য ও পদ্যের মান পূর্বাপেক্ষা উচ্চতর হইবে। গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতিরই রচনা থাকিবে। পাঠগুলি প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা হইতে সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে। পাঠগুলি যেন নাতিদীর্ঘ হয়।"

সহায়ক পাঠ :—"গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাষারীতি, আকার, টাইপ ইত্যাদি সপ্তম শ্রেণীর পুস্তকের অনুরূপ হইবে। কেবল পৃষ্ঠা সংখ্যা গদ্যের ক্ষেত্রে ১০০ হইবে।"

৪। "**নবম ও দশম শ্রেণীর** জন্য পাঠ্যগ্রন্থ পর্ষৎ কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হইবে।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-প্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'পাঠসংকলন'। এই পুস্তক থেকে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য যে সব গদ্যাংশ নির্বাচিত করা হয়েছে [মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮০] সেগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) **উপন্যাসের অংশ :**—'মেজদা' (নবম শ্রেণী) ; অচেনার আনন্দ (নবম শ্রেণী), সমুদ্রপথে (নবম শ্রেণী), সাগর সঙ্গমে নবকুমার (দশম শ্রেণী)।

(খ) **ঐতিহাসিক কাহিনী :**—"বাপ্পাদিত্য (দশম শ্রেণী)।

(গ) **প্রবন্ধ ও নিবন্ধ**—লুই পাস্তুর (নবম শ্রেণী), আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (দশম শ্রেণী), ভারতবর্ষ (দশম শ্রেণী।

(ঘ) **পত্র-সাহিত্য**—ভানুসিংহের পত্র (নবম শ্রেণী)।

ভ্রমণ-কাহিনী—হিমালয় ভ্রমণ (দশম শ্রেণী)।

সহায়ক পাঠ :— গদ্য—(ক) জীবন স্মৃতি (নির্বাচিত অংশ)—রবীন্দ্রনাথ ; (খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ ; (গ) রামায়নী কথা (নির্বাচিত অংশ) —দীনেশচন্দ্র সেন।

সহায়ক গ্রন্থের আখ্যান, ঘটনাবর্ণনা, ভাববস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ পরিচয় মাত্র প্রয়োজন।

॥ গদ্য শিক্ষাদানের পদ্ধতি ॥

৭॥ সাহিত্য পুস্তকের গদ্যাংশ পড়াইবার সময় কি জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং সেইসব অসুবিধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে বিভিন্নজাতীয় রচনাকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা যায় সে বিষয়ে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। [C.U. B.T 1965]

উত্তর : বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হল ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রদের মধ্যে এমনভাবে পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তোলা যাতে তারা বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই প'ড়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ার অভ্যাস ও লেখার অভ্যাস দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে পড়ার অভ্যাস আবার দুরকমের হতে পারে—সরব পাঠের অভ্যাস এবং নীরব পাঠের অভ্যাস। বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণীতে সরব পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ছাত্রেরা যতই উঁচু শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই নীরব পাঠের

বাংলা গদ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য

অভ্যাস গঠনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়; কারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনে নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশী। বাংলা ভাষায় লেখা গদ্য রচনা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা যেমন গদ্য শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য, তেমনি গদ্য রচনা পাঠ ক'রে তার সাহিত্যরস আস্বাদন করার ক্ষমতারও যাতে বিকাশ ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে লেখার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্যও বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গী, বাক্য-গঠন পদ্ধতি, বাগ্‌ধারা, ব্যাকরণের নিয়মাবলী, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতির সঙ্গে তাদের পরিচিত ক'রে তুলতে হবে এবং রচনা-শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে লিখে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

এখন বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে কি জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে ভাষা শিক্ষার দিক থেকে বিভিন্ন অসুবিধাগুলির কথা আলোচনা ক'রে তারপর সাহিত্যরস আস্বাদনের দিক থেকে কি কি অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে আমাদের বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। ভাষাশিক্ষার দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় যেসব অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলি হল—(১) ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় যেসব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলির অধিকাংশই তদ্ভব শব্দ। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের গদ্যরচনাগুলির মধ্যে প্রচুর তৎসম শব্দ থাকে যেগুলির অধিকাংশই ছাত্রদের অজানা। এই তৎসম শব্দগুলি গদ্যরচনা পড়া এবং সেগুলির অর্থগ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষকের পক্ষে এই বাধা অপসারণ করা সবসময় সহজসাধ্য হয় না। (২) পাঠ্য-পুস্তকে প্রাচীন লেখকদের যেসব গদ্য রচনা থাকে সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে আধুনিক বাংলা গদ্যের রচনারীতির পার্থক্য এত বেশি যে ছাত্রদের কাছে ঐসব প্রাচীন লেখকদের গদ্যরচনা খুবই কঠিন বলে মনে হয় এবং তারা সেগুলি পাঠ করতে মোটেই আগ্রহ বোধ করে না। শিক্ষকের পক্ষে এইসব রচনার প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। (৩) দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে যে ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হয়, পুস্তকে ব্যবহৃত ভাষার বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। ফলে ছাত্রেরা গদ্য রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ সব সময় বুঝতে পারে না এবং শিক্ষকও সেগুলি বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধা বোধ করেন। (৪) বাংলা ভাষা শিক্ষার সূচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের বর্ণ-ক্রম পদ্ধতির সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করানো হয়; তারপর অনেকক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বানান করে পড়ার এক ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই বদ-অভ্যাসের ফলে ছাত্রেরা সঠিকভাবে সরব-পাঠ করতে পারে না। তাদের পড়ার মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি, যতি-স্থাপনের ত্রুটি, শব্দগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করার ত্রুটি প্রভৃতি নানাবিধ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের পক্ষে এই ত্রুটিগুলি দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। (৫) নীরব পাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ছাত্র গুন-গুন কিংবা ফিস্‌ফিস্ শব্দ না ক'রে পড়তে পারে না—কেউ কেউ আবার শব্দ না করলেও ঠোঁট নড়াতে থাকে।

গদ্যাংশ পড়াবার অসুবিধা

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, হয় ছাত্র মনঃসংযোগ করতে পারছে না কিংবা নীরব পাঠের গতি খুব মন্থর কিংবা নীরব পাঠের দ্বারা সে পঠিত বিষয় থেকে মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারছে না। এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ নীরব পাঠের অভ্যাস গঠিত হলে শিক্ষকের পক্ষে তা দূর করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং গদ্যাংশ পড়াবার সময় দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এখন সাহিত্য রসাস্বাদনের দিক থেকে বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার কিরূপ অসুবিধা দেখা দেয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, ভাষা শিক্ষার শুরু থেকে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য এবং নানাকারণে বাংলা ভাষা অবহেলিত হওয়ার জন্য ছাত্রদের মধ্যে বাংলা ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের কাছে সাহিত্যরস পরিবেশন করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কারণ সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য যে ন্যূনতম ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদের তা থাকে না। **দ্বিতীয়তঃ**, অনেকসময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন অনেক গদ্য রচনা থাকে যার মধ্যে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ঐরূপ গদ্য রচনার প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। **তৃতীয়তঃ**, বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরীক্ষার ক্ষতিকারক চাপের ফলে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন কোন বিষয় শিখতে ছাত্রেরা মোটেই আগ্রহবোধ করে না। সেইজন্য কোন গদ্য রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্পর্কে শিক্ষকের বিশ্লেষণ শোনার চেয়ে ছাত্রদের কাছে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। **চতুর্থতঃ**, অনেক সময় বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন অনেক প্রবন্ধ থাকে যেগুলির অর্থ উপলব্ধি করার মত বিচারবুদ্ধির পরিপক্বতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। এরূপক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের ঐসব প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বোঝানো কিংবা তাদের কাছে সেগুলির আবেদন পৌঁছে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। **পঞ্চমতঃ**, বিদ্যালয়ে সাহিত্যরসাস্বাদন করা যায় এমনভাবে বাংলা গদ্যাংশ শিক্ষাদানের উপযুক্ত সুযোগ এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। গদ্যরচনা পাঠ ক'রে তা থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করার জন্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত গদ্যাংশ ছাড়াও ছাত্রেরা যাতে তাদের মান অনুযায়ী পাঠাগার থেকে প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য গুণসম্পন্ন গদ্যরচনা পাঠ, সাহিত্য-আলোচনা, গল্প-প্রবন্ধ-ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা অভ্যাস গঠন প্রভৃতির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এসবের সুযোগ পাওয়া যায় না।

গদ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর ক'রে বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :—

(১) যে গদ্যাংশটি ছাত্রদের পড়ানো হবে সেটি সম্পর্কে ছাত্রদের মনে যাতে উপযুক্ত আগ্রহের সঞ্চার হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য গদ্যরচনা নির্বাচন করার সময় ছাত্রদের চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব গদ্যরচনার বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক, সহজবোধ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।

(৩) বাংলা গদ্যাংশ পড়াবার সময় শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এইজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা গদ্যরচনা পাঠ করতে আগ্রহবোধ করবে এবং গদ্যরচনার রসাস্বাদন করতে সক্ষম হবে। এরসঙ্গে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও ব্ল্যাকবোর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।

(৪) বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যেসব গদ্যরচনা নির্বাচিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুল-প্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইসব রচনার প্রকাশভঙ্গী সহজ, সরস এবং সাবলীল হবে। তাছাড়া এই রচনাগুলি যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) ছাত্রেরা যাতে সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্যরচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয় তারজন্য বিদ্যালয়ে অভিনয়, বিতর্ক, আনন্দপঠন, সাহিত্য-আলোচনা, পাঠচক্র, স্বরচিত গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী পাঠ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রচলন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) বর্তমানে ভাষা শিক্ষার উপর পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে ক্ষতিকারক প্রভাব কাজ করছে তা দূর করতে হবে।

(৭) ছাত্রদের মধ্যে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে সরব পাঠের সময় ছাত্রেরা যেন স্পষ্ট ও নির্ভুল বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার, যতি চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরাম-গ্রহণ এবং অর্থপ্রকাশকভাবে একাধিক শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে ; আর নীরব পাঠের সময় তারা যেন চোখ বুলিয়ে দ্রুতগতিতে পাঠ্য-বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করতে পারে।

(৮) ছাত্রেরা যাতে পাঠাগারের সাহায্য গ্রহণ ক'রে সৎ সাহিত্য পাঠ করার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে, তা থেকে আনন্দ লাভ করতে এবং তাতে নিহিত মহৎ ভাব ও আদর্শ গ্রহণের দ্বারা তাদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে উৎসাহী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৯) বাংলা গদ্যশিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট সরস ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

॥ বাংলা কবিতার শ্রেণীবিভাগ ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি ॥

৮॥ বাংলা কবিতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভারতীয় আলংকারিকরা বলেছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং', অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। এখন 'রসাত্মক বাক্য' বলতে

আংলকারিকেরা কি বুঝিয়েছেন তা দেখা যাক। আলংকারিকদের মতে বাক্য হল কাব্যের দেহ, আর রস হল তার আত্মা। দেহের মধ্যে আত্মা না থাকলে যেমন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, তেমনি বাক্য যদি রসাত্মক না হয় তাহলে তা কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। এখন প্রশ্ন হল, রস কাকে বলে? কবির অন্তরে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হলে তাঁর চিত্ত দ্রবীভূত হয়, এই দ্রবীভূত চিত্তের স্থায়ীভাবকে বলে রস। কাব্য পাঠ ক'রে পাঠকের চিত্তেও কবিচিত্তের অনুরূপ রসের সঞ্চার হয় এবং এক অলৌকিক আনন্দে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হয়। এইভাবে কাব্যের রস আস্বাদন করার মধ্য দিয়ে কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের একপ্রকার সাযুজ্য ঘটে। কাব্যপাঠের সার্থকতা এখানেই।

কাব্যের সংজ্ঞা

কবিতাকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়:

(১) **আত্মনিষ্ঠ কবিতা (Subjective Poetry)**, এবং

(২) **বস্তুনিষ্ঠ কবিতা (Objective Poetry)**

যে কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি আবেগমণ্ডিতভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তাকে আত্মনিষ্ঠ কবিতা বা গীতিকবিতা বলে। আর যে কবিতায় বস্তুজগতের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে তাকে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলে। গীতিকবিতাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(১) **ভক্তিমূলক গীতিকবিতা**; (২) **প্রেমমূলক গীতিকবিতা**; (৩) **প্রকৃতিবিষয়ক গীতিকবিতা**; (৪) **দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা** এবং (৫) **চিন্তামূলক গীতিকবিতা**।

এছাড়া আত্মনিষ্ঠ কবিতা হিসাবে সনেট, শোকগীতি, প্রশস্তিমূলক কবিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বস্তুনিষ্ঠ কবিতার শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ:—

(১) **মহাকাব্য**; (২) **গাথাকাব্য**; (৩) **কাহিনী কাব্য**; (৪) **রূপক কাব্য**; (৫) **কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য**; (৬) **ব্যঙ্গ কবিতা**; (৭) **পত্রকাব্য**; (৮) **ছড়া** ইত্যাদি।

আত্মনিষ্ঠ কবিতার শ্রেণীবিভাগ:

১। **গীতিকবিতা (Lyric)**—গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি আবেগমণ্ডিতভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুযায়ী গীতিকবিতাকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(ক) **ভক্তিমূলক গীতিকবিতা**—এইজাতীয় গীতিকবিতায় কবির ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাকার হয়ে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি ভক্তিমূলক গীতিকবিতার উদাহরণ।

(খ) **প্রেমমূলক গীতিকবিতা**—নরনারীর প্রেম-বিরহ-মিলনকে উপজীব্য ক'রে যেসব গীতিকবিতা রচিত হয় সেগুলিকে প্রেমমূলক গীতিকবিতা বলে। রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তপ্রেম', 'ব্যক্তপ্রেম' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গীতকবিতা।

(গ) **প্রকৃতিবিষয়ক গীতিকবিতা**—যেসব গীতিকবিতায় কবির নিসর্গ-প্রীতি গভীর আবেগমণ্ডিত-ভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে সেগুলিকে প্রকৃতিবিষয়ক গীতি-কবিতা বলে। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্নে', মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী' প্রভৃতি প্রকৃতিবিষয়ক গীতিকবিতার শ্রেণীভুক্ত।

(ঘ) **দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা**—যে গীতিকবিতায় কবির দেশপ্রেম তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে তাকে দেশাত্ম-বোধক গীতিকবিতা বলে; যেমন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতলক্ষ্মী', কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' প্রভৃতি।

(ঙ) **চিন্তামূলক গীতিকবিতা**—কবির জীবনদর্শন কিংবা কোন ধ্যান-ধারণা যখন তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কবিতার আকারে বহিঃ-প্রকাশ লাভ করে তখন তাকে চিন্তামূলক গীতিকবিতা বলে; যেমন—কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ছোটোর দাবি' প্রভৃতি।

২। **সনেট (Sonnet)**—সনেট একশ্রেণীর আত্মনিষ্ঠ কবিতা। সনেটকে চতুর্দশপদী কবিতা'ও বলা হয়। কবির একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা সনেটের মধ্যে রূপলাভ করে। সনেটের আকৃতিগত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। চৌদ্দটি পংক্তি নিয়ে একটি সনেট রচিত হয়। এই চৌদটি পংক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম আট পংক্তি, যার নাম হল অষ্টক (octave), আর শেষ ছয় পংক্তি, যার নাম হল ষটক (sestet)। সনেট পয়ার কিংবা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বিজয়া-দশমী', 'বঙ্গ-ভাষা', 'কাশীরাম দাস' প্রভৃতি বাংলা সনেটের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৩। **শোক-গীতি (Elegy)**—কবির শোক-দুঃখ ও বেদনা যখন গভীর আবেগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কবিতার আকার লাভ করে তখন তাকে শোক-গীতি বলা হয়; যেমন—মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' প্রভৃতি শোক-গীতি হিসাবে বিখ্যাত।

৪। **প্রশস্তিমূলক কবিতা (Ode)**—যেসব কবিতায় কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তুর প্রতি কবির অন্তরের উচ্ছ্বাস গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ও প্রশস্তির আকারে প্রকাশিত হয় সেইসব কবিতাকে প্রশস্তিমূলক কবিতা বলে। নবীনচন্দ্র সেনের 'আশা', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' প্রভৃতি এইজাতীয় কবিতার উদাহরণ।

বস্তুনিষ্ঠ কবিতার শ্রেণীবিভাগ:

১। **মহাকাব্য (Epic):**—কোন ইতিহাসমিশ্রিত, পৌরাণিক কিংবা কোন

বিখ্যাত ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সুবিশাল পটভূমি, অজস্র উপকাহিনী, উন্নতচরিত্র-বিশিষ্ট নায়ক, ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা প্রভৃতির সমন্বয়ে যে বিশাল আকৃতি-সম্পন্ন কাব্য রচিত হয় তাকে মহাকাব্য বলে। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে মহাকাব্যে কমপক্ষে আটটি সর্গ থাকবে এবং শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত এই তিনটি রসের মধ্যে যে-কোন একটি রসকে প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মহাকাব্যের পটভূমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালব্যাপী বিস্তৃত হবে। মহাকাব্যের কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে ন্যায় ও সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাষণ্ডেরা পরাজিত হয়।

মহাকাব্যকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

(ক) **প্রাচীন মহাকাব্য (Primitive Epic)**—হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি', বাল্মীকি 'রামায়ণ' এবং বেদব্যাসের 'মহাভারত' সমগ্র পৃথিবীতে এই চারটি মাত্র এইজাতীয় মহাকাব্য রয়েছে।

(খ) **অনুকৃত মহাকাব্য (Imitative Epic)**—অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এইজাতীয় মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যের তুলনায় এগুলি আয়তনে অনেক ছোট। সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্খার পরিবর্তে কবির ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলনই এখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' এইজাতীয় মহাকাব্য।

২। **গাথাকাব্য (Ballad)**—'গাথা' শব্দটির অর্থ হল কবিতায় কিংবা গানে বর্ণিত পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। এইজাতীয় কাহিনী নিয়ে যেসব আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিকে গাথাকাব্য বলে; যেমন—'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি।

৩। **কাহিনী কাব্য (Narrative Story Poems)**ঃ—কোন দীর্ঘ আখ্যান বা কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে যেসব কাব্য রচিত হয় সেগুলিকে কাহিনী কাব্য বলে; যেমন—চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য প্রভৃতি।

৪। **রূপক কাব্য (Allegorical Poems)**ঃ—যেসব কবিতার মধ্যে একই সঙ্গে একটি আপাতগ্রাহ্য অর্থ এবং একটি অন্তর্নিহিত অর্থ বর্তমান থাকে সেগুলিকে রূপক কাব্য বলে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন প্রয়াণ' এই জাতীয় কাব্য।

৫। **কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য (Lyrical Drama and Dramatic Lyric)**ঃ—যখন নাটকের আধারে কোন কাব্য রচনা করা হয় তখন তাকে নাট্য-কাব্য বলে। নাট্যকাব্যে নাটক অপেক্ষা কাব্যই প্রাধান্য লাভ করে; যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি। অপরপক্ষে যখন কাব্যের আধারে কোন নাটক রচনা করা হয় তখন তাকে কাব্য-নাট্য বলে। কাব্য-নাট্যে কাব্যকে আশ্রয় ক'রে নাটকই প্রাধান্য লাভ করে; যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি।

৬। **ব্যঙ্গ কবিতা** (Satire):—যেসব কবিতায় কবি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেন সেগুলিকে ব্যঙ্গ কবিতা বলে ; যেমন—ঈশ্বর গুপ্তর 'ইয়ং বেঙ্গল', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' প্রভৃতি।

৭। **পত্রকাব্য** (Letter-Poems):—পত্রের আকারে রচিত কাব্যকে পত্রকাব্য বলে। মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এই জাতীয় কাব্যের নিদর্শন।

৮। **ছড়া** (Nursery Rhymes):—শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লেখা যেসব গ্রাম্য কবিতা প্রধানতঃ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় সেগুলিকে ছড়া বলে। ছড়ার মধ্যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

১। ছড়ার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাশিক্ষায় ছড়ার স্থান :

ছড়া হল একপ্রকার 'গ্রাম্য কবিতা' যার মধ্যে বাংলার সমাজজীবন এবং বাঙ্গালীর স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ছড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুদের মনোরঞ্জন করা। সেইজন্য ছড়াকে **'ছেলে ভুলানো ছড়া'**ও বলা হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে অসংখ্য ছড়া রচিত হয়ে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। ছড়ার মধ্যে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতামাখা এবং সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত জীবনের এমন এক অত্যাশ্চর্য মাধুর্য রয়েছে যার আবেদন আজও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে সমানভাবে বর্তমান। ছড়ার বিষয়বস্তু, ভাষা, ছন্দ, যাদুধর্মিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলে ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

প্রথমতঃ, ছড়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, ছড়ার মধ্যে নানারকমের বিষয় এসে ভীড় করেছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেভুলানোর জন্য মা, ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমাদের কাল্পনিক ও অসংলগ্ন পরিস্থিতি বর্ণনা ক'রে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টাই যে প্রাধান্য লাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশুকে ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো, শিশুর কান্না থামানো, শিশুকে ভুলিয়ে রাখা, আদর করা প্রভৃতির জন্য অনাদিকাল থেকে মা-ঠাকুমারা ছড়ার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।··· এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।" ছেলেভুলানো ছড়ার বিষয়বস্তু খুবই বিচিত্র এবং অসংলগ্ন। এখানে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়। কারণ ছড়ার জগতে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে কোন বিরোধ এবং সীমারেখা নেই ; যেমন—

ছড়ার বিষয়বস্তু

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে ॥

না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড়, ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥

টিয়া পাখির নৌকা চড়ে আসা, হঠাৎ বোয়াল মাছের সেই নৌকাখানি নিয়ে যাওয়া, তা দেখে ভোঁদড়ের নাচ এবং সবশেষে ভোঁদড়কে খোকার নাচ দেখতে বলা —এ সমস্তই কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। এইরকম আরও অনেক অদ্ভুত-অসম্ভব ঘটনা ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে স্থানলাভ ক'রে শিশুর বিস্ময়-কৌতূহল ও আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। ছড়ার জগৎ শিশুর স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ, যেখানে আমাদের বয়স্ক মনের হিসাব নিকাশ একেবারেই অচল। ছড়ার মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা সম্পর্কিত নানা বিষয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। 'মেয়েলি ছড়া' ও ব্রতের ছড়া'র মধ্যে রয়েছে নারী-জীবনের সুখ-দুঃখের নানা কথা। নাবালিকা কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর বেদনাও অনেক ছড়ায় মর্মস্পর্শীভাবে প্রকাশিত হয়েছে ; যেমন—

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে॥

ছড়ার অন্যান্য উপজীব্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিয়ের ঘটনা, রূপকথার পরী ও রাজপুত্র, ভূত-প্রেত-দৈত্য ও রাক্ষস, ঐতিহাসিক ঘটনা, কিংবদন্তী ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, ছড়ায় ভাষার মধ্যেও যথেষ্ট বিশেষত্ব রয়েছে। ছড়ার রচয়িতারা গ্রাম বাংলার জনজীবনের সহজ-সরল আবেগকে কথ্য ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে ছড়ার মধ্যে এমন একটি আবেদনের সৃষ্টি করেছেন যা শ্রোতার মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ছড়ার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তদ্ভব, দেশী ও গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ ছাড়াও ছড়ার মধ্যে এমন অনেক অর্থহীন শব্দ পাওয়া যায় যা কেবল ধ্বনির বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে ; যেমন—'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।' প্রয়োজনবোধে ছড়ার রচয়িতারা কোন কোন শব্দকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছুটা বিকৃত ক'রে প্রয়োগ করেছেন ; যেমন—'খোকা যাবে বেড়ু করতে… …………।' এই 'বেড়ু' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,

ছড়ার ভাষা

"এ স্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ স্বতন্ত্র এবং স্নেহাস্পদ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।" অনুরূপভাবে 'জুতা' শব্দটি স্নেহাধিক্যবশতঃ 'জুতুয়া' শব্দে রূপান্তরিত হয় ('খোকা যাবেন নায়ে/লাল জুতুয়া পায়ে।')।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ধরনের কবিতার ছন্দের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের অনেক পার্থক্য

রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ হল উচ্চারণের দ্রুততা এবং শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য। ছড়ার ছন্দকে বলা হয় **শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ**। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হল (১) এখানে প্রত্যেক পর্বে চারটি ক'রে মাত্রা থাকবে; (২) প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় শ্বাসাঘাত পড়বে; এবং (৩) প্রত্যেকটি চরণে ঊর্ধ্বপক্ষে চারটি পর্ব থাকবে এবং শেষের পর্বটি অপূর্ণপদী হবে; যেমন—

ছড়ার ছন্দ

কে মেরেছে | কে ধরেছে | কে দিয়েছে | গাল
তাইতো খুকু | রাগ করেছে | ভাত খায়নি | কাল

প্রত্যেক পর্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত থাকার জন্য এই ছন্দের লয়ও দ্রুত হয়ে যায়। এই ছন্দকে **ছড়ার ছন্দ, বলবৃত্ত ছন্দ** অথবা **লৌকিক ছন্দ**ও বলা হয়।

চতুর্থতঃ, ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর **যাদুধর্মিতা**। ছড়ার প্রতি শিশুদের এক দুর্নিবার আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এই আকর্ষণের মূলে রয়েছে ছড়ার শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের স্পন্দন এবং ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনিঝংকার। একদিকে ছন্দ ও শব্দের মিলিত সঙ্গীত এবং অপরদিকে এর বিষয়বস্তুকে সম্ভব-অসম্ভব, লৌকিক-অলৌকিক প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ ছড়ার মধ্যে এক অদ্ভুত যাদুধর্মিতার সৃষ্টি করেছে। ছড়ার এই যাদুধর্মিতার জন্যই শিশুদের কাছে এর আকর্ষণ এত বেশি।

ছড়ার যাদুধর্মিতা

পঞ্চমতঃ, ছড়ার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের উষ্ণ স্নেহ-মমতার স্পর্শ যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শিশুর প্রতি মায়ের অপত্যস্নেহের যে দুর্নিবার আবেগ রয়েছে তার সবটুকু যেন ব্যবহারিক জীবনের সাদাসিধা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঠিক সেইজন্যই ছড়ায় কখনো ব্যবহৃত হয় অর্থহীন শব্দ, আবার কখনো বা দেখা যায় প্রচলিত শব্দের আদর-প্রকাশের উপযোগী বিকৃত রূপ; যেমন—

ছড়ায় মায়ের মনোভাব

'খোকা যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচ শো টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে।'

অথবা, 'নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি।
ষষ্ঠিতলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারি ॥
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর।
আমাদের বাড়ি নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর ॥'

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তা অন্ধ, আদিম এবং অমৃতলোকের বস্তু। তাই জাগতিক কোন মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য মা তাই মর্ত্যলোকের কোন বস্তু এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে বেশিক্ষণ

সন্তুষ্ট হতে পারেন না—এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভেদসীমাই লুপ্ত হয়ে যায় :—

'চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব—
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি।'

সবশেষে **ভাষাশিক্ষায় ছড়ার স্থান** সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। শিশুর ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ছড়ার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে (Pre-Primary Stage) শিশুর বর্ণ-পরিচয় হওয়ার আগেই সে ছড়া ও ছবির বই দেখে ছড়া আবৃত্তি ক'রে একদিকে যেমন নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং সেগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে শেখে, অপরদিকে তেমনি ভাষার লিখিত-রূপের সঙ্গেও তার প্রাথমিক চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। ছড়ার প্রতি যেসব কারণে শিশুদের এক দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে সেগুলি হল—(১) দ্রুত লয়-বিশিষ্ট শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য ; (২) ছড়ায় কথ্যভাষা এবং তদ্ভব, দেশী, গ্রাম্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থহীন শব্দের ব্যবহার ; (৩) ছড়ায় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বাস্তব কল্পনামিশ্রিত বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ; এবং (৪) মাতৃ-হৃদয়ের অকৃপণ ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ছড়ার এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে শিশুদের কাছে ভাষাশিক্ষা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে বিশেষ্যপদ বা নামপদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আবার ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশুদের বিশেষ্যপদই বেশি পরিমাণে শেখানোর প্রয়োজন হয়। সেইজন্য বিশেষ্যপদ শেখাবার ব্যাপারে ছড়া শিক্ষককে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এছাড়া ক্রিয়াপদ শিক্ষার ব্যাপারেও ছড়াকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ছড়ার সাহায্যে শিশুদের মধ্যে ভাষাশিক্ষার শুরু থেকেই ভালভাবে সরব পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলা যায়। এই সরব পাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শিশুরা শুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী আয়ত্ত করতে শেখে অপরদিকে তেমনি তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে, এবং কিছু পরিমাণে তাদের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির উদ্গতি সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ছড়ামাত্রই যে শিশুর ভাষাশিক্ষার উপযোগী ব'লে বিবেচিত হবে তা নয়। শিশুমনের উপযোগী এবং ভাষাশিক্ষার সহায়ক ছড়াগুলিকেই কেবল শিশুর ভাষাশিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে ছড়াকে ভাষাশিক্ষার কাজে লাগাতে পারলে শিশুর ভাষাশিক্ষার পথ যে সুগম হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভাষা শিক্ষায় ছড়ার স্থান

২। মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বাংলা কবিতা :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কি কি ধরনের কবিতা পড়ানো হবে সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি নিচে উদ্ধৃত করা হল :

(ক) **ষষ্ঠ শ্রেণী**—এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় আনুমানিক ১০টি কবিতা থাকবে। "পদ্যাংশের জন্য বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে। এই পর্যায়ে বাংলা ও বাঙ্গালীর জাতীয়তা বিষয়ক কথার অবকাশ থাকাও বাঞ্ছনীয়।"

সহায়ক পাঠের জন্য নির্ধারিত কবিতা পুস্তকে 'ভারতে প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাহিনী, নীতিমূলক গল্প, মহাপুরুষদের জীবনকথা' প্রভৃতি ভাবের কবিতার প্রাধান্য থাকবে।

(খ) **সপ্তম শ্রেণী**—এই শ্রেণীর "পদ্যাংশের জন্য প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে।"

সহায়ক পাঠের জন্য নির্ধারিত কবিতা পুস্তকে 'ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, মহাপুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত, আত্মস্মৃতি, ভ্রমণ, পুরাণের গল্প, মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর কবিতা সংকলিত হবে।

(গ) **অষ্টম শ্রেণী**—এই শ্রেণীর পদ্যাংশ সপ্তম শ্রেণীর অনুরূপ হবে। তবে পদ্যের মান পূর্বপেক্ষা উচ্চতর হবে।

সহায়ক পাঠের পদ্যাংশের বিষয়বস্তু সপ্তম শ্রেণীর অনুরূপ হবে।

(ঘ) **নবম ও দশম শ্রেণীর** জন্য নির্দিষ্ট পাঠ-সংকলন গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের কবিতা সংকলিত হয়েছে :—

(১) **মহাকাব্যের অংশ**—'শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন', 'দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র', 'ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষণ' প্রভৃতি।

(২) **গাথাশ্রেণীর কবিতা**—'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি।

(৩) **দেশাত্মবোধক কবিতা**—'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'আমরা', 'ভারতবর্ষ' 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি।

(৪) **প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা**—'মধ্যাহ্নে', 'কালবৈশাখী' প্রভৃতি।

(৫) **সনেট**—'বিজয়া-দশমী', 'বঙ্গমাতা' প্রভৃতি।

(৬) **পৌরাণিক কবিতা**—'জীবন-ভিক্ষা', 'দধীচির তনুত্যাগ' প্রভৃতি।

(৭) **ধর্মবিষয়ক ও নীতিজ্ঞানমূলক কবিতা**—'ধূলামন্দির', 'ত্রিরত্ন' প্রভৃতি।

(৮) **রূপকধর্মী কবিতা**—'হাট', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' প্রভৃতি।

(৯) **বর্ণনামূলক কবিতা**—'আমরা', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি।

॥ কবিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ॥

৯।। কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য কি? কবিতাপাঠকে হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক করিতে হইলে কোন্ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ বলিয়া আপনি মনে করেন তাহা যুক্তিসহকারে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1978]

উত্তর : কবিতা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কবিতা-পাঠের মাধ্যমে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ ঘটে এবং আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। আমাদের মধ্যে নানারকম অমার্জিত প্রবৃত্তি ও আবেগ রয়েছে। কবিতার মহৎ ভাবের সংস্পর্শে এসে আমাদের মনের ঐসব অমার্জিত প্রবৃত্তি ও আবেগের উদ্গতি (sublimation) ঘটে। কবিতা পাঠ করলে আমাদের মন এক অলৌকিক আনন্দের জগতে প্রবেশ করে এবং তারফলে আমাদের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তিগুলি রয়েছে সেগুলি আরও পরিমার্জিত হয়। তাছাড়া মানব-জীবনের মহৎ ভাব ও আদর্শগুলি কাব্যপাঠের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অতএব কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য হল জীবন সম্পর্কে কবির গভীর উপলব্ধির সংস্পর্শে এনে ছাত্রদের আত্মিক উন্নতি সাধন করা এবং তাদের এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদলাভ করতে সাহায্য করা। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ে কবিতা শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য শব্দের অর্থ শিক্ষা দেওয়া কিংবা কবিতার বিষয়বস্তু ছাত্রদের বুঝতে সাহায্য করা নয়। কবিতা শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হল, কবিতা রচনার সময় কবি যা অনুভব করেছিলেন এবং কবিতার মধ্যে যে ভাব বা অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন তা উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সাহায্য করা। ছাত্রেরা যেন কবির প্রকৃতি প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজেরাও অনুরূপভাবে প্রকৃতিকে ভালবাসতে পারে। বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণী থেকে আরম্ভ ক'রে উপরের শ্রেণী পর্যন্ত এই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তবে, একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিদ্যালয়-শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বিশেষত্ব, বক্তব্য-বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রধান কাজ হল শ্রেণীকক্ষে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে **কবিতার অর্থ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেয়ে ছাত্রেরা কবিতার রস হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে।** অবশ্য কবিতার রস হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য যেটুকু বোঝা দরকার তা তাদের বুঝতে হবে।

কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য

এখন কবিতাপাঠকে হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক করতে হলে কোন্ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। কবিতা শিক্ষাদানের জন্য সার্থক শিক্ষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে

লক্ষ্য রাখতে হবে। **প্রথমতঃ,** বিদ্যালয়ে যেসব কবিতা পড়ানো হবে সেগুলির সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ নেই এমন কোন বিষয়-সংক্রান্ত কবিতা তারা আস্বাদন করতে পারবে একথা ভাবা ভুল। ছাত্রদের মধ্যে যেন এরকম ধারণা না হয় যে, কবিতার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। অপরপক্ষে, তারা যেন একথা ভাবতে শেখে যে, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই কবিতার উদ্ভব হয়। এইজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা ছাত্রদের জন্য কবিতা নির্বাচন করতে পারি তাহলে কবিতা তাদের জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গে এবং তাদের সারা জীবনের সাথীতে পরিণত হবে। ছাত্রদের জন্য যেসব কবিতা নির্বাচিত হবে সেগুলির মধ্যে চিন্তার সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য থাকা প্রয়োজন। এই কবিতাগুলির ছন্দও আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। নিচু শ্রেণীতে ছন্দের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুরা চলার ছন্দ, সঙ্গীত এবং শব্দের ধ্বনি (sound) খুব পছন্দ করে। সেইজন্য নিচু শ্রেণীতে ছড়ার কদর এত বেশি। **দ্বিতীয়তঃ,** প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কবিতাও ছাত্রদের পড়াবেন। ছাত্রদের জন্য ভাল কবিতা নির্বাচন করতে হলে শিক্ষককে ভাল কবিতার লক্ষণ কি তা জানতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ভাল কবিতা পড়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে। কারণ W. M. Ryburn-এর মতে, "Good taste, even in the simplest poems, will come only by keeping in the company of good poetry." **তৃতীয়তঃ,** কবিতা শিক্ষাদানের প্রথম পদক্ষেপ হল **শিক্ষকের আদর্শ পাঠ**। কবিতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে **সরব আবৃত্তির** ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য শিক্ষকের সরবে আবৃত্তি করার ক্ষমতা থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষককে আদর্শ পাঠের সাহায্যে ছাত্রদের কাছে কবিতার অর্থ কিছুটা পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষককে প্রথমে কবিতাটির অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কারণ কবিতার অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে কখনই কবিতা সঠিকভাবে পড়া যায় না। শিক্ষকের আদর্শ পাঠের উপর শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র কবিতা প'ড়ে কতটা আনন্দ পাবে এবং কবিতার অর্থ কতটা বুঝতে পারবে তা নির্ভর করছে। অবশ্য তারজন্য শিক্ষককে কবিতাটি দু'তিনবার অন্ততঃ পড়তে হবে। সরব পাঠের সময় শিক্ষককে সুর করে কবিতা পড়ার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। **চতুর্থতঃ,** ছোট কবিতাগুলিকে প্রথমে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে যাতে ছাত্রদের কাছে কবিতাটির সামগ্রিক আবেদন পৌঁছাতে পারে। তারপর কবিতাটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে পড়াতে হবে। বড় কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ করা সম্ভব নয়—সেক্ষেত্রে শুরু থেকেই ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে কবিতাটিকে পড়াতে হবে। **পঞ্চমতঃ,** কবিতার অন্তর্গত কঠিন শব্দ, শব্দগুচ্ছ (phrase), উল্লিখিত-ঘটনা (allusion) ও অলঙ্কারের অর্থ ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু শিক্ষককে সবসময় একথা মনে রাখতে হবে যে, পৃথকভাবে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার চেয়ে কবিতাটির রস আস্বাদন করতে সাহায্য করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কবিতা শিক্ষাদানের সার্থক পদ্ধতি

কঠিন শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছের অর্থ ব্যাখ্যা করা কবিতা পড়ানোর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, যদিও অধিকাংশ শিক্ষকই এটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মনে করেন। কবিতা পড়ানোর উদ্দেশ্য সরাসরিভাবে ছাত্রদের নতুন শব্দ শেখানো, কিংবা ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা, কিংবা তাদের প্রকাশ-ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা নয়। কবিতা পড়ানোর সময় কঠিন শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হবে ; কিন্তু এটাই কবিতা পড়ানোর মূল লক্ষ্য হবে না। কবিতা পড়ানোর মূল লক্ষ্য হবে, শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে কবিতা পাঠের মাধ্যমে এক অলৌকিক আনন্দলাভে সাহায্য করা এবং তার কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো। কবিতার মধ্যে যেসব আবেগ ও কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে ছাত্রের মধ্যে সেগুলি উদ্দীপিত করা।[১] **ষষ্ঠতঃ**, ছাত্রদের কোন কবিতা মুখস্থ করতে বাধ্য করা উচিত হয়। এ সম্পর্কে W. M. Ryburn-এর অভিমত হল, "...the forcing of children to learn so many verses off by heart simply results in an aversion to poetry." ছাত্রেরা যদি কোন কবিতা স্বেচ্ছায় মুখস্থ করতে চায় তাহলে তাদের তা করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু জোর ক'রে তাদের কবিতা মুখস্থ করাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। ছাত্রেরা কোন কবিতা মুখস্থ করবে কি করবে না সে বিষয়ে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। **সপ্তমতঃ**, কোন কোন কবিতা পড়াবার পূর্বে শিক্ষককে ঐসব কবিতার পটভূমি (background) এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের কিছুটা ধারণা দিতে হবে। এতে ঐ কবিতাগুলি বুঝতে ছাত্রদের সুবিধা হবে। বিশেষ ক'রে কোন ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা পড়াবার সময় এটা করা দরকার। ছাত্রদের মধ্যে যাতে কবিতার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাল ভাল কবিতা পড়ার মধ্য দিয়েই কেবল এই অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে।[২] **অষ্টমতঃ**, ছাত্রদের **সরব পাঠও** কবিতা পড়াবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে সব ছাত্রকে দিয়ে সরব পাঠ করাবার সময় পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে প্রথমে ছাত্রদের দ্বারা **সমবেত সরব পাঠ** করিয়ে নিয়ে তারপর এক এক ক'রে কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে সরব পাঠ করানো যেতে পারে। ছাত্রদের সরব পাঠের আগে শিক্ষকের একাধিকবার সরব পাঠ করা উচিত। কবিতা পাঠের সময় অযথা অঙ্গভঙ্গী করা উচিত নয়। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদি অঙ্গভঙ্গী এসে পড়ে

১। "The aim (of teaching poetry) is to afford each individual in the class a keen and sincere pleasure in a new experience and an enlargement of his power of sympathetic imagination ; to enable the poems to stimulate emotions and imagination for which the poem is itself the adequate expression."

—Teaching Poetry, O. U. P.

২। "Taste and appreciation develop from being in good company, and this applies to poetry as well as to other forms of literature."

—W. M. Ryburn, The Teaching of the Mother-tongue

তবে তা করা চলতে পারে। **নবমতঃ,** কবিতা পড়াবার সূত্রে ছাত্রদের কিছু কিছু সৃজনমূলক কাজ করতে দিতে হবে ; যেমন—কবিতা পড়ার পর ছবি এঁকে তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা ; গদ্যরচনার সাহায্যে কবিতার ভাব ব্যক্ত করা ; অনুরূপ ভাবসম্পন্ন কবিতা লেখা প্রভৃতি। ছাত্রদের লেখা কবিতা ভাল হলে সেগুলি দেওয়াল পত্রিকা কিংবা বার্ষিক পত্রিকায় যাতে প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বর্ণনামূলক ও কাহিনীমূলক কবিতাগুলিকে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **দশমতঃ,** কবিতার গদ্যরূপ (paraphrase) লেখানো রসোপলব্ধির জন্য কবিতা পড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক। কারণ কবিতার গদ্যরূপ লেখানো ছাত্রদের মধ্যে কাব্যিক অনুভূতি ও কাব্যিক বোধের বিকাশ ঘটাতে বাধা সৃষ্টি করে।[১]

পরিশেষে, কবিতা-শিক্ষাদানকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :—

॥ ক ॥ কি কি করতে হবে ['Dos' in teaching poetry]

(১) শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভাল ভাল কবিতা পড়তে হবে। কারণ কবিতার সমঝদার না হলে শিক্ষক কখনই সার্থকভাবে কবিতা পড়াতে পারবেন না।

(২) ছাত্রদের মিলযুক্ত পদ্য ও ছড়া রচনায় উৎসাহিত করতে হবে।

(৩) ছাত্রেরা যাতে তাদের ভাল-লাগা কবিতাগুলি একটি খাতায় (Collection Book) সংগ্রহ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী ছাত্রদের ছবি আঁকতে কিংবা ছবি সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৫) শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সমবেত কবিতা-সংগ্রহ-পুস্তক তৈরী করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) কবিতা পড়ানোর পূর্বে শিক্ষককে উপযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) তৈরী করতে হবে এবং পড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) ব্যবহার করতে হবে।

॥ খ ॥ কি কি করা চলবে না ['Don'ts' in teaching poetry]

(১) কবিতার অতিরিক্ত ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে। ('Too much explanation is a mistake.'—F. L. Billows)

(২) ছাত্রেরা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই যাতে কবিতার আস্বাদন লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। "Writing paraphrases of poetry is probably one of the worst things we can make our children do if we want to teach them to appreciate poetry, and to develop the poetic sense and poetic feeling."

—W. M. Ryburn, The Teaching of the Mother-tongue.

(৩) ছাত্রদের ওপর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের রসাস্বাদনের মান চাপিয়ে দেওয়া চলবে না ; অর্থাৎ ছাত্রেরা কোন কবিতা বড়দের মত ক'রে বুঝতে এবং তার রসাস্বাদন করবে এটা প্রত্যাশা করা ভুল হবে।

(৪) ছাত্রদের যার যেরকম রুচি সেই অনুযায়ী তাদের পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কবিতা পাঠে বাধা দেওয়া চলবে না।

(৫) ছাত্রদের কবিতা মুখস্থ করতে বাধ্য করা চলবে না।**

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

সাহিত্যরসাস্বাদন (Literary Appreciation) :

সাহিত্যগুণসম্বলিত কোন গদ্যরচনা কিংবা কোন কবিতা পাঠ ক'রে পাঠকের অন্তরে যখন একপ্রকার অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার হয় তখন পাঠকের অন্তরের এই-উপলব্ধিকে বলা হয় সাহিত্যরসাস্বাদন। কোন গদ্যরচনার সাহিত্যগুণ আছে কিনা তা বুঝতে হলে দেখতে হবে যে রচনাটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে কিনা যার দ্বারা ছাত্রদের মনে আনন্দ ও সন্তোষের সৃষ্টি হয়, এবং তাদের আত্মিক আকাঙ্খা মানব-জীবনের মৌলিক ও শাশ্বত সৌন্দর্য অর্থাৎ সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রতি ধাবিত হয়। রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের যেসব গদ্যরচনা পড়ানো হবে সেগুলির বিষয়বস্তু তাদের নিকট আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গদ্যরচনার বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হলেও শিক্ষক যদি ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারেন তাহলে তারা গদ্য-রচনার রসাস্বাদন করতে সক্ষম হবে না। সেইজন্য শিক্ষককে গদ্যরচনার সাহিত্যগুণ ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তা না হলে এগুলি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। গদ্যসাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য রচনা-রীতি (style) এবং গঠনভঙ্গী (form) সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করতে হবে। গঠনভঙ্গীর দিক থেকে গদ্যরচনাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ঘটনার বিবরণমূলক রচনা (Narrative) ; (২) বর্ণনামূলক রচনা (Descriptive) ; এবং (৩) চিন্তামূলক রচনা (Reflective)। গদ্যরচনার রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রদের সঠিকপথে পরিচালিত করতে হলে—সহজ থেকে কঠিন বিষয়ে যেতে হবে এবং ঘটনার বিবরণমূলক রচনা থেকে চিন্তামূলক রচনার দিকে অগ্রসর হতে হবে। রচনা-রীতির ব্যাপারে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, **উৎকৃষ্ট রচনার লক্ষণ হল বিষয়বস্তু ও ভাষার সুন্দর বিন্যাস আর বিচারশক্তির দ্বারা এই বিন্যাসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারাকেই বলা হয় রসাস্বাদন** ("The right ordering of both material and language is the mark of good writing, and appreciation (which is an act of judgment) is a recognition of skill in this ordering.")।

** এই উত্তরটি W. M. Ryburn-এর 'The Teaching of Poetry' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।

রসাস্বাদনের জন্য গদ্য সাহিত্য পড়াতে হলে শব্দের সৌন্দর্য ও শক্তির (force) উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আবার লেখক তাঁর রচনায় যেসব শব্দ ব্যবহার করেন সেগুলির সাহায্যে তিনি যে সামগ্রিক আবেদন (Total Effect) সৃষ্টি করতে চান সে সম্পর্কেও ছাত্রদের সজাগ ক'রে তুলতে হবে। উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য তারা যাতে লাইব্রেরী থেকে প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা উন্নত-মানের সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনাসমূহ পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কবিতার ক্ষেত্রে রসাস্বাদন বলতে বোঝায়, কবির গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধি যা বিশিষ্ট-শব্দ-ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ও প্রতীকের মাধ্যমে কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ ক'রে আনন্দ লাভ করা এবং কবিতা রচনার সময় কবির মনে যে এক অনির্বচনীয় হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করা। কবিতার রসাস্বাদনের মাধ্যমে আমাদের মন এক অলৌকিক আনন্দের জগতে প্রবেশ করে এবং তারফলে আমাদের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তিগুলি রয়েছে সেগুলি আরও পরিমার্জিত হয়। এছাড়া মানব-জীবনের মহৎ ভাব ও আদর্শগুলি কাব্যপাঠের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তবে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পক্ষে কবিতার গভীর রসোপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গীর বিশেষত্ব, বক্তব্য-বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

কবিতা পড়াবার সময় কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলি গদ্যরচনায় ব্যবহৃত শব্দের মত সাধারণ শব্দ নয়। এই শব্দগুলির সাহায্যে কবির একটি বিশেষ মুহূর্তের রসানুভূতি কবিতার আকারে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। যে-কোন ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের সাধারণতঃ দুইটি অর্থ থাকে—একটি হল বাচ্যার্থ অথবা সহজ অর্থ ; আর অপরটি হল ব্যঙ্গ্যার্থ অথবা গূঢ় অর্থ। কবিতায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ সাধারণতঃ ব্যঙ্গ্যার্থেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষত্বের প্রতি প্রথম থেকেই ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষত্ব সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "কবিচিত্তের এই রসময়ী বিশেষ বাণী যখন আবার সেই জাতীয় বাণীকে সুষ্ঠুরূপে এবং অতি সুকুমাররূপে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় তখনই তাহা যথার্থ সাহিত্য হয় এবং তখনই তাহা আমাদের একটা অলৌকিক চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়।"

কবিতার রসাস্বাদনের জন্য শিক্ষককে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচালিত করতে হবে। কারণ অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে কেবল নিজের চেষ্টায় কবিতার রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষককে কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শব্দ, ছন্দ-বৈচিত্র্য, পদলালিত্য, প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য, ভাব-কল্পনা প্রভৃতির প্রতি তাদের

মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে রসাস্বাদনের অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে।

১০ ॥ ভাল পাঠ্যপুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক সে সম্পর্কে আলোচনা করুন ॥

উত্তর ঃ ভাষাশিক্ষার জন্য উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :—

(১) পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে রচনা থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্নধরনের যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলির মধ্যে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও মনীষীদের জীবন-কথা, বৈচিত্র্যমূলক সাহিত্যিক ও দেশাত্মবোধক রচনা, গল্প, উপাখ্যান, ভ্রমণকাহিনী, অভিযান ও আবিষ্কার, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, স্মৃতিচারণ, স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিষয় সম্পর্কে রচনা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনাংশ উল্লেখযোগ্য। পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রচনাগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেগুলি পড়বার সময় ছাত্রদের আগ্রহ সর্বদা বজায় থাকে।

(২) কোন শ্রেণীর ছাত্রদের সারা বছর ধ'রে যেসব শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাগ্ধারা ও ব্যাকরণের নিয়মকানুন শিখতে হবে ঐ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট গদ্যরচনাগুলিতে যেন সেসবের বহির্ভূত কোন জিনিস না থাকে।

(৩) পাঠ্যপুস্তকের ভাষা 'সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিল' এই নিয়ম অনুসারে যেন বিন্যস্ত হয়।

(৪) যেখানে ভাষাগত বর্ণনার দ্বারা ছাত্রেরা কোন বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারছে না সেখানে ছবি কিংবা রেখাঙ্কনের (sketches) সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ ক'রে নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকে বেশি পরিমাণে ছবির ব্যবহার থাকবে। বর্ণনামূলক এবং তথ্যমূলক রচনাগুলির ক্ষেত্রে ছবির প্রয়োজন খুব বেশি অনুভূত হয়। কারণ ছবি থাকার জন্য রচনাগুলি পড়বার সময় পাঠকের আগ্রহ বজায় থাকে এবং ছবির মাধ্যমে কোন কোন শব্দের অর্থ ভাল-ভাবে বোঝা যায়।

(৫) পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা ও বাঁধাই যাতে উৎকৃষ্ট ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ সরব পাঠ, নীরব পাঠ ও দ্রুত পঠন ॥

১। সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1977]

২। সাহিত্যপাঠনে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের উপযোগিতা নির্দেশ করুন। [C. U. B. Ed. 1973]

৩। পঠনের প্রয়োজনীয়তা কি? ভাষাশিক্ষায় সরব ও নীরব পঠনের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন এবং পঠন শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহাও বিবৃত করুন। [C. U. B. Ed. 1971]

৪। 'ভাষা-শিক্ষার জন্য যেমন নীরব পাঠের তেমনি সরব আবৃত্তিরও আবশ্যকতা আছে।'—এই উক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনার মন্তব্য প্রমাণ করুন এবং শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব তাহাও নির্দেশ করুন। [C. U. B. T. 1965]

৫। ভাষা-শিক্ষায় সরব পাঠ ও নীরব পাঠের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন।

[C. U. B. T. 1976 ; N. B. U. B. T. 1970]

৬। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব পাঠ ও নীরব পাঠের স্থান কতখানি? উভয় ব্যাপারের জন্য আমরা কি-ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করিব? [B. U. B. Ed. 1972]

৭। সরব-পঠন ও নীরব-পঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কাব্য-পাঠে কোন্‌টি বেশি উপযোগী? যুক্তিসহ নিজের অভিমত ব্যক্ত করুন। [N. B. U. B. T. 1968]

৮। পঠন কয়প্রকার সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসহ একটি প্রবন্ধ রচনা করুন এবং ভাষাশিক্ষায় সরব পাঠ ও নীরব পাঠের যথাযথ স্থান নির্দেশ করুন। [K. U. B. Ed. 1972]

৯। সরব-পাঠ ও নীরব-পাঠের মধ্যে পার্থক্য কোন্‌খানে? পাঠদানকালে কোনটি কখন কিভাবে ব্যবহার করিবেন, দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন। [B. U. B. Ed. 1970]

১০। সাহিত্য-পাঠনে স্বাদনা (appreciation) ও বিচার-বিশ্লেষণ (critical appreciation)-এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1974]

১১। দ্রুতপঠন পাঠের উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য কি কি? এই লক্ষ্যসিদ্ধির অনুকূল পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত? কোন্ কোন্ কারণে এই পাঠ ব্যর্থ হয়? [B. U. B. T. 1966]

১২। বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়? ইহার সাফল্য কিরূপে বিচার করিবেন? [N. B. U. B. T. 1967]

॥ গদ্য ও কবিতা শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

১৩। ছাত্রদের পঠন-শক্তি বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি বিবৃত করুন। [N. B. U. B. T, 1969]

১৪। কবিতা ও গদ্য পড়াইবার পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করুন। [C. U. B. T. 1960]

১৫। গদ্য ও পদ্যের পড়ানোর রীতির তুলনামূলক আলোচনা করুন (সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সহ)।

[P. G. B. T. 1977]

১৬। 'কিশলয়' হইতে 'পাঠ সংকলন' পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে গদ্যাংশে কি ধরণের গল্প বা কথাকাহিনী সাধারণতঃ পাওয়া যায়? বিভিন্ন নামে ইহাদের অভিহিত করিবার কারণ কি? কোন্ ধরণের গল্প কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী বলিয়া মনে করেন? [B. U. B. Ed. 1965]

১৭। কবিতা-পাঠের উদ্দেশ্য কি? বাংলা কবিতা কিভাবে পড়ানো উচিত?

[N. B. U. B. T. 1970]

১৮। কবিতা-পাঠনার উদ্দেশ্য ও উপযুক্ত রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1972]

১৯। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কবিতার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে যুক্তিযুক্ত কিনা আলোচনা করুন। কবিতা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজন আছে কি?

[C. U. B. Ed. 1974]

২০। কবিতা পড়াইবার সাফল্য সুষ্ঠু পাঠের উপর কতটা নির্ভর করে? আদর্শ পাঠের লক্ষণ কি কি?

[B. U. B. Ed. 1961]

২১। কবিতা পড়ানোয় ছাত্রদের মনে অলঙ্কার-বোধ কিভাবে জাগানো যায়, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করুন। [B. U. B. Ed. 1963]

২২। পঞ্চ-সোপান পদ্ধতিতে বাংলা কবিতা কি সার্থকভাবে পড়ানো সম্ভব? আরও কার্যকরী পন্থা কিরূপ হইতে পারে, উদ্দেশ্য-সাধনের দিক দিয়া বিচার করিয়া লিখুন। [B. U. B. Ed. 1972]

২৩। কবিতা-পাঠে কোন্ লক্ষ্য সঙ্গত? উপস্থাপন সোপানে তাহায় অনুকূল পদ্ধতি কি? অভিযোজনে কোন্ ধরনের প্রশ্ন হইবে? বাড়ির কাজ কি দেওয়া যাইতে পারে? স্বনির্বাচিত একটি কবিতা উল্লেখ করিয়া মন্তব্যগুলি লিখুন। [B. U. B. T. 1966]

২৪। বাংলা কবিতা পড়াইতে হইলে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে? [K. U. B. Ed. 1973]

২৫। ভাষা, বিষয়বস্তু, খোকা-খুকুর ছড়ায় মায়ের মনোভাব ও ছন্দের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ—মাত্র এই কয়টি শীর্ষে বাংলায় প্রাচীন পড়ার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন। [C. U. B. T. 1970]

৫ [খ]

লেখার ও বাগ্‌যন্ত্রের কাজ ঃ

[Written and Oral Work :

(ii) Recitation, Elocution, Debates and discussions ;

(iii) Grammar—different methods of teaching ;

(iv) Composition—oral and written, Picture Composition—Free Composition : Pre´cis, substance and essay writing ; Creative writing ;

Dictation—Spelling — Punctuation — Handwriting : different styles—Methods of teaching ;

(v) Translation—its place in the curriculum —Methods of teaching.]

(ii) আবৃত্তি, বাগ্মিতা, বিতর্ক আলোচনা ;

(iii) ব্যাকরণ—শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ;

(iv) রচনা—মৌখিক ও লিখিত, ছবির সাহায্যে রচনা—স্বাধীন রচনা ঃ সারসংক্ষেপ, সারাংশ এবং প্রবন্ধ ; সৃজনমূলক রচনা ;

শ্রুতলিখন—বানান—বিরাম-চিহ্ন ; হাতের লেখা ঃ বিভিন্ন রীতি - শিক্ষাদানের পদ্ধতি ;

(v) অনুবাদ—পাঠ্যক্রমে ইহার স্থান—শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

॥ বিভিন্নপ্রকার বাগ্‌যন্ত্রের কাজ ॥

১॥ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ—

(ক) আবৃত্তি ; (খ) বাগ্মিতা ; (গ) বিতর্ক ; (ঘ) আলোচনা।

উত্তর ঃ (ক) আবৃত্তি (Recitation)—কবিতা পড়ার আনন্দ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় আবৃত্তির মাধ্যমে। **আবৃত্তির অর্থ হল ছন্দ, যতি, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্মৃতি থেকে কবিতা শ্রোতাদের সামনে সরবে উচ্চারণ করে তাদের মনে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সঞ্চারিত করা।** বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যদি উপযুক্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তারা কবিতা প'ড়ে প্রচুর আনন্দ পাবে এবং কবিতার অন্তর্নিহিত রস আস্বাদন করতে সক্ষম হবে।

আবৃত্তি হল একটি কলা বিদ্যা (art)। এই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে কবিতার সৌন্দর্যের দ্বারা অতিমাত্রায় অভিভূত হলে চলবে না, তার পরিবর্তে ছন্দ, যতি, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, মুখভঙ্গী ও অঙ্গ ভঙ্গীর সাহায্যে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। কোন পাঠক কবিতা প'ড়ে আনন্দ লাভ করতে পারে, এমন কি সে কবিতার গঠন, ভাষা, ভাব ইত্যাদির রসও উপলব্ধি করতে পারে—কিন্তু তার দ্বারা একথা বোঝায় না যে সে যথাযথভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে, যদি না সে আবৃত্তির কলা-কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত ক'রে থাকে। কলা-বিদ্যার বিভিন্ন শাখা যেমন সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতির মত আবৃত্তিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অবশ্য আবৃত্তির প্রতি প্রবণতা না থাকলে কেবল প্রশিক্ষণের দ্বারা সুদক্ষ আবৃত্তি-শিল্পী হওয়া যায় না। তবে বিদ্যালয়-স্তরে ছাত্রদের আবৃত্তির কৌশল শেখালে তারা কবিতা পাঠ ক'রে অনেক বেশি আনন্দ লাভ করতে পারবে। কিন্তু সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে কবিতা পড়ানোকে কেন্দ্র ক'রে ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তির দক্ষতা সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা করা হয়না। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে কবিতার উপযুক্ত রসও তারা আস্বাদন করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে কবিতার রসাস্বাদনের সঙ্গে আবৃত্তির একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। আমরা যখন কোন কবিতার রসাস্বাদন করি তখন স্বভাবতঃই আমাদের মধ্যে কবিতাটি আবৃত্তি করার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। কাজেই কোন কবিতা আবৃত্তি করার পূর্বে ছাত্রেরা যাতে কবিতাটির রস আস্বাদন করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) **বাগ্মিতা (Elocution)**—বাগ্মিতার অর্থ হল বাক্‌পটুতা। অনেকে 'বাগ্মিতা' ও 'বক্তৃতা'কে অভিন্ন ব'লে মনে করেন। কিন্তু বাগ্মিতা ও বক্তৃতা এক জিনিস নয়। বক্তৃতার অর্থ হল ভাষণ—শ্রোতাদের কাছে কোন বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করাকে বক্তৃতা বলে। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাগ্মিতার প্রয়োজন হয়। অতএব বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাকেও আমরা বাগ্মিতা বলতে পারি। কোন ভাষায় সুস্পষ্টভাবে কথা বলতে হলে যথাযথভাবে বাগ্‌যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য প্রথম থেকেই ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার স্বরধ্বনি (Vowel sound) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant sound) সঠিকভাবে উচ্চারণ করার শিক্ষা দিতে হবে। আলাদা আলাদাভাবে ঐসব ধ্বনির উচ্চারণ শেখাবার পর কথাবলার সময় ছাত্রেরা যাতে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে তারজন্যও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কথাবলার সময় উচ্চারণের স্পষ্টতা বজায় রেখে শ্রোতার কাছে বক্তব্যবিষয় উপস্থিত করতে পারাই বাগ্মিতার একমাত্র লক্ষণ নয়। বাগ্মিতার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রয়েছে। সেগুলি হল—(১) কোন শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রোতার কাছে বক্তৃতায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া; (২) শ্রোতাদের গ্রহণক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বক্তব্যবিষয় ও ভাষার মান নির্ধারণ করা; (৩) বক্তব্যবিষয় উপস্থাপনের বিশেষত্ব; এবং

(৪) বাক্‌চাতুর্য (wit) ও কৌতুকের (humour) সাহায্যে বক্তব্যবিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে পারা।

বাগ্মিতাও একটি কলাবিদ্যা (art)। বাগ্মিতার প্রতি প্রবণতা না থাকলে এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করা যায় না সত্য, তবে প্রশিক্ষণের দ্বারা এই বিদ্যায় কিছু পরিমাণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। সেইজন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে বক্তৃতা দেওয়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ করা প্রভৃতির মাধ্যমে যাতে ছাত্রেরা বাগ্মিতা-শক্তি অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাগ্মিতার দক্ষতা অর্জন করতে পারলে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে, তাদের মধ্যে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা দেখা দেবে এবং তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটবে।

(গ) **বিতর্ক** (Debates)—অকাট্য যুক্তির সাহায্যে কোন প্রস্তাবের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করা এবং বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তি খণ্ডন ক'রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করাকে **বিতর্ক** বলে। বিতর্কে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার ক্ষমতা, নিজমতের দ্বারা অন্যদের প্রভাবিত করা প্রভৃতি ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। অন্যান্য কলাবিদ্যার মত বিতর্কের দক্ষতা অর্জন করার জন্যও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে মাঝে মাঝেই বিতর্কের আয়োজন করতে হবে। বিতর্কের আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করার সময় ছাত্রদের বয়স এবং তাদের জ্ঞানের পরিধির কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

(ঘ) **আলোচনা** (Discussions)—কোন একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর মত-বিনিময় করাকে আলোচনা বলা হয়। আলোচনার জন্য একটি বিষয়বস্তুর (topic) প্রয়োজন হয়। এই বিষয়বস্তু নানা-রকমের হতে পারে ; যেমন-সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, ধর্ম-সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, দেশপ্রেম-সমাজসেবা মানব-কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু প্রভৃতি। আলোচনা দুরকমের হতে পারে—(১) কোন-ক্ষেত্রে সমবেত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, আবার (২) কোনক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আর অন্যান্যরা শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা উচিত। আলোচনার বিষয়বস্তু আগে থেকেই ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা আরও স্বচ্ছ ও ব্যাপক হবে, তাদের চিন্তাশক্তি ও ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের জানবার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

॥ ব্যাকরণ শিক্ষাদানের পদ্ধতি ॥

২॥ বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তি-সহকারে ব্যক্ত করুন। [C. U. B. Ed. 1977.]

উত্তর: ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষাবিদদের মধ্যে নানারকম পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রচলিত ছিল। কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করতেন যে ব্যাকরণের নিয়মকানুন না শিখলে মৌখিক ও লিখিতভাবে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এইসব প্রাচীন পন্থী শিক্ষাবিদেরা ব্যাকরণ-শিক্ষা ও ভাষা-শিক্ষাকে একেবারে অভিন্ন বলে মনে করতেন। এমন কি তাঁরা ব্যাকরন-শিক্ষার উপর ক্রমশঃ এত বেশি পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করতে আরম্ভ করেন যে, একসময় তাঁরা ব্যাকরণ-শিক্ষাকেই ভাষাশিক্ষার চরম লক্ষ্য ব'লে ঘোষণা করলেন। এই মত অনুযায়ী ভাষাশিক্ষার জন্য যে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি (traditional method) সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মৌখিক ও লিখিতভাবে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের উপায় হিসাবে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন মুখস্থ করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

ব্যাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় উপরি উক্ত মতবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে কোন কোন শিক্ষাবিদ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। এইসব শিক্ষাবিদেরা বললেন যে ভাষাশিক্ষার জন্য ব্যাকরণ শেখার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা এই যুক্তি দেখালেন যে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন জানা সত্ত্বেও ছাত্রেরা ভাষা ব্যবহার করার সময় প্রায়ই খুব সাধারণ ভুল ক'রে থাকে। ছাত্রদের যদি ভালভাবে শুদ্ধ বাক্য ব্যবহারের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে তাদের এই জাতীয় ভুল করতে দেখা যায় না। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে ভাষাশিক্ষার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না।

ব্যাকরণ শিক্ষার বিরোধিতা

ব্যাকরণ-শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুটি মতই চরম-ভাবাপন্ন। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এই দুটি মতের কোনটিকেই গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে ব্যাকরণ পাঠের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা ভুল। কোন ভাষা এলোমেলোভাবে শেখা যায় না। ভাষা শিক্ষার জন্য একটি সুপরিকল্পিত পথ থাকা উচিত। ব্যাকরণই আমাদের এই সুপরিকল্পিত পথ প্রদর্শন করে। ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে লিখনে এবং কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ

ব্যাকরণের সংজ্ঞা

বলে।” অতএব ব্যাকরণের জ্ঞান যে ছাত্রদের সুপরিকল্পিতভাবে এবং সময়ের অপচয় না ক'রে ভাষা শিখতে সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে আমাদের মন হল চিন্তন, যুক্তি, বিচার, স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শক্তির সমষ্টি এবং অনুশীলনের সাহায্যে এই শক্তিগুলির উন্নতিসাধন করা যায়। এই ধারণা অনুযায়ী প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার মানসিক শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হত। তখন শিক্ষাবিদেরা মনে করতেন যে ব্যাকরণের চর্চা করলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়। সেইজন্য তাঁরা ভাষা-শিক্ষার নামে ব্যাকরণ-শিক্ষার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে প্রাচীন শিক্ষাবিদদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এখন স্মৃতি-শক্তির উন্নতির জন্য ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখানো হয় না; ভাষাশিক্ষার সহায়ক-রূপেই আধুনিক যুগে ব্যাকরণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থানলাভ করেছে।

প্রাচীন মনো-বিজ্ঞানীদের ভ্রান্ত ধারণা

এখন বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কতখানি সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্যও ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাবার সময় আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শিখলেই ছাত্রেরা শুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। তারজন্য প্রয়োজন বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে শুদ্ধ বাংলা বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা সৃষ্টি করা—তা না ক'রে যদি আমরা কেবল ছাত্রদের ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন-সংজ্ঞা ইত্যাদি শেখাই তাহলে ছাত্রেরা কেবল ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনই শিখবে, বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার শিখবে না। কাজেই বাংলা ভাষা শিক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে নয়, বাংলা ভাষাশিক্ষার সহায়ক হিসাবেই ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞান বাংলা ভাষাশিক্ষা ও বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাত্রদের সাহায্য করতে পারে :—

(১) **ব্যাকরণের জ্ঞান লেখায় ও কথাবার্তায় শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে ছাত্রদের সাহায্য করে।** অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও লিখিত রূপ ও মৌখিক রূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ ক'রে ছাত্রদের রচনায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কথ্যভাষা ও সাধুভাষার যে মিশ্রণ প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের সাহায্যে ছাত্রেরা খুব সহজেই তা সংশোধন ক'রে নিতে পারে। অনেক সময় ছাত্রদের কথাবার্তার মধ্যেও নানাবিধ ভাষাগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাহায্যে সেইসব ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা যায়।

(২) ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন জানা থাকলে ছাত্রদের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রেরা দুভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে—মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে। কথ্যভাষায় ছাত্রেরা যেসব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে তার সঙ্গে লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের অনেক পার্থক্য থাকে; যেমন কথ্য-ভাষায় অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু লিখিত ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি। আবার কথ্যভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল বাক্য ব্যবহৃত হয়, অথচ লিখিত ভাষায় সরল, জটিল ও যৌগিক সবরকম বাক্যই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ব্যাকরণ চর্চার মাধ্যমেই কেবল ছাত্রদের লিখিত ভাষায় উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়া ব্যাকরণের বই থেকে ছাত্রেরা বাগ্ধারা, প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহারের রীতিগুলি আয়ত্ত করে তাদের বাংলা ভাষার রচনা-রীতিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

(৩) ব্যাকরণের চর্চা করলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ছাত্রেরা তাদের কথাবার্তায় এবং লেখায় যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যদি তাদের কোন ধারণা না থাকে তাহলে তারা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ব্যাকরণ-চর্চার মাধ্যমে যদি ছাত্রেরা বাংলা ভাষার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে তাহলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে এবং ভাষাগত সচেতনতা (language consciousness) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মবিশ্বাসও ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

(৪) বাংলা ভাষায় লব্ধ ব্যাকরণের জ্ঞান ছাত্রদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করে। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষার চর্চাও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের বাংলা ভাষার উপর দখল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বাংলা-ব্যাকরণ থেকে ছাত্রেরা বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যেসব নিয়ম-কানুন শেখে সেগুলির সাহায্যে ইংরাজী কিংবা অন্য কোন ভাষার অন্তর্গত বাক্যের গঠনভঙ্গী সম্পর্কে তারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে। আবার ইংরাজী কিংবা অন্য কোন ভাষার চর্চা করতে করতে ঐ ভাষার শব্দ ভাণ্ডার কিংবা ঐ ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের গঠনভঙ্গীর দ্বারা বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গীও অনেক সময় প্রভাবিত হয় এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন ভাব প্রকাশ করতে সুবিধা হয়।

৩ ।। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাকরণের জ্ঞান সঠিকভাবে সৃষ্টি করার জন্য আপনি যে পদ্ধতিকে সর্বাধিক উপযোগী বলে মনে করেন তার সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করুন। [C.U. B.Ed. 1980]

উত্তর ঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাবার জন্য বহুদিন যাবৎ যে পদ্ধতিটি

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল তার নাম **অবরোহী পদ্ধতি** (Deductive Method)। এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য অবরোহনের নীতি (Principle of deduction) প্রয়োগ করা হয়। এই নীতির মূল কথা হল সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া ; যেমন 'মানুষ মরণশীল'—এটি একটি সাধারণ সত্য। এই সত্য থেকে আমরা 'রাম একজন মানুষ, অতএব সে মরণশীল' এই বিশেষ সত্যে উপনীত হতে পারি। অবরোহী পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষাদান করার সময় 'সূত্র'কে সাধারণ সত্য, আর 'উদাহরণ'কে বিশেষ সত্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ছাত্রদের সামনে ব্যাকরণের কোন সূত্রকে উপস্থিত করা হয়, তার পর উদাহরণের সাহায্যে কিভাবে ঐ সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে ছাত্রদের তা দেখানো হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রদের অন্ধভাবে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে হয় এবং সেইজন্য তারা এই সূত্রগুলির ব্যবহারিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। অবরোহী পদ্ধতিতে ছাত্রেরা বিভিন্ন উদাহরণ পরীক্ষা ক'রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ পায় না। একটি বিশেষ ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই পদ্ধতিটি গ'ড়ে উঠেছে। এই ধারণাটি হল এই যে, ছাত্রেরা যদি ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করতে পারে তাহলে তারা নির্ভুলভাবে বাংলা ভাষা বলতে ও লিখতে সক্ষম হবে। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের আগে থেকে ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ব্যাকরণের পাঠ্যসূচীতে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবরোহী পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়। কারণ এই পদ্ধতি ছাত্রদের মুখস্থ বিদ্যার উপর খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। তাছাড়া এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয় এবং ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ বোধ করে না। সেইজন্য এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ-রূপে অমনোবৈজ্ঞানিক। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ব্যাকরণ-পাঠ নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অবরোহী পদ্ধতির আরও অসুবিধা হল এই যে, এখানে শিক্ষক বিমূর্ত (abstract) বিষয় থেকে মূর্ত (concrete) বিষয়ের দিকে অগ্রসর হন ; কিন্তু ছাত্রেরা বিমূর্ত বিষয়ে যাবার আগে মূর্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য অবরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে ছাত্রদের উদ্যোগকে খর্ব করা হয় এবং শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রেরা তাদের নিজেদের চিন্তা-শক্তি ও বিচার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার কোন সুযোগ পায় না।

অবরোহী পদ্ধতির এইসব ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বিবেচনা করে বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে **অবরোহী পদ্ধতি** (Inductive Methcd) বলে। তর্কশাস্ত্রে বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়াকে আরোহণ প্রক্রিয়া বলা হয়। আরোহী পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হলে, প্রথমে পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণের কোন নিয়ম রূপায়িত হয়েছে এমন কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে। তারপর ঐ উদাহরণগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে,

সেগুলি সম্পর্কে ছাত্রদের এমনভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে ঐ উদাহরণগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে নিয়মটি রূপায়িত হয়েছে ছাত্রেরা সে সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তারপর ঐ তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে ছাত্রেরা নিজেরাই ব্যাকরণের অভীষ্ট নিয়মটি গঠন করতে সক্ষম হবে। অবরোহী পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপর ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম-কানুনগুলি তারা নিজেরাই তৈরী করে ব'লে, এগুলি তাদের অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হয় না, অথচ এই নিয়ম-কানুনগুলি তারা বেশ ভালভাঃবই আয়ত্ত করতে পারে। এইজন্য ছাত্রদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞান সঠিকভাবে সৃষ্টি করার জন্য আরোহী পদ্ধতিকে আমি সর্বাধিক উপযোগী ব'লে মনে করি। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতির উপযোগিতার অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে সেগুলি হল—(১) এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রেরা ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হলে তবেই তাদের ব্যাকরণ শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। (২) এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ক'রে ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এরজন্য বিশেষধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় যাতে ছাত্রদের ব্যাকরণের যেসব নিয়ম-কানুন শেখাতে হবে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। (৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষা-দানের মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলি, যেমন—জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, সরল বিষয় থেকে জটিল বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় ব'লে এই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আখ্যা দেওয়া হয়। (৪) এই পদ্ধতি ছাত্রদে. ।িন্তাশক্তি ও বিচার শক্তিকে উজ্জীবিত করে। এখানে ছাত্রেরা নিজেরাই ব্যাকরণের সূত্র উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে বলে কখনই নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয় না। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে। (৫) এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বারা ব্যাকরণ পাঠের একঘেয়েমী অনেক পরিমাণে দূর হয়।

তবে আরোহী পদ্ধতির একটিমাত্র অসুবিধা হল এই যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় অযথা সময়ের অপচয় যাতে না ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময়ের অপচয় বন্ধ করা এবং ব্যাকরণ শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :—

(ক) কথাবলা ও বইপড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা যে পরিমাণ ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করেছে তার চেয়ে অগ্রিমভাবে তাদের ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শেখানো চলবে না।

(খ) পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখানো চলবে না। প্রথমদিকে ছাত্রদের **তত্ত্বমূলক ব্যাকরণ** (Theoretical Grammar) না শিখিয়ে বাংলা ভাষাকে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণের যেটুকু নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন

কেবল সেইটুকু ব্যাকরণের জ্ঞান দেবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ শিক্ষার সূচনায় তত্ত্বমূলক ব্যাকরণের পরিবর্তে ছাত্রদের **ব্যবহারিক ব্যাকরণ** (Functional Grammar) শেখাবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(গ) ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন শেখাবার সময় আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে, আর নিয়ম-কানুনগুলি শেখা হয়ে গেলে ছাত্রেরা যখন সেগুলি নতুন কোন পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে চাইবে তখন তারা অবরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবে।

(ঘ) বাংলা ব্যাকরণের সেই সমস্ত বিষয় ছাত্রদের পড়াতে হবে যেগুলি আয়ত্ত করলে ছাত্রদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ঙ) পরিশেষে, ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাবার সময় একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সেটা হল, ব্যাকরণের যে-কোন জিনিসই ছাত্রদের শেখানো হোক না কেন তা যেন সম্যক্‌রূপে (thoroughly) শেখানো হয়। ছাত্রেরা যে ব্যাকরণকে অপছন্দ করে তার একটা বড় কারণ হল তারা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারে না। যদি আমরা ছাত্রদের আগ্রহ, কৌতূহল ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে তাদের বাংলা ব্যাকরণ শেখাতে পারি তাহলে তারা ব্যাকরণ শিখতে আনন্দবোধ করবে এবং সঠিকভাবে ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।[1]

॥ রচনা শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি ॥

৪।। বাংলা রচনা শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1978]

উত্তর : ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল তারা যাতে মৌখিক ও লিখিতভাবে তাদের মনোভাব, চিন্তাধারা ও মতামত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে তার জন্য তাদের সক্ষম ক'রে তোলা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ছাত্রদের রচনা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। রচনা শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের মৌখিক ও লিখিতভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। অতি শৈশবকাল থেকেই শিশুর রচনা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। শিশু যখন ভাঙা

রচনা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

১। '...What is done should be done thoroughly. A great deal of the dislike that pupils have for grammar lies just here. They do not understand it. They do not understand it because they have not been taught it thoroughly and when we do not understand a subject we begin to dislike it. It is far better to do a small amount of grammar and do it thoroughly than to cover a large field...If grammar is taught thoroughly the children will enjoy it, especially if the inductive method is used. Also they will have a firm foundation for advanced work."

—W. M. Ryburn

ভাঙা বাক্য ব্যবহার ক'রে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে তখনই তার জীবনে রচনা-শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছে ব'লে ধ'রে নিতে হবে। বিদ্যালয়ে ভাষা-শিক্ষকের কাজ হল শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। এই বিকাশ যাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটানো যায় তার জন্য রচনা শিক্ষা-দানের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমে বাংলা রচনা শিক্ষাদানের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। ছাত্রদের বাংলা রচনা শেখাবার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন **প্রথমতঃ**, ছাত্রদের প্রথমে মৌখিক রচনা শেখাতে হবে ; তারপর তারা রচনা-লেখা অভ্যাস করবে। ছাত্রেরা যদি মৌখিক রচনা ভালভাবে শিখতে পারে তাহলে লিখিত রচনার ক্ষমতাও তারা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারবে। কারণ F. L. Billows-এর মতে "Good writing follows from correct speaking."—অর্থাৎ **নিভু'লভাবে কথা বলার দক্ষতা থেকেই ভাল লেখার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ**, মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার ভাষাগতভাবে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রথমে ছাত্রেরা কোন একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে মৌখিকভাবে ঐ বিষয় সম্পর্কে কিছু বাক্য রচনা করবে। পরে যখন শিক্ষক ছাত্রদের লিখিত রচনা শেখাবেন তখন তিনি পূর্বেকার মৌখিক রচনার বিষয়-বস্তুটি সম্পর্কে ছাত্রদের কিছু লিখতে বলবেন এবং তারা যাতে মৌখিক রচনায় ব্যবহৃত ভাষাকে লিখিত রচনায় কাজে লাগাতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। **তৃতীয়তঃ**, ছাত্রদের রচনা শেখাবার সময় গল্প ও ছবি ব্যবহার করতে হবে। গল্প ও ছবির প্রতি ছাত্রদের একটি জন্মগত তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। শৈশবকাল থেকেই ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে এবং ছবি দেখতে ভালবাসে। রচনা শেখাবার সময় গল্প ও ছবির প্রতি ছাত্রদের এই আকর্ষণকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে তাদের রচনা শেখার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। **চতুর্থতঃ**, শিক্ষাদানের মূলনীতিগুলি অনুসরণ ক'রে ছাত্রদের রচনা শেখাতে হবে। এই নীতিগুলি হল, সরল থেকে জটিল বিষয়ে যাওয়ার নীতি, জানা থেকে অজানায় যাওয়ার নীতি, মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি প্রভৃতি। রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির যখন যেটি প্রয়োগ করা দরকার শিক্ষককে তখন সেটি প্রয়োগ করতে হবে। **পঞ্চমতঃ**, ছাত্রদের রচনা লেখার নিয়ম শেখানো অপেক্ষা তারা যাতে অনুশীলনের মাধ্যমে রচনা লেখার অভ্যাস গঠন করতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। **ষষ্ঠতঃ**, ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটাবার জন্য বাংলা ভাষার বিশিষ্ট রীতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে হবে। বাংলা ভাষার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে ; যেমন—দিয়ে দেওয়া, করে' ফেলা, নিয়ে নেওয়া প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ; ফল-টল, বোকা-সোকা, গাছ-টাছ প্রভৃতি শব্দ-দ্বিত্বের ব্যবহার ; মুখ করা, চোখ টেপা, কান পাতা প্রভৃতি শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ ; ইত্যাদি। বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যগুলি

আয়ত্ত ক'রে ছাত্রেরা যাতে রচনার একটি নিজস্ব রীতি (style) গ'ড়ে তুলতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে অপরের প্রকাশ-ভঙ্গী নকল করার প্রবণতা দেখা দিলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। **সপ্তমতঃ,** ছাত্রদের রচনা-রীতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা পড়তে উৎসাহ দিতে হবে। **অষ্টমতঃ,** ছাত্রদের মধ্যে যে জন্মগত আত্মপ্রকাশের তাগিদ রয়েছে তাকে স্বাভাবিক পথে বিকাশ লাভ করার সুযোগ দিতে হবে এবং রচনাকে যাতে ছাত্রেরা নিজেদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

বাংলা রচনা শিক্ষাদানের উপরিউক্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি ক'রে রচনা-শিক্ষার যে আধুনিক পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের রচনা-শিক্ষা-দানের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে তাদের মৌখিক ও লিখিত রচনা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে—(১) প্রারম্ভিক পর্যায় (Initial stage); (২) মধ্যবর্তী পর্যায় (Middle stage); (৩) উচ্চ পর্যায় (High stage)।

১। প্রারম্ভিক পর্যায়ের রচনা-শিক্ষাদান পদ্ধতি :—

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে লিখিত রচনা অপেক্ষা মৌখিক রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। মৌখিক রচনা দুপ্রকারের হতে পারে—নিয়ন্ত্রিত (controlled) মৌখিক রচনা এবং স্বাধীন (free) মৌখিক রচনা। নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা প্রধানতঃ শিক্ষকের ব্যবহৃত ভাষা কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষার পুনরাবৃত্তি করে; আর স্বাধীন মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের ভাষায় তাদের বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করে। এই স্তরের প্রথমদিকে ছাত্রেরা নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনা অভ্যাস করবে। আর এই স্তরের শেষদিকে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে মৌখিক রচনার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। নিয়ন্ত্রিত মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে ছাত্রদের কিছু নির্বাচিত বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ বাক্যই হল মৌখিক রচনার একক (unit)। এই বাক্যগুলির গঠন সহজ থেকে শুরু করে ক্রমশঃ জটিল আকারের হবে। মৌখিক রচনার সুবিধা হল এই যে এখানে ছাত্রদের ব্যবহৃত ভাষার ভুলগুলি খুব সহজে সংশোধন করে দেওয়া যায়।

মৌখিক রচনা

প্রারম্ভিক পর্যায়ের প্রথমদিকে লিখিত রচনা শেখাবার জন্য কোন বস্তু কিংবা ছবি সম্পর্কে ছাত্রদের কতকগুলি বাক্য লিখতে বলা যেতে পারে। শিক্ষক ক্রমশঃ ছাত্রদের এইরূপ বাক্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলবেন। এই স্তরের শেষদিকে শিক্ষক ছাত্রদের কোন ছবির দৃশ্য কিংবা কোন ঘটনা বাংলা ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে বলতে পারেন। এই স্তরে মৌখিক রচনার সঙ্গে লিখিত রচনার একটা ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে ছাত্রদের পক্ষে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার কাজ অনেক সহজ হবে। কারণ মৌখিক রচনায় ব্যবহৃত বাক্যগুলি ছাত্রেরা লিখিত রচনায় ব্যবহার করতে পারবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছাত্রদের লিখিত রচনা শেখানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে—(১) লিখিত রচনায় যে সব কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্রদের সেই শব্দগুলির বানান শেখাতে হবে; (২) লিখিত রচনায় যে সব বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (phrase) ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্রদের সেগুলি শেখাতে হবে; (৩) লিখিত রচনায় বাক্যের পদবিন্যাস সংক্রান্ত যে সব ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করতে হবে। এই স্তরের ছাত্রদের প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত লিখিত রচনার অনুশীলন করাতে হবে; যেমন—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক ছাত্রদের একটি ছবি দেখিয়ে প্রথমে ছবিটির শিরোনাম (title) জিজ্ঞাসা করবেন, তারপর সেটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন। এরপর তিনি ছাত্রদের এমন কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যেগুলির উত্তর পরপর সাজিয়ে দিলে একটি রচনার আকার ধারণ করে। এই উত্তরগুলির মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন একটু কঠিন সেগুলি তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন। তারপর ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের রচনাটি লিখতে বলবেন।

লিখিত রচনা

২। মধ্যবর্তী পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি :—

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে মৌখিক রচনা অপেক্ষা লিখিত রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে মৌখিক রচনার সাহায্যে ছাত্রেরা যাতে লিখিত রচনার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। এই স্তরে মৌখিক রচনার মাধ্যমে ছাত্রেরা যাতে অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তারজন্য বিশেষ যত্ন-সহকারে পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই পরিকল্পনায় তিনটি স্তর থাকবে—(ক) **অপরিবর্তিত পুনরাবৃত্তি** (direct reproduction)—এক্ষেত্রে ছাত্রেরা শিক্ষকের কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কোনরূপ পরিবর্তন না ক'রে ব্যবহার করবে; (খ) **পরিবর্তিত পুনরাবৃত্তি** (modified reproduction)—এক্ষেত্রে ছাত্রেরা শিক্ষকের কিংবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কিছুটা পরিবর্তন ক'রে ব্যবহার করবে; যেমন—ছাত্রেরা বাক্যের পুরুষ, রচনা, কাল প্রভৃতি কিংবা ঘটনার ক্রম পরিবর্তন করতে পারে; এবং (গ) **স্বাধীন পুনরাবৃত্তি** (free reproduction)—এক্ষেত্রে ছাত্রেরা নিজেদের ভাষায় কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করবে; যেমন সঙ্কেত-শব্দ (Key word) অবলম্বন করে ছাত্রেরা পূর্বে পড়েছে এমন কোন গল্প বলতে পারে; গল্পটিতে তারা নিজেরা কিছু যোগ করতে পারে; বইয়ে পড়া কোন অভিজ্ঞতার অনুরূপ নিজের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে ইত্যাদি।

মৌখিক রচনা

এই স্তরে ছাত্রেরা যাতে লিখিত রচনার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে নিজেদের বক্তব্য

প্রকাশ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। লিখিত রচনার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। এরজন্য ধাপে ধাপে ছাত্রদের প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্রদের স্বাধীন রচনা লিখতে দেওয়ার আগে **সরল প্রতিলিপিকরণ** (simple transcription), **পরিবর্তিত প্রতিলিপিকরণ** (modified transcription) এবং **শ্রুতিলিখন** (dictation)—এই তিন রকমের অনুশীলনীর সাহায্যে তাদের প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে। সরল প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে ছাত্রেরা বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার, শব্দের বানান ও ভাষার বিভিন্নরকমের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। পরিবর্তিত প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে ছাত্রেরা কোন বাক্যের পুরুষ, বচন ও কালের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যটিকে নতুনভাবে লিখতে শিখবে। শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে ছাত্রেরা শব্দের বানান, লেখার দ্রুততা, বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করবে। এরপর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে—(ক) ব্ল্যাকবোর্ডের উপর একটি শিরোনাম (heading) কিংবা কতকগুলি সঙ্কেত-শব্দ (key word) লিখে ছাত্রদের ঐ শিরোনাম কিংবা সঙ্কেত-শব্দ অবলম্বনে সংক্ষেপে কিছু লিখতে দেওয়া যেতে পারে ; (খ) রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাবার জন্য ছাত্রদের কোন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করতে শেখাতে হবে এবং নিজের চিন্তাধারাকে উপযুক্ত শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে যাতে তারা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে তারজন্য তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে ; (গ) লিখিত রচনায় পদবিন্যাস, অনুচ্ছেদ, বাক্যের গঠন, বক্তব্যের ধারাবাহিকতা প্রভৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে ; (ঘ) ছাত্রদের সক্রিয় শব্দভাণ্ডার (active vocabulary) বৃদ্ধি করতে হবে, অর্থাৎ যে শব্দগুলি তারা স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারে সেগুলির সংখ্যা বাড়াতে হবে ; (ঙ) ছাত্রেরা যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীন রচনা লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে।

লিখিত রচনা

৩। **উচ্চ পর্যায়ে রচনা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ**—নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরে লিখিত রচনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও মৌখিক রচনাকে একেবারে বর্জন করা চলবে না। কারণ ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি সাধনের জন্য এই স্তরেও মৌখিক রচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীগুলিতে মৌখিক রচনার জন্য যেসব বিষয় নির্বাচন করতে হবে সেগুলির মধ্যে থাকবে, চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা, পরিচিত দৃশ্যের বর্ণনা, ছাত্রদের পরিচিত কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, ছাত্রদের সৃজনমূলক কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এমন কোন বিষয় (যেমন—তোমার বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিন, একটি নদীর আত্মকথা, একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা ইত্যাদি) প্রভৃতি। মৌখিক

মৌখিক রচনা

রচনার মাধ্যমে এইসব বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের চিন্তাধারা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করবে এবং লিখিত রচনায় ছাত্রদের যেসব বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং রচনা-ভঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে মৌখিক রচনায় ছাত্রেরা সে সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা লাভ করতে পারবে।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের লিখিত রচনা শেখানোর উদ্দেশ্য হল তারা যাতে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে তারজন্য তাদের প্রস্তুত করা। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগেই যাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় শিক্ষককে বিশেষভাবে তার চেষ্টা করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন লিখিত রচনার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলি অবলম্বন করতে হবে—(ক) প্রথমে শিক্ষক ছাত্রেরা কিভাবে রচনাটি লিখবে তার পরিকল্পনা রচনা করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি তাদের উপযুক্ত শব্দগুচ্ছ সরবরাহ করবেন এবং ছাত্রেরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে তিনি তার সমাধান ক'রে দেবেন; (খ) বিষয়বস্তু নির্বাচন করার ব্যাপারে ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে বিষয়বস্তুগুলি যেন ছাত্রদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় সেদিকে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে; (গ) রচনা লেখার সময় ছাত্রেরা তাদের নিজেদের প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করবে। ছাত্রেরা যেন তাদের বক্তব্য সাবলীলভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে এবং তাদের রচনার যেন একটি **সূচনা, মধ্যভাগ ও পরিসমাপ্তি** থাকে শিক্ষককে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; (ঘ) বিবরণমূলক (narrative), বর্ণনামূলক (descriptive), নাটকীয় (dramatic) এবং চিন্তামূলক (reflective) —এই চার প্রকার রচনা লেখার ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে ছাত্রদের অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে; (ঙ) ছাত্রেরা যাতে তাদের রচনাকে কতকগুলি অনুচ্ছেদে (paragraph) ভাগ ক'রে লিখতে পারে এবং বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারে তারজন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বিরাম-চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কেও ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে; (চ) ছাত্রেরা উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করার পর স্বাধীনভাবে রচনা লেখার চর্চা আরম্ভ করবে এবং শিক্ষকও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাহায্যের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়ে আনবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে; তা হল, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের পূর্বে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে রচনা লিখতে দিলে তার দ্বারা তারা বিশেষ লাভবান হতে পারবে না।

লিখিত রচনা

৫।। শিক্ষার্থীদের স্বাধীন রচনা-শক্তি সৃজনে সারাংশ লিখন, ভাব সম্প্রসারণ ও পত্র-লিখন দক্ষতাসমূহের অনুশীলন কিভাবে সহায়ক হতে পারে তার সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। [C. U. B. Ed.1980]

উত্তর ঃ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাতৃভাষা শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ সাধন করা। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সূচনাকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত রচনার (controlled composition) মাধ্যমে ধীরে ধীরে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে। স্বাধীন রচনার ক্ষমতা অর্জনের জন্য ছাত্রদের দুটি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। এই দুটি বিষয় হল—

ভূমিকা

(১) সুস্পষ্টভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারা ; এবং

(২) মাতৃভাষার সাহায্যে সুস্পষ্ট, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে নিজের চিন্তাকে লিখে প্রকাশ করতে পারা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীগুলিতে গল্প-লেখা (story writing), অনুচ্ছেদ-রচনা (paragraph writing), পত্র-লিখন (letter-writing) প্রভৃতির সাহায্যে ধীরে ধীরে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। তারপর বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীগুলিতে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তির কিছুটা উন্নতি ঘটলে প্রবন্ধ রচনা (essay writing), সারাংশ লিখন (substance writing), ভাবসম্প্রসারণ (amplification) ও বিভিন্ন ধরনের পত্রলিখনের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে। এখন সারাংশ লিখন, ভাবসম্প্রসারণ ও পত্র-লিখনের সাহায্যে কিভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) **সারাংশ লিখন** (Substance Writing):—কোন গদ্যাংশ কিংবা কোন কবিতার সারাংশ হল ঐ গদ্যাংশ কিংবা কবিতাটি যে বক্তব্য কিংবা ভাবকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সার-সংক্ষেপের (précis) সঙ্গে সারাংশের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও সার-সংক্ষেপ ও সারাংশ এক জিনিস নয়। সারাংশের তুলনায় সার-সংক্ষেপের দৈর্ঘ্য অনেক কম। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সারাংশের দৈর্ঘ্য মূল রচনার এক-তৃতীয়াংশ। সার-সংক্ষেপের মত সারাংশের কোন শিরোনাম (title) থাকে না। এছাড়া সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সারাংশের প্রধান পার্থক্য হল সারাংশ সাহিত্যধর্মী রচনা হিসাবে বিবেচিত হয় ; কিন্তু সার-সংক্ষেপ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

সারাংশ লিখনের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানো যায়। কোন গদ্যাংশ কিংবা পদ্যাংশের সারাংশ লিখতে হলে ছাত্রদের ঐ গদ্যাংশ কিংবা পদ্যাংশটি দুবার কিংবা তিনবার ভালভাবে পড়তে হবে। তারপর শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই ছাত্রেরা ঐ রচনাংশের মূল বক্তব্যগুলি খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। কোন গদ্যাংশের সারাংশ রচনার চেয়ে কোন পদ্যাংশের সারাংশ ছাত্রদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ পদ্যাংশের ভাষার মধ্যে এবং বক্তব্যপ্রকাশের মধ্যে কিছুটা জটিলতা থাকে। সেইজন্য কেবল বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতেই ছাত্রদের পদ্যাংশের সারাংশ লিখতে দেওয়া উচিত। ছাত্রেরা পূর্বোক্ত রচনাংশের মূল বক্তব্যগুলি খাতায় লেখার পর সেগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে সেগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজিয়ে নেবে। এই মূল বক্তব্যগুলি সাজাবার সময় ছাত্রেরা স্বাধীন রচনা-শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ

পাবে। কারণ মূল রচনায় বক্তব্যের যে ক্রম রয়েছে ছাত্রেরা তার পরিবর্তন করে তাদের রচিত সারাংশটিকে আরও যুক্তিসম্মত (logical) এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent) ক'রে তুলতে পারে। এরপর ছাত্রেরা সমগ্র সারাংশটি যাতে সুসংবদ্ধ রচনায় পরিণত হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় ভাষার পরিমার্জনা করবে এবং বাক্যগুলির মধ্যে পারস্পারিক সংযোগ বজায় রাখার জন্য 'এবং' 'কিন্তু', 'তবু', 'সুতরাং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করবে। এইভাবে সারাংশ লিখনকে কেন্দ্র করে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিজেদের চিন্তাশক্তিকে প্রয়োগ ক'রে মূল রচনার প্রধান বক্তব্যগুলি নিয়ে যথাসম্ভব নিজেদের ভাষায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত রচনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটবে।

(খ) **ভাব সম্প্রসারণ (Amplification)**ঃ—ভাব সম্প্রসারণের অর্থ হল কোন ভাব কিংবা গূঢ়-অর্থ সম্বলিত বাক্যকে এমনভাবে বিস্তৃত করা যাতে তার অর্থ ভালভাবে পরিস্ফুট হয়। কোন প্রবাদবাক্য কিংবা কোন কবির কবিতার বিখ্যাত লাইন সাধারণতঃ ভাবসম্প্রসারণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ লাইনের মধ্যে মানব অভিজ্ঞতার ঘনীভূত প্রজ্ঞা নিহিত থাকে। ভাবসম্প্রসারণের জন্য নির্বাচিত বাক্যের মধ্যে ভাবটি গুপ্তভাবে থাকে—ছাত্রদের সেই ভাবটিকে পরিস্ফুট করতে হয়।

সাধারণতঃ একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই কোন বাক্যের ভাবসম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তবে কখনও কখনও কিছুটা দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে। কোন বাক্যের ভাবসম্প্রসারণ করতে হলে প্রথমে একটি অনুচ্ছেদে আলোচ্য বাক্যটির বাচ্যার্থ সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। তারপর পরের অনুচ্ছেদে বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট করতে হবে। ভাবসম্প্রসারণের দৈর্ঘ্য প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হবে। ভাবসম্প্রসারণের সৌন্দর্য যেসব বক্তব্যের সাহায্যে ভাবসম্প্রসারণ করা হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ততা ও প্রাসঙ্গিকতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

ভাবসম্প্রসারণের মাধ্যমেও ছাত্রদের স্বাধীন রচনা রক্তির বিকাশ ঘটানো যায়। কোন বাক্যের ভাবসম্প্রসারণ করতে হলে ছাত্রদের বাক্যটিকে দু'তিনবার প'ড়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। যদি কোন কারণে বাক্যটির অর্থ বুঝতে ভুল হয় তাহলে ভাবসম্প্রসারণটিও ভুল হবে। ভাবসম্প্রসারণ সারাংশের বিপরীত ধরনের রচনা। কারণ সারাংশে যেখানে মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়, ভাবসম্প্রসারণে সেখানে মূল বক্তব্যকে বিশদভাবে দৃষ্টান্তসহকারে আলোচনা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। সারাংশের তুলনায় ভাবসম্প্রসারণে ছাত্রদের স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ সারাংশের ক্ষেত্রে ছাত্রদের মূল রচনার বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে হয়। কিন্তু ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভাবসম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ একবার ধরতে পারলে ছাত্রেরা ভাবের সম্প্রসারণ ঘটাবার সময় স্বাধীনভাবে নিজেদের বক্তব্য বলার অনেকখানি সুযোগ পায়। তবে ছাত্রদের বক্তব্য যাতে প্রাসঙ্গিকতাকে ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য ছাত্রেরা প্রথমে

বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ (literal meaning) একটি অনুচ্ছেদে লিখবে ; তারপর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ও প্রমাণের সাহায্যে বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থটি বিশদভাবে আলোচনা করবে। ভাবসম্প্রসারণ রচনার অভ্যাস করলে ছাত্রদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে দক্ষতার সৃষ্টি হবে। এই দুটি বিষয় হল—(১) কোন একটি গূঢ়ার্থ-সম্বলিত বাক্যের অর্থকে বুঝে' দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ও ব্যাখ্যার সাহায্যে তা বিশদভাবে আলোচনা করা এবং (২) বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঐ আলোচনাকে লিখিতভাবে প্রকাশ করা। স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশের জন্যও প্রয়োজন কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা এবং ভাষার মাধ্যমে লিখিতভাবে ঐ চিন্তাকে রূপদান করার ক্ষমতা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভাবসম্প্রসারণের চর্চার মাধ্যমে এ দুটি কাজ ভালভাবেই হতে পারে। এরজন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি কিছুটা লক্ষ্য রাখতে হবে :—

(১) কোন ভাবকে সম্প্রসারিত ক'রে যে রচনাটি লেখা হয়েছে সেটি যেন একটি পূর্ণাঙ্গ রচনায় পরিণত হয় এবং সমস্ত ব্যক্তব্যটি যেন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

(২) ভাবসম্প্রসারণের জন্য নির্বাচিত বাক্যটি যেন ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি ও গ্রহণক্ষমতার উপযোগী হয়।

(৩) ছাত্রেরা যেন ছোট ছোট এবং অর্থবহ বাক্য ব্যবহার করে ; পুনরাবৃত্তি পরিহার করে এবং সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিরই অবতারণা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) ভাবসম্প্রসারণের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। কিন্তু এর দৈর্ঘ্য এক পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয় (৮০ থেকে ১০০ শব্দের মধ্যে)।

(৫) ভাবসম্প্রসারণ অনুশীলন করার ফলে ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান ও ভাষাব্যবহারের দক্ষতা যাতে বাড়ে এবং তাদের ভাষা যাতে সাহিত্যধর্মী হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) ছাত্রেরা যাতে বানান, ব্যাকরণ ও যতিস্থাপন সংক্রান্ত ভুলগুলি পরিহার করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(গ) পত্র-লিখন (Letter Writing) :—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তিকে পত্র লেখার প্রয়োজন হয়। ছাত্রদেরও বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন, বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে চিঠি লিখতে হয়। যখন আমরা কাউকে চিঠি লিখি তখন ঐ ব্যক্তি আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে। সেইজন্য চিঠি লেখার সময় যাকে চিঠি লেখা হয় তার কথা আমাদের সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন এবং চিঠিকে প্রাপকের কাছে চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলার জন্য ব্যক্তিগত চিঠিতে একটা কথোপকথনের মেজাজ সৃষ্টি করতে পারলে খুব ভাল হয়। F. L. Billows-এর মতে 'চিঠি হল ব্যক্তিগত কথোপকথনের একটা দিক—এর অপর দিকটি উহ্য রয়েছে।' ['A letter is one side of a dialogue, a private conversation of which half is missing or postponed.']।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ছাড়াও আরও অন্যরকমের চিঠিপত্র রয়েছে। চিঠিপত্রকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন—(১) ব্যক্তিগত চিঠিপত্র; (২) ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র; (৩) সামাজিক চিঠিপত্র; (৪) অফিস-সংক্রান্ত চিঠিপত্র; এবং (৫) বিবিধ চিঠিপত্র।

পত্র-লিখনের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগতপত্র রচনার ব্যাপারে ছাত্রেরা যথেষ্ট আগ্রহবোধ ক'রে থাকে। সেইজন্য ছাত্রদের স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটাতে ব্যক্তিগত পত্রকে বেশি পরিমাণে কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যান্য ধরনের পত্র যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিংবা অফিস-সংক্রান্ত চিঠি পত্রের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাঁধাধরা ছক অনুসরণ করতে হয় ব'লে সেখানে স্বাধীন রচনা-শক্তি বিকাশের সুযোগ খুব কম থাকে। সেইজন্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্র-রচনাকে কেন্দ্র ক'রে যাতে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও ভাষাব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি ঘটে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই জাতীয় চিঠিপত্রের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উপর ছাত্রদের চিঠিপত্র রচনার আগ্রহ এবং স্বাধীনভাবে পত্রলেখার ক্ষমতার উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, কোন খেলার বর্ণনা, কোন চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়কে আশ্রয় ক'রে ছাত্রদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে দিলে তাদের স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটানো অনেক সহজসাধ্য হবে।

৬॥ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাত্রদের কিভাবে শেখাবেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন:—

(ক) প্রবন্ধ রচনা (Essay Writing); (খ) সার-সংক্ষেপ (Précis), (গ) ছবির সাহায্যে রচনা (Picture-Composition)।

উত্তর: ॥ক॥ প্রবন্ধ রচনা (Essay Writing):—ছাত্রদের প্রবন্ধ রচনা শেখানোর উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে স্বাধীন রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটানো। প্রবন্ধ বলতে কিন্তু কোন বিষয়বস্তুর বর্ণনা বোঝায় না। প্রবন্ধ হল কোন বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত মতের অভিব্যক্তি ("an expression of one's personal views on a given subject")। বিভিন্ন লেখক কোন একটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেও লেখকদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে তাদের প্রত্যেকের প্রবন্ধের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। Richard Wilson-এর মতে প্রবন্ধ লেখার সময় লেখকের উদ্দেশ্য হল "পাঠকের মনে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করা এবং এরূপ ধারণার সঞ্চার করা যে কেবল কলমের দ্বারাই এ লেখা হয়নি—এ লেখার পিছনে একটি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রয়েছে" ("to create in the reader's mind a feeling of pleasure and the idea that there is not merely a pen but a living personality behind the writing.")। অবশ্য ছাত্রেরা সহজ আকারের কিছু কিছু রচনা লেখা অভ্যাস করার পরই কেবল ঐ ধরনের রচনা লেখার চেষ্টা করতে পারে।

প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন প্রকারের হতে পারে—(১) বিবরণমূলক (narrative); (২) বর্ণনাত্মক (descriptive); এবং (৩) চিন্তামূলক (reflective)।

১। **বিবরণমূলকপ্রবন্ধ (Narrative Composition)**:—তিন প্রকার প্রবন্ধের মধ্যে এই জাতীয় প্রবন্ধই সবচেয়ে সহজ। এখানে ছাত্রেরা তাদের জানা জিনিসের বিবরণ দেয়। প্রথম ও মধ্যবর্তী স্তরে এই জাতীয় রচনা বিশেষ উপযোগী। প্রথমদিকে ছাত্রেরা বইয়ে পড়া কোন গল্প কিংবা ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সহজ ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করতে পারে। উচ্চশ্রেণীতে ছাত্রেরা বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রবন্ধ রচনা করতে শিখবে।

২। **বর্ণনামূলক প্রবন্ধ (Descriptive Composition)**: বিবরণমূলক প্রবন্ধের চেয়ে এই জাতীয় প্রবন্ধ কিছুটা কঠিন। সেইজন্য ছাত্রেরা বিবরণমূলক প্রবন্ধ রচনায় কিছুটা অভ্যস্ত হওয়ার পর বর্ণনামূলক প্রবন্ধ রচনা শুরু করবে। এই জাতীয় রচনা লেখার জন্য ছাত্রকে বিভিন্ন বস্তু, স্থান, ঘটনা এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বর্ণনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হবে।

৩। **চিন্তামূলক প্রবন্ধ (Reflective Composition)**:—তিন প্রকার প্রবন্ধের মধ্যে এই জাতীয় প্রবন্ধ সবচেয়ে কঠিন ব'লে উচ্চ শ্রেণীতেই কেবল এই জাতীয় প্রবন্ধ শেখানো উচিত। 'সমাজসেবা', 'ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য' প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হলে লেখকের কিছু নিজস্ব চিন্তাশক্তি থাকা দরকার। সেইজন্য এই জাতীয় প্রবন্ধ ছাত্রদের চিন্তাশক্তি কিছুটা পরিণত হলে তবেই আরম্ভ করা যেতে পারে।

ছাত্রদের প্রবন্ধ-রচনা শেখাবার সময় শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা উচিত :—

(ক) সাধারণ ও বিমূর্ত বিষয়ের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ও মূর্ত বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া উচিত ; যেমন, 'খেলা' সম্পর্কে ছাত্রদের প্রবন্ধ না লিখতে দিয়ে, 'তোমার প্রিয় খেলা' এই সম্বন্ধে তাদের প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া উচিত।

(খ) ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া উচিত।

(গ) নিম্নশ্রেণীতে একই সঙ্গে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও ভাষা দুটিই যেন কঠিন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ঘ) প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়ার আগে শিক্ষক ছাত্রদের বাক্যগঠনের নিয়ম, অনুচ্ছেদ গঠনের নিয়ম এবং প্রবন্ধ রচনার নিয়মগুলি শেখাবেন।

(ঙ) প্রবন্ধের একটি সূচনা, একটা মধ্যভাগ ও একটি উপসংহার থাকবে।

প্রবন্ধ রচনা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক যে পাঠটীকা প্রস্তুত করবেন তাতে নিম্নলিখিত সোপানগুলি থাকবে :—

উদ্দেশ্য:—কোন একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন রচনা-লেখার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা।

প্রস্তুতি ঃ—(১) প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং অদ্যকার পাঠের সঙ্গে পূর্বজ্ঞানের সংযোগ স্থাপন ক'রে পাঠের প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা।

(২) উপযুক্ত ভূমিকাসহ পাঠ ঘোষণা।

উপস্থাপন ঃ—(ক) সমগ্র প্রবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে ছাত্রদের সহায়তায় সেগুলির একটি ক'রে উপ-শিরোনাম (sub-heading) দিতে হবে।

(খ) প্রত্যেকটি ভাগের উপর এমন কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে যাতে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত মূল বক্তব্যগুলি ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নেওয়া যায়।

(গ) উচ্চ শ্রেণীতে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত চাওয়া যেতে পারে।

অভিযোজন ঃ—(ক) প্রবন্ধের যে-কোন একটি ভাগকে নিয়ে ছাত্রদের একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে বলা হবে এবং শিক্ষক ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন।

(খ) শিক্ষক ছাত্রদের কাজ পরিদর্শন করবেন প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে দেবেন এবং ছাত্রদের রচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত দেবেন।

গৃহকাজ ঃ—শিক্ষক সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি ছাত্রদের বাড়ী থেকে লিখে আনতে বলবেন।

॥ খ ॥ **সার-সংক্ষেপ (Pre´cis) ঃ**—ছাত্রদের সার-সংক্ষেপ শেখানোর উদ্দেশ্য হল মূল রচনার প্রধান বক্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সুস্পষ্টভাবে পুনরায় লিপিবদ্ধ করতে সাহায্য করা। সার-সংক্ষেপ একটু কঠিন ধরনের রচনা; কারণ এতে লেখকের বিচার শক্তি ও ভাষা-সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য উচ্চশ্রেণীতেই কেবল ছাত্রদের এই জাতীয় রচনা লেখার অভ্যাস গঠন করা যেতে পারে।

নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের বাক্য-সংক্ষিপ্তকরণের বিভিন্ন উপায়; যেমন—শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে শব্দের ব্যবহার, বিশেষণাত্মক খণ্ডবাক্যের পরিবর্তে বিশেষণের ব্যবহার প্রভৃতি শেখাতে হবে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদেরকে প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত কোন অনুচ্ছেদ এবং পরে অপরিচিত অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ করতে দিতে হবে।

সার-সংক্ষেপ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক যে পাঠটীকা প্রস্তুত করবেন তাতে নিম্নলিখিত সোপানগুলি থাকবে ঃ—

উদ্দেশ্য ঃ—কোন অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ রচনা করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

প্রস্তুতি ঃ—(১) প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং অদ্যকার পাঠের প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করা।

(২) উপযুক্ত ভূমিকাসহ পাঠঘোষণা।

উপস্থাপন ঃ—(ক) অনুচ্ছেদটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতে হবে।

(খ) অনুচ্ছেদটির উপর এমন কতকগুলি প্রশ্ন রচনা করতে হবে যেগুলির সাহায্যে মূল বক্তব্যগুলি বের হয়ে আসে। ছাত্রেরা অনুচ্ছেদটি প'ড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে।

(গ) ছাত্রদের কঠিন শব্দের অর্থ বলে দিতে হবে।

(ঘ) ছাত্রদের কিছুক্ষণ (ধরা যাক্ দশ মিনিট) অনুচ্ছেদটি পড়তে দিতে হবে।

(ঙ) ছাত্রেরা সার-সংক্ষেপটির শিরোনাম নির্বাচন করবে।

(চ) ছাত্রদের-দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলি বোর্ডে পর পর লিখতে হবে। তারপর কিছুটা রদলবদল ক'রে সার-সংক্ষেপটি গঠিত হবে।

(ছ) ছাত্রেরা কয়েকবার সার-সংক্ষেপটি পড়বে।

অভিযোজন :—(ক) সার-সংক্ষেপটি মুছে ফেলে ছাত্রদের মন থেকে সেটি খাতায় লিখতে বলতে হবে।

(খ) শিক্ষক ছাত্রদের লেখার তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে দেবেন।

গৃহকাজ :—বাড়ী থেকে সার-সংক্ষেপ ক'রে আনার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের একটি নতুন অনুচ্ছেদ নির্বাচন ক'রে দেবেন।

॥ গ ॥ **ছবির সাহায্যে রচনা (Picture Composition)** :—নিম্নশ্রেণীতে ছবির সাহায্যে খুব ভালভাবে মৌখিক ও লিখিত রচনা শেখানো যেতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ছবির একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সেইজন্য একটি কিংবা একাধিক উপযুক্ত ছবির সাহায্যে যদি রচনা শেখানোর পরিকল্পনা করা যায় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হবে। ছবির সাহায্য গ্রহণ করলে পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কেও ছাত্রদের রচনা লেখানো যায়। সেইজন্য স্বাধীন রচনা শেখানোর ব্যাপারে ছবির বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে।

নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের মৌখিক রচনা শেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঠ্যপুস্তক পড়াবার সময় নতুন শব্দের অর্থ বোঝাবার জন্য ছবির ব্যবহার এবং রচনা শেখানোর জন্য ছবির ব্যবহার ঠিক একজাতীয় জিনিস নয়। ছাত্রেরা কিছুটা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করার পর ছবির সাহায্যে একটি ভাষা ব্যবহারের পরিবেশ (speech situation) সৃষ্টি ক'রে ধীরে ধীরে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। প্রথমে একটি ছবির নিচে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য লিখে রেখে ছাত্রদের ছবি দেখে ঐ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করতে বলা যেতে পারে। এরপর কোন একটি ছবি দেখে ছাত্রদের ছবিটি সম্পর্কে কতকগুলি বাক্য রচনা করতে বলা যেতে পারে। কোন ছবি দেখে ছাত্রেরা তার শিরোনামও রচনা করতে পারে, যেমন—'কচ্ছপ ও খরগোশ' ইত্যাদি। ছাত্রদের কোন ছবি দেখিয়ে তার সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে এবং ছাত্রেরা তাদের খাতায় সেগুলির উত্তর লিখবে। শেষে কোন প্রশ্ন ছাড়াই তারা কেবল ছবিটি দেখে সেটি সম্পর্কে কতকগুলি বাক্য লিখতে শিখবে। এইভাবে ছবির সাহায্যে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে রচনা লেখার অভ্যাস গ'ড়ে উঠবে।

মধ্যবর্তী স্তরে অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্রেরা প্রথমে ছবির সাহায্যে মৌখিকভাবে অবিরাম কথা বলার অভ্যাস করবে। এর জন্য একটি ছবি কিংবা ধারাবাহিক কয়েকটি ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ছবিগুলিতে কোন একটি

ঘটনা কিংবা একটি গল্প বর্ণনা করা থাকবে। শিক্ষক ছাত্রদের ছবিগুলি দেখিয়ে প্রশ্নের সাহায্যে মৌখিকভাবে গল্পটি ছাত্রদের দিয়ে রচনা করিয়ে নেবেন। এরপর গল্পটি ছাত্রেরা তাদের খাতায় লিখবে। এই জাতীয় কয়েকটি রচনা লেখা অভ্যাস করার পর, শেষে কোনরূপ প্রশ্নের সাহায্য ছাড়া কেবল ছবি দেখেই ছাত্রেরা অন্যান্য গল্প রচনা করতে শিখবে।

উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রেরা আরও উন্নত ধরনের মৌখিক ও লিখিত রচনা আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। এই স্তরে ছবির সাহায্যে রচনা লেখা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে রচনা লেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। তবু মাঝে মাঝে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের কোন ছবির দৃশ্য মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে বর্ণনা করতে বলা যেতে পারে। তবে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে নিম্ন শ্রেণীতেই ছবির সাহায্যে রচনার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। বই প'ড়ে কিংবা শিক্ষকের কাছে শুনে গল্প বলা অপেক্ষা ছবির সাহায্যে গল্প রচনার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কারণ এখানে ছাত্রের নিজস্ব কল্পনা ও রচনা-শক্তিকে প্রয়োগ করার কিছুটা সুযোগ রয়েছে।

৭॥ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাত্রদের কিভাবে শেখাবেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন:— (ক) সৃজনমূলক রচনা-লেখা (Creative writing); (খ) শ্রুতিলিখন (Dictation); (গ) বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার বিদ্যা (Punctuation)।

উত্তর: (ক) সৃজনমূলক রচনা-লেখা (Creative Writing):—

ছাত্রদের মাতৃভাষারূপে বাংলা ভাষা শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে সৃজনমূলক রচনা-শক্তির বিকাশ ঘটানো। অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে সৃজনমূলক রচনার প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সুযোগ ও উৎসাহের অভাবে ছাত্রদের এই সৃজনমূলক রচনা-শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটেনা। এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে আমরা কিরূপ সৃজনমূলক শক্তির বিকাশ ঘটাতে চাই সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত কাব্যপ্রতিভা কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্য-প্রতিভা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিনা। কিন্তু যদি আমরা ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি তাহলে তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু না কিছু সৃজনমূলক রচনা সৃষ্টি করতে পারে।

বিদ্যালয়ে সৃজনমূলক রচনা লিখিত ও মৌখিক দুভাবেই ছাত্রদের করানো যেতে পারে। তবে মৌখিক সৃজনমূলক রচনা প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করা গেলেও লিখিত সৃজনমূলক রচনা পঞ্চম শ্রেণীর আগে আরম্ভ করা উচিত নয়। সৃজনমূলক রচনা-লেখার জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। ছাত্রেরা যদি তাদের খুশীমত লেখবার স্বাধীনতা না পায় তাহলে তাদের পক্ষে সৃজনমূলক কোন কিছু

লেখা সম্ভবপর হবে না। সেইজন্য শিক্ষককে এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যেখানে ছাত্রেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃজনমূলক রচনা লেখার সুযোগ পেতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষকের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে ছাত্রদের পক্ষে প্রকৃত সৃজনমূলক রচনা লেখা সম্ভবপর নয়। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিশেষ ধাঁচের লেখা লিখলে তার মধ্যে সৃজনশীলতার যথাযথ প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়। সৃজনমূলক রচনায় ছাত্রদের ইচ্ছামত ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। ভাষার ব্যবহার ও ভাবের প্রকাশ এই উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্রেরা যদি নিজেদের ইচ্ছামত চলবার সুযোগ পায় তাহলেই কেবল তাদের পক্ষে সৃজনমূলক রচনা লেখা সম্ভব হবে। তবে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ছাত্রদের রচনায় কোন ভাষাগত ভুল থাকছে কিনা, কিংবা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা। এ ব্যাপারে শিক্ষকের কিছু বলার থাকলে তিনি অন্য কোন সময়ে এবং অন্য কোন প্রসঙ্গে ছাত্রদের সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। কারণ শিক্ষক যদি ছাত্রের সৃজনমূলক রচনার ভুলত্রুটির প্রতি বারবার তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকেন তাহলে তার সৃজনমূলক রচনা লেখার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সৃজনমূলক রচনা লেখার ব্যাপারে কিছু ছাত্র কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না এই কারণে যে তারা মনে করে অন্যেরা তাদের লেখা প'ড়ে উপহাস করবে। সেইজন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথম ছাত্রদের মন থেকে যাতে এইজাতীয় ধারণা দূর হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রেরা তাদের সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে যে সাহিত্য রচনা করেছে তা যদি অন্যের হাসির খোরাক জোগায় তাহলে তার কাছে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? শিক্ষককে ছাত্রদের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে, সৃজনমূলক রচনা যে-ধরনেরই হোক না কেন শ্রেণীর ছাত্রেরা তার গঠনমূলক সমালোচনা করবে এবং এই জাতীয় যে-কোন রচনা শিক্ষককে দেখালে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তা দেখে দেবেন।

পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার উপর সৃজনমূলক রচনা লেখা অনেকখানি নির্ভর করে। সেইজন্য ছাত্রেরা যাতে পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। **পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার অর্থ হল এমনভাবে জীবনযাপন করা যাতে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে এবং দৈনন্দিন জীবনে যেখানে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই অর্থপূর্ণ ও সন্তোষজনক ব'লে মনে হয়।** বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যে শিক্ষা লাভ করছে এবং যেরকম জীবন যাপন করছে তার দ্বারা যদি তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির উন্নতি হয়, এবং যদি তারা ঠিকমত চিন্তা করতে, অনুভব করতে ও কাজ করতে শেখে তাহলে তাদের মধ্যে এমন কিছু ধারণা ও অনুভূতির সৃষ্টি হবে যা তারা নিজের মত ক'রে প্রকাশ করতে চাইবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের দিয়ে সৃজনমূলক কাজ করানো মোটেই কষ্টকর হবে না। কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যদি এইজাতীয় শিক্ষা না পায়, যদি তারা মুখস্থ-বিদ্যায় অভ্যস্ত হয় কিংবা অন্ধভাবে অনুকরণ করে, যদি বিদ্যালয় ও জীবনের মধ্যে

নিবিড় সংযোগ না থাকে তাহলে আমরা ছাত্রদের কাছ থেকে সৃজনমূলক কোন কাজ প্রত্যাশা করতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে ছাত্রেরা কখনই নিজেদের প্রকাশ করতে শেখে না।[১]

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যাতে প্রচুর পরিমাণে ভাল ভাল গল্পের বই, কবিতার বই, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি পড়বার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে ছাত্রেরা মনের যথেষ্ট খোরাক পাবে এবং বিভিন্ন রকমের ধারণা ও জ্ঞানের দ্বারা মনকে নতুন কিছু সৃষ্টি করার উপযোগী ক'রে তৈরী করে নিতে পারবে। কারণ নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য নানারূপ তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রেরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছাত্রেরা কি জাতীয় সৃজনমূলক রচনা লিখবে সে সম্পর্কে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। কিছুদিন চর্চা করার পর তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে কার কোন বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে কেউ হয়তো ভাল গল্প লিখতে পারবে, কেউ হয়তো ভাল কবিতা লিখতে পারবে, আবার কেউ হয়তো ভাল প্রবন্ধ রচনা পারবে। কেউ কেউ নাটক কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার রচনা লেখায়ও দক্ষতা দেখাতে পারে। বিদ্যালয়ে সৃজনমূলক রচনা লেখার জন্য সময়-পত্রিকায় একটি নির্দিষ্ট ঘণ্টা (Period) রাখতে হবে। এই ঘণ্টায় ছাত্রদের নিজেদের খুসীমত সৃজনমূলক রচনা লেখার সুযোগ দিতে হবে। তবে শিক্ষক প্রয়োজনমত তাদের সাহায্য করবেন। কোন কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ হয়তো কম হবে, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ একটু বেশি হতে পারে। ছাত্রেরা যা কিছুই লিখুক না কেন তার মধ্যে যেন তাদের নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে—এ বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ের নিচু শ্রেণীতে সাধারণতঃ ছাত্রেরা সৃজনমূলক রচনা লেখার ব্যাপারে সঙ্কোচ বোধ করে। এরূপ ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে সৃজনমূলক রচনা লেখায় ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। দলবদ্ধভাবে লেখা শুরু করলে ছাত্রদের প্রথম অবস্থার জড়তা কেটে যাবে। দলবদ্ধভাবে ছাত্রেরা কোন গল্পের নাট্যরূপ দিতে পারে কিংবা কোন

১। "If the general education the child is getting, if the life he is living, is one where his powers of observation are being trained, where he is being taught to think and feel and act for himself, then he will certainly have ideas and feelings he will want to express in his own way, and there will be little difficulty in persuading him to do creative work. But if the education he is getting is not of this sort, if he is learning by rote and blindly imitating, if school and life are not linked up vitally, then we cannot expect much in the way of creative work and the pupil will never learn to express himself.'

—W. M. Ryburn

গল্প অথবা পদ্যও রচনা করতে পারে। এইরূপ দলবদ্ধভাবে কাজ শুরু করার পর অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সৃজনমূলক রচনা লেখায় উৎসাহ বোধ করবে। এছাড়া শিক্ষকও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কি কি বিষয়ে এবং কিভাবে সৃজনমূলক রচনা লেখা যায় সে সম্পর্কে ছাত্রদের মনে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন। এমন কি প্রথমদিকে কোন কোন ছাত্র কিছুটা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সৃজনমূলক রচনা লেখা শুরু করতে পারে।

যেসব ছাত্র সৃজনমূলক রচনায় খুব উৎসাহী তাদের নিয়ে 'গল্পের ক্লাব', 'কবিতার ক্লাব' প্রভৃতি গঠন করা যেতে পারে। এইসব ক্লাবের সদস্যেরা নিয়মিতভাবে নিজেদের সৃষ্ট রচনার আলোচনা করার জন্য একত্র মিলিত হবে এবং তাদের রচনার মানের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে সাহিত্য সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ক্লাবের সদস্যদের অবহিত করবেন। ছাত্রেরা তাদের উপযোগী বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাকে বিশ্লেষণ ক'রে সেগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষের পিছনে কি কি কারণ রয়েছে তা বোঝবার চেষ্টা করবে—শিক্ষক এ ব্যাপারেও ছাত্রদের সাহায্য করবেন। পরিশেষে, একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে; তা হল, সৃজনমূলক রচনা লেখার ব্যাপারে অধিকাংশ ছাত্রের সাফল্য হবে মাঝারি ধরনের। আর যাদের এ ব্যাপারে প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে তাদের প্রতিভা যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।**

(খ) শ্রুতিলিখন (Dictation):—

দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রুতিলিখনকে বানান শেখানোর উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে শ্রুতিলিখন প্রত্যক্ষভাবে বানান শিক্ষায় কোন সহায়তা করে না। Tomkinson-এর ভাষায় বলা যায়, "শ্রুতিলিখন বানান শেখায় না, শেখাতে পারে না এবং কখনও বানান শেখায়ও নি (Dictation does not and cannot teach and never has taught spelling)।"

কিন্তু ছাত্রেরা যখন কোন কোন শব্দের বানান কিছুটা শিখেছে তখন শ্রুতিলিখনের সাহায্যে ছাত্রদের মনে ঐ বানানগুলি ভালভাবে গেঁথে দেওয়া যায়। ছাত্রদের বানান শেখানোর ব্যাপারটি তাদের দৃষ্টি, শ্রুতি ও হাতের পেশীর সম্মিলিত অভ্যাস-গঠন ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রুতিলিখন শিক্ষককে ছাত্রদের মধ্যে এই অভ্যাসগঠনে সাহায্য করে।

শব্দের বানান আরও ভালভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করা ছাড়াও শ্রুতিলিখন ছাত্রদের হাতের লেখার গতি বৃদ্ধি করতে এবং তাদের শ্রুতিশক্তির উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। যেসব ছাত্রের শ্রুতিশক্তি দুর্বল তারা শিক্ষকের মুখের কথা শুনে

** এই রচনার বক্তব্যগুলি W, M. Ryburn-এর "Creative Writing" নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

তাদের জানা শব্দেরও সঠিক বানান লিখতে পারে না। এইরূপ ছাত্রদের শ্রুতিশক্তির উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শ্রুতিলিখনের সাহায্যে ছাত্রদের হাতের লেখায় গতি বাড়ানো যায়। এর জন্য শিক্ষককে ধীরে ধীরে তাঁর পড়ার গতি বাড়াতে হবে এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে পড়ায় গতি বাড়ানোর জন্য ছাত্রদের হাতের লেখা যেন দুষ্পাঠ্য হয়ে না যায়।

পরিশেষে, শ্রুতিলিখনের সাহায্যে ছাত্রেরা বিভিন্ন শব্দের বানান কতোখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে তা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। শ্রুতিলিখনের সাহায্যে কোন্ ছাত্র কি কি শব্দের বানান ভুল করে তা জানা যায় এবং ঐসব শব্দের বানান তাদের ভালভাবে শেখাবার ব্যবস্থা করা যায়। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের শ্রুতিলিখনের পাঠ দেবার সময় শিক্ষককে নিম্নলিলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :—

(১) প্রথমে শিক্ষককে শ্রুতিলিখনের জন্য নির্দিষ্ট সমগ্র অনুচ্ছেদটি ছাত্রদের একবার প'ড়ে শোনাতে হবে; তারপর তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে প্রত্যেক শব্দগুচ্ছের পর থেমে থেমে বাক্যগুলি পড়বেন।

(২) শিক্ষক কোন বাক্যাংশ কিংবা শব্দগুচ্ছ একবারের বেশি পড়বেন না; কারণ তাহলে ছাত্রেরা কোন অংশ একাধিকবার লিখে ফেলতে পারে।

(৩) শ্রুতিলিখনের জন্য কোন গদ্যাংশ নির্বাচন করার সময় শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঐ গদ্যাংশে ছাত্রদের অজানা শব্দ খুব বেশী না থাকে।

(৪) শ্রুতিলিখনের শেষে ছাত্রদের লেখা পরীক্ষা ক'রে যেসব বানান-ভুল ধরা পড়বে সেগুলির শুদ্ধরূপ ছাত্রদের পাঁচ থেকে দশ বার পর্যন্ত লিখতে দিতে হবে।

(গ) বিরামচিহ্ন-ব্যবহারবিদ্যা (Punctuation) :

বিরামচিহ্ন-ব্যবহার বিদ্যা বলতে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতির সাহায্যে কোন রচনার অর্থ পরিস্ফুট করার কৌশলকে বোঝানো হয়। বিরাম-চিহ্নকে **ছেদচিহ্ন** কিংবা **যতিচিহ্নও** বলা হয়। সেইজন্য বিরামচিহ্ন ব্যবহারের কৌশলকে যতিচিহ্ন-স্থাপন বিদ্যাও বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় ছাত্রেরা বাংলা ভাষায় কোন রচনা লেখার সময় সঠিকভাবে যতিস্থাপন করতে পারে না। এর কারণ হল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যত্নসহকারে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের নিয়মগুলি শেখানো হয়না। ছাত্রদের বিরামচিহ্ন ব্যবহারের দক্ষতা থেকে তাদের ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভালভাবে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের নিয়মগুলি শেখাতে হবে।।

ছাত্রদের বিরামচিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম শেখাবার সময় শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :—

(১) শিক্ষক প্রথমে উপযুক্ত বিরতি-সহকারে কোন গদ্যাংশ ছাত্রদের এমনভাবে পাঠ ক'রে শোনাবেন যাতে ছাত্রেরা তার অর্থ ভালভাবে বুঝতে পারে।

(২) এরপর শিক্ষক উক্ত গদ্যাংশটি উপযুক্ত বিরামচিহ্নসহ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে

দেবেন। শিক্ষক ছাত্রদের বিরামচিহ্নগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে গদ্যাংশটি পড়তে বললেন। তারপর তিনি বিরামচিহ্নগুলি মুছে দিয়ে ছাত্রদের সেগুলি আবার স্থাপন করতে বলবেন।

(৩) বিরামচিহ্নের ব্যবহার শেখাবার জন্য শিক্ষক মাঝে মাঝে শ্রুতিলিখনের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

(৪) ছাত্রদের দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পঠন (Intensive reading) করাবার সময় বিরামচিহ্নের ব্যবহারের প্রতি তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে।

(৫) বিরামচিহ্নের স্থান পরিবর্তন করলে কিভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে শিক্ষক ছাত্রদের তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন ; যেমন—'ভাল করিয়া পড়িবে, না পড়িলে পাশ করিতে পারিবে না।' এই বাক্যটিতে 'পড়িবে'র পর যে কমা-চিহ্নটি আছে সেটিকে 'না'-এর পর বসালে অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে।

(৬) বাংলা ভাষায় রচনা লেখার শুরু থেকেই ছাত্রেরা যাতে বিরামচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করতে পারে শিক্ষককে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ছাত্রদের কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), পূর্ণচ্ছেদ (।), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহারের নিয়মগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে ভালভাবে শেখাতে হবে।

(৭) অতিরিক্ত পরিমাণে বিরামচিহ্ন বিশেষ ক'রে 'কমা' ব্যবহারের ত্রুটিপূর্ণ প্রবণতা যাতে ছাত্রদের মধ্যে গ'ড়ে না ওঠে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ বানান সমস্যা ও তার প্রতিকার ॥

৮ ॥ বাংলা বানানের সমস্যা কি ? এই সমস্যার সহিত শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান ভুলের কোন সম্পর্ক আছে কি ? বাংলা ভাষার শিক্ষক বানান ভুলের সমস্যার ব্যাপারে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন কি ?

(C. U. B. Ed. 1974]

উত্তর : অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও দু'টি রূপ আছে—একটি মৌখিক, অপরটি লিখিত। মৌখিক ব্যবহারের জন্য ভাষার কোন সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয়। ভাষার এই সাঙ্কেতিক চিহ্নকেই বলা হয় বর্ণমালা। বর্ণমালার সাহায্যে ভাষার যে লিখিত রূপের সৃষ্টি হয় তাতে প্রতিটি শব্দ কতকগুলি বর্ণযোজনার মাধ্যমে গঠিত হয়। **বর্ণযোজনার মাধ্যমে গঠিত শব্দের সমাজ অনুমোদিত লিখিত রূপকেই আমরা বানান বলি।**

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির বানানের যদি সর্বজনস্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকানুন থাকে তাহলে বাংলা বানানের কোন সমস্যা দেখা দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলা ভাষার নিজস্ব কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের

জন্য বাংলা বানানের ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলা বানানের সমস্যাটিকে ঠিকমত বুঝতে হলে নিম্নলিখিত তিনটি দিক থেকে এই সমস্যার স্বরূপকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে—(ক) বর্ণমালাঘটিত বানান সমস্যা ; (খ) ভাষার প্রয়োগ-রীতি সংক্রান্ত বানান সমস্যা ; এবং (গ) উচ্চারণঘটিত বানান সমস্যা।

ক। **বর্ণমালাঘটিত বানান সমস্যা**—বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী তথা সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ ক'রে রচিত হয়েছে। সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যা ৫৩, আর বাংলা বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যা ৫১ (ঋ ও ৯ বাদে)। আকৃতিগত দিক থেকে সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালায় পার্থক্য থাকলেও বাংলা বর্ণমালার অক্ষর-পরিকল্পনা সংস্কৃত বর্ণমালার হুবহু অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিকল্পিত এবং প্রতিটি বর্ণের ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় ই-ঈ, উ-ঊ প্রভৃতি স্বরধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে হ্রস্বতা-দীর্ঘতা রক্ষা করা হয় এবং ন-ণ, জ-য, বর্গীয় ব-অন্তস্থ ব, শ-ষ-স, ড়-ঢ়-র প্রভৃতি সাদৃশ্যসম্পন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত ও ব্যবহারগত পার্থক্য রক্ষা করা হয়। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় এইসব বর্ণগুলির অস্তিত্ব থাকলেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় একদিকে যেমন স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা বজায় রাখা হয় না, অপরদিকে তেমনি উপরি উক্ত সাদৃশ্য-মূলক ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণের মধ্যেও কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এর জন্য বাংলা ভাষায় 'দিন' ও 'দীন', 'গান' ও 'ঘ্রাণ', 'শব' ও 'সব', 'জান' ও 'যান' প্রভৃতি শব্দগুলিতে ই-ঈ, ন-ণ, শ-স, এবং জ-য একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। ফলে **বাংলা বানান সংস্কৃত বানানের মত শ্রুতিনির্ভর নয়, সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিনির্ভর।** উচ্চারণের সময় বিভিন্ন সাদৃশ্যমূলক বর্ণের মধ্যে যে ধ্বনিগত পার্থক্য রয়েছে তা যদি বজায় রাখা না যায় তাহলে বানানের সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষরের অত্যধিক ব্যবহারও বানান-সমস্যাকে অনেকখানি জটিল ক'রে তুলেছে। 'অদ্য' ও 'চৌদ্দ', 'অন্ন' ও 'কন্ব', 'মহত্ব' ও 'আয়ত্ত' প্রভৃতি শব্দযুগলের ক্ষেত্রে দ্য-দ্দ, ন্ন-ন্ব এবং ত্ব-ত্ত একইভাবে উচ্চারিত হয়। সেইজন্য ছাত্রদের এমন কি বড়দের পর্যন্ত এই শব্দগুলির বানান সঠিকভাবে লেখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় এইজাতীয় আরও অনেক সমোচ্চারিত যুক্তাক্ষর রয়েছে ; যেমন দ্ব-দ্দ, শৃ-শ্রি, হ্ন-ন্ন প্রভৃতি। এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যুক্তাক্ষরগুলির আকৃতিগত জটিলতার জন্য সেগুলি যথাযথভাবে লেখাও অনেকসময় ছাত্রদের পক্ষে কষ্টকর হয় এবং বানান-সমস্যার সৃষ্টি করে।

খ। **ভাষার প্রয়োগ-রীতি সংক্রান্ত বানান সমস্যা**—বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছে। সেইজন্য বাংলা ভাষাকে মিশ্রভাষা বলা হয়। একটি মিশ্রভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দের সমাবেশ ঘটে ব'লে অনেক সময় বানানের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তৎসম শব্দগুলির বানান সংস্কৃত ভাষায় অনুসৃত বানানের নিয়ম অনুযায়ী করা হয় ; কিন্তু সেই নিয়ম

আবার তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দগুলির বানানের বেলায় প্রয়োগ করা যায় না। তার ফলে বানান-সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলা ভাষায় যেসব সমোচ্চারিত শব্দ-যুগলের উচ্চারণ এক, কিন্তু বানান আলাদা সেইসব শব্দের বানানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়; যেমন, শিকার/স্বীকার; দ্বারা/দারা; পরা/পড়া; শব/সব প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার একই সঙ্গে দুটি লিখিত রূপ প্রচলিত আছে। একটি হল সাধুরূপ, আর অপরটি হল চলিতরূপ। সাধুভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দকে চলিত ভাষার প্রয়োজনে অনেক সময় পরিবর্তন ক'রে নিতে হয় এবং তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বানান-সমস্যা দেখা দেয়। বিপরীত ক্রমে চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করার সময়ও বানান-সমস্যা দেখা দিতে পারে।

গ। **উচ্চারণ ঘটিত বানান সমস্যা**—বাংলা ভাষায় শব্দের বানান উচ্চারণ-ভিত্তিক নয়। সেইজন্য শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে শব্দের বানানের সামঞ্জস্যের অভাব থেকেও অনেক ক্ষেত্রে বানান-সমস্যার উদ্ভব ঘটে। 'দেখা' ও 'লেখা' এই শব্দদুটির মধ্যে বানানের সাদৃশ্য থাকলেও উচ্চারণের অনেক তফাৎ রয়েছে। 'এক' ও 'এবং' শব্দদুটিতে 'এ'র উচ্চারণ একরূপ নয়। সেইজন্য এইসব শব্দের সঠিক বানান লিখতে গিয়ে ছাত্রদের মনে অনেকসময় সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

বাংলা ভাষায় বর্ণমালায় এমন অনেক বর্ণ আছে যাদের স্বতন্ত্র কোন উচ্চারণ নেই; যেমন, ঈ, ঊ, ক্ষ, ণ, শ, ষ, য ইত্যাদি। এই বর্ণগুলির স্বতন্ত্র উচ্চারণের অভাবে অনেক সময় বানান-সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনি-প্রকাশের উপযোগী বর্ণের অভাবেও বানান সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যায়; যেমন, বঙ্গালী উপভাষায় ব্যবহৃত zানতি লিখতে z-এর সাহায্যে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষ, হ্ম, ত্ম, দ্ব প্রভৃতি যুক্তাক্ষরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক ভাবে উচ্চারিত হয় না, তারফলে বানান-সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় কোন যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে অতিরিক্ত ধ্বনির আগম হয়; যেমন, অমৃত>অম্রৃত। এর ফলেও বানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। দুটি যুক্তাক্ষরের মধ্যে রেখা-বিন্যাসগত সাদৃশ্যের ফলেও বানান-সমস্যা দেখা দিতে পারে; যেমন, 'সম্মান' শব্দটির 'ম্ম'-এর সঙ্গে 'ম্ন'-এর মিল থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই বানান বিভ্রাট ঘটে।

ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের জন্যও বানান-সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে; যেমন, হাসপাতাল, হাসি, কাচ, পাপড়ি প্রভৃতি শব্দগুলিতে উচ্চারণের দোষে ˇ-র আগম ঘটতে পারে।

বাংলা বানানের এই সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান ভুলের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা শব্দের বানান উচ্চারণের অনুগামী নয় ব'লে বাংলা বানান শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। তার ফলে বানান ভুল হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বাংলা বর্ণমালায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা ও সাদৃশ্যসম্পন্ন ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তারজন্যও শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বানান ভুল করে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সমোচ্চারিত

যুক্তাক্ষরগুলিও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বানান ভুল করতে সহায়তা করে। যেসব সমোচ্চারিত শব্দযুগলের উচ্চারণ এক কিন্তু বানান আলাদা সেইসব শব্দের বানান লেখার সময় শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ভুল করে ; যেমন—'শব' লিখতে গিয়ে তারা 'সব' লিখে ফেলে। বাংলা শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সামঞ্জস্য না থাকায় শিক্ষার্থীরা অনেকসময় কোন কোন শব্দের বানান লিখতে গিয়ে ভুল ক'রে বসে ; যেমন—'ব্যথা,, 'ব্যবহার' প্রভৃতি শব্দের বানান লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ভুল করে। অতএব বাংলা বানানের সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান ভুলের যে যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ছাত্রদের বানান ভুল নিবারণের জন্য বাংলা ভাষার শিক্ষক বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। ছাত্রেরা যাতে ভালভাবে বাংলা শব্দের বানান আয়ত্ত করতে পারে এবং যেসব শব্দের বানান তারা প্রায়ই ভুল করে সেগুলি যাতে তারা সংশোধন ক'রে নিতে পারে তারজন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে :—

॥ এক ॥ ছাত্রদের বানান শেখাবার সময় শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দের বানান শেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষককে কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী **শব্দ-তালিকা** (Vocabulary) তৈরী ক'রে ঐ শব্দগুলির বানান শেখাবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

॥ দুই ॥ ছাত্রদের সহজ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ কঠিন বানান শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

॥ তিন ॥ বানান মনে রাখবার তিনটি প্রধান উপায় হল দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও হাতের পেশীসমূহের যথাযথ ব্যবহার। যে পদ্ধতিতে এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে বানান লেখার সময় হাতের পেশী সঞ্চালন করবার উপযুক্ত অভ্যাস গ'ড়ে তোলা যায় তাকেই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীতে **অনুলিপি** (transcription) লেখানোর মাধ্যমে ভালভাবে ছাত্রদের বানান শেখানো যায়। অনুলিপি লেখার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা বানান-সংক্রান্ত পেশীগত ও দৃষ্টিগত দক্ষতা অর্জন করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করতে পারে।

॥ চার ॥ বানান শেখা ও বানান ভুল দূর করার ব্যাপারে অনুশীলনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারবার চর্চা করার মধ্য দিয়েই ছাত্রেরা সঠিক বানান আয়ত্ত করতে পারে। বানানের চর্চা করাবার জন্য শিক্ষককে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে। যান্ত্রিকভাবে কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে বানানের চর্চা করালে তার দ্বারা ছাত্রদের বিশেষ উপকার হবে না। যান্ত্রিকভাবে শেখা বানান তারা তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে। সেইজন্য যথাসম্ভব আকর্ষণীয় পরিবেশ রচনা ক'রে এবং ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে বানান-শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আনন্দদায়ক ক'রে তুলবার চেষ্টা করতে হবে।

॥ পাঁচ ॥ ছাত্রদের বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের বানান না শিখিয়ে শব্দগুলিকে

বাক্যের পটভূমিকায় স্থাপন ক'রে সেগুলির বানান শেখাবার চেষ্টা করতে হবে; কারণ বাক্য-রচনার পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্রদের কাছে শব্দের বানানের প্রশ্নটি দেখা দেয়। কাজেই বাক্যের পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্তভাবে বানান-শিক্ষা দিলে ছাত্রদের বানান ভুলের পরিমাণ কম হবে। অপ্রয়োজনীয় ও দুরূহ শব্দের বানান শেখানোর মাধ্যমে ছাত্রদের মনে বানানের প্রতি ভীতির সঞ্চার করা চলবে না।

॥ **ছয়** ॥ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার সময় নির্ভুলভাবে ছাপা পাঠ্যপুস্তক যাতে মনোনীত হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় শিক্ষকের যাতে বানান ভুল না হয় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বাংলা ব্যাকরণ পড়াবার সময় ব্যাকরণের যেসব নিয়মকানুনের সঙ্গে বানানের সম্পর্কে রয়েছে সেগুলি ছাত্রদের ভালভাবে শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

॥ **সাত** ॥ নিম্নশ্রেণী থেকে ছাত্রদের **অভিধান** ব্যবহারের অভ্যাস গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। যখনই কোন বানান সম্পর্কে ছাত্রদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হবে তখনই যদি তারা অভিধান থেকে সঠিক বানানটি দেখে নিয়ে তাদের সংশয় দূর করে তাহলে ধীরে ধীরে বানান সম্পর্কে তাদের মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে এবং বানান ভুলের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

॥ **আট** ॥ বানান ভুল নিবারণ করা এবং বানান শেখানোর ব্যাপারে **শ্রুতি-লিখনের** একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শ্রুতিলিখনকে শিক্ষামূলক ও পরীক্ষা-মূলক এই দুইভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে যে রচনাটি ছাত্রদের লিখতে দেওয়া হবে তার মধ্যে কয়েকটি নতুন বানান থাকবে। ঐ বানানগুলি প্রথমে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। তারপর শিক্ষক ঐ বানানগুলি মুছে দিয়ে নির্বাচিত রচনাটি ধীরে ধীরে পাঠ করবেন এবং ছাত্রেরা তা শুনে লিখবে। শেষে নতুন শেখা বানানগুলি ছাত্রেরা ঠিকমত লিখতে পেরেছে কিনা শিক্ষক তা দেখবেন। পরীক্ষামূলক শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষাগত মানের উপযোগী একটি গদ্যাংশ নির্বাচন ক'রে শিক্ষক শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে ছাত্রদের বানানের দক্ষতা নিরূপণ করবেন।

॥ **নয়** ॥ বানান শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন—(ক) শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে একটি শব্দ লিখে দেবেন। তারপর তিনি ছাত্রদের ঐ শব্দটির অক্ষরগুলির সাহায্যে যতগুলি শব্দ গঠন করা সম্ভব তা করতে বলবেন। যে যত বেশী শব্দ গঠন করতে পারবে সে তত বেশি নম্বর পাবে; শব্দের বানান ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে। (খ) শিক্ষক শ্রেণীর ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করবেন। প্রথম দলের একজন ছাত্র বোর্ডে একটি অক্ষর লিখবে—দ্বিতীয় দলের অপর একজন ঐ অক্ষরটির সঙ্গে আর একটি অক্ষর যোগ করবে। এই ভাবে অক্ষর যোগ ক'রে যে-ছাত্র শব্দটি সম্পূর্ণ করতে

পারবে সে কৃতিত্ব-নম্বর পাবে। শব্দের অক্ষর-সংখ্যা তিনটির কম হওয়া চলবে না। যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা না করেই অক্ষর যোগ করে এবং বিরোধীপক্ষ তাতে আপত্তি জানায় তাহলে তার নম্বর কাটা যাবে।

পরিশেষে, একথা বলা প্রয়োজন যে, সামগ্রিকভাবে মাতৃভাষার চর্চ্চার প্রতি ছাত্রদের মনে আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঞ্চার করতে না পারলে বানান-শিক্ষার ব্যাপারে তারা বিশেষ যত্নবান হবে না। সেইজন্য বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-চর্চ্চার উপর যাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯॥ সাধারণতঃ কি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখায় বানান ভুল হয়? বানান ভুল নিবারণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1972]

উত্তর : ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা লেখায় বানান ভুলের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানের অবনতির সঙ্গে যে বানান-ভুলের সমস্যাটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সে বিষয়ে কোন দ্বিমত আছে ব'লে মনে হয় না। তবু কি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখায় বানান ভুল হয় সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সঠিকভাবে বানান-ভুলের কারণগুলি যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে প্রতিকারের উপায়গুলি খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদেরা ছাত্রদের বানানভুলের পিছনে যেসব কারণ আছে ব'লে মনে করেন সেগুলি হল :

॥ এক ॥ **বাংলা ভাষার প্রতি ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে একটা অবহেলা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব** লক্ষ্য করা যায়। এর মূলে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বর্তমান রয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর সুদীর্ঘ তিনটি দশক অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা চর্চ্চা করলে সামাজিক প্রতিপত্তি, উচ্চ বেতনহার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা অনেক সহজ ব'লে বিবেচিত হয়। তারফলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কেউই বাংলা ভাষা চর্চা করার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন না ; এবং বানান শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরই ফল স্বরূপ ছাত্রেরা লেখায় বানান ভুল করে।

॥ **দুই** ॥ বাংলা ভাষার বর্ণমালায় এমন অনেক বর্ণ আছে যাদের পৃথক কোন উচ্চারণ নেই ; যেমন, ঈ, ঊ, য, ণ, শ, ষ ইত্যাদি। এই **বর্ণগুলির স্বতন্ত্র উচ্চারণের অভাবের** জন্য অনেক সময় ছাত্রেরা 'দিন' ও 'দীন', 'শব' ও 'সব', 'জান' ও 'যান' প্রভৃতি শব্দযুগলের বানানের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে পারে না এবং তারফলে তাদের লেখায় বানান ভুল হয়।

॥ তিন ॥ **অশুদ্ধ উচ্চারণের** জন্য অনেক সময় ছাত্রদের লেখায় বানান ভুল হয় ; যেমন, হাসপাতাল, হাসি, কাচ, পাপড়ি প্রভৃতি শব্দগুলির ভুল উচ্চারণের জন্য ছাত্রেরা এই শব্দগুলির বানান লেখার সময় ঁ-র ব্যবহার করতে পারে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষ, হ্ম, ত্মা, দ্ব প্রভৃতি যুক্তাক্ষরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, তার ফলে ছাত্রদের লেখায় বানান ভুল হতে পারে ; যেমন, ছাত্রেরা 'ক্ষতি'র পরিবর্তে 'খতি' কিংবা 'দ্বারা'র পরিবর্তে 'দারা' লিখে বানান ভুল করতে পারে।

॥ চার ॥ ছাত্রদের লেখায় বানান ভুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল বিদ্যালয়ে **বানান শিক্ষাদানের জন্য অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার।** বিদ্যালয়ে বানান লিখে আয়ত্ত করার পরিবর্তে ছাত্রদের বানান মুখস্থ করতে শেখানো হয়। ছাত্রেরা শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে আবৃত্তির সাহায্যে বানান মুখস্থ করে। তাছাড়া প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্রদের এমন সব কঠিন কঠিন শব্দের বানান মুখস্থ করানো হয় যেগুলির অর্থ তারা বোঝেনা। তারফলে বানানের প্রতি ছাত্রদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। এইভাবে অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রদের বানান শেখানো হয় ব'লে তাদের লেখায় প্রায়ই বানান ভুল হয়।

॥ পাঁচ ॥ **বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবের** জন্যও ছাত্রেরা বানান ভুল করে। বাংলা ব্যাকরণের ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত নিয়মগুলি ভালভাবে জানা থাকলে ছাত্রেরা অনেক শব্দের বানান নির্ভুলভাবে লিখতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াবার সময় ঐসব বিষয় সংক্রান্ত নিয়মগুলি ভালভাবে শেখানো হয় না। ফলে ছাত্রেরা অনেক বানান ভুল করে।

॥ ছয় ॥ ছাত্রেরা যেসব বই পড়ে সেগুলির মধ্যে অনেক **মুদ্রণ-প্রমাদ** থাকে। ছাপার অক্ষরে ভুল-বানান থাকলেও ছাত্রেরা তাকেই নির্ভুল ব'লে মনে করে। পাঠ্যপুস্তক থেকে এইসব ভুল-বানানের ছাপ ছাত্রদের মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে তারা সেগুলি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না এবং তাদের লেখাতেও তার ছাপ পড়ে।

॥ সাত ॥ **মনস্তাত্ত্বিক কারণেও** অনেক সময় ছাত্রেরা বানান ভুল করে। ছাত্রদের মনে যদি কোন কারণে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভীতি কিংবা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তাহলে অনেক সময় তারা জানা-বানানও ভুল করে ফেলে।

॥ আট ॥ **পরিবেশঘটিত কারণের** জন্যও ছাত্রদের লেখায় বানান ভুল হতে পারে। প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, সংবাদপত্র প্রভৃতিতে প্রায়ই নানা-রকম বানান-ভুল লক্ষ্য করা যায়। 'সার্বজনীন', 'দূর্গা', 'প্রতিযোগীতা', 'দুরাবস্থা', 'মুখস্ত' প্রভৃতি ভুল-বানানগুলি ঐসব প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে অনেক সময় ছাত্রদের মনে এমনভাবে ছাপ ফেলে যায় ফলে তাদের লেখায় বানান-ভুল হয়।

॥ নয় ॥ এমন অনেক ছাত্র আছে যাদের মধ্যে পড়বার ও লিখবার সময়

মনোযোগ ও একাগ্রতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এইসব ছাত্রের লেখায় প্রায়ই বানান-ভুল হয়। কারণ যত্ন সহকারে বিভিন্ন শব্দের বানান লক্ষ্য না করলে এবং লিখে অভ্যাস না করলে বানান-ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

॥ দশ ॥ **লেখার দ্রুততা কিংবা অন্যমনস্কতার** জন্যও ছাত্রদের লেখায় বানান ভুল হতে পারে। খুব দ্রুতগতিতে লিখবার সময় চিন্তার সঙ্গে হাতের পেশী ও আঙুল সঞ্চালনের সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়ার ফলে অনেক সময় বানান ভুল হয়। অন্যমনস্কতাও বানান-ভুলের অন্যতম কারণ হতে পারে।

॥ এগার ॥ **উগ্র আধুনিকতার মোহে** অনেক সময় শিক্ষক, অভিভাবক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে নিজেদের ইচ্ছামত বানান লেখার চেষ্টা করেন ; যেমন, 'কেন' না লিখে কেউ হয়তো লেখেন 'ক্যানো' ; 'এক' না লিখে কেউ হয়তো লেখেন 'এ্যাক' ; 'লক্ষ্য' না লিখে কেউ হয়তো লেখেন 'লক্ষ', ইত্যাদি। এর ফলে বানান সম্পর্কে ছাত্রদের মনে নানারকম সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং তারাও ঐসব ব্যক্তির অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক সময় বানান ভুল ক'রে বসে।

[দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।]

১০॥ ছাত্রদের লেখায় বানান ভুলের কথা প্রায়ই শোনা যায়।—সাধারণতঃ কি জাতীয় ভুল ঘটিয়া থাকে, তাহা আপনার অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত করুন এবং কি কি উপায়ে তাহা সংশোধন করা যায়, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। [C. U, B. T. 1967]

উত্তর : ছাত্রদের লেখায় বানান-ভুলের মাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা রচনা পরীক্ষা করলে যেসব ভুল-বানান লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে :—

১। বর্ণের উচ্চারণ ঘটিত ভুল :

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ক) ই, ঈ-ঘটিত ভুল—	শারিরীক	শারীরিক
	পিপিলিকা	পিপীলিকা
	বাল্মিকী	বাল্মীকি
	ইর্ষা	ঈর্ষা
(খ) উ, ঊ ঘটিত ভুল—	অদ্ভূত	অদ্ভুত
	ভূল	ভুল
	কৌতূহল	কৌতুহল
	মূহুর্ত	মুহূর্ত

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(গ) ন, ণ ঘটিত ভুল—	আহ্নিক	আহ্নিক
	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
	গননা	গণনা
	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
(ঘ) শ, ষ, স-ঘটিত ভুল—	শষ্য	শস্য
	পরিস্কার	পরিষ্কার
	পুরষ্কার	পুরস্কার
	ধ্বংশ	ধ্বংস
(ঙ) য-ফলা ঘটিত ভুল—	ব্যাবহার	ব্যবহার
	ব্যাতীত	ব্যতীত
	ব্যায়	ব্যয়
	দরিদ্র	দারিদ্র্য
(চ) ব-ফলা ঘটিত ভুল—	সত্ত্বা	সত্তা
	স্বরস্বতী	সরস্বতী
	সান্তনা	সান্ত্বনা
	উজ্জল	উজ্জ্বল
(ছ) ত, থ ঘটিত ভুল—	মুখস্ত	মুখস্থ
	প্রশস্থ	প্রশস্ত
	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
(জ) ট, ঠ-ঘটিত ভুল—	হটাৎ	হঠাৎ
	জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ
	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
(ঝ) ৎ-ঘটিত ভুল—	উচিৎ	উচিত
	উৎপাৎ	উৎপাত
	জগত	জগৎ
(ঞ) ঁ-ঘটিত ভুল—	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
	কাঁচ	কাচ
	হাঁসি	হাসি
	পাঁপড়ি	পাপড়ি
(ট) র, ড়-ঘটিত ভুল—	তোরজোর	তোড়জোড়
	ঘড়বারী	ঘরবাড়ী
	তোলপার	তোলপাড়

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(ঠ) ঙ, ঙ্গ-ঘটিত ভুল—	গঙা	গঙ্গা
	ভঙুর	ভঙ্গুর
	হাঙাম	হাঙ্গাম

২। সন্ধি-ঘটিত ভুল ঃ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	মনযোগ	মনোযোগ
অত্যাধিক	অত্যধিক	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
অদ্যাবধি	অদ্যবধি	নিরোগ	নীরোগ
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী

৩। সমাস ঘটিত ভুল ঃ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গুণীগণ	গুণিগণ	প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা
যোগীগণ	যোগিগণ	রাজাগণ	রাজগণ
কালীদাস	কালিদাস	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরপরাধী	নিরপরাধ	দিবারাত্র	দিবারাত্রি

৪। প্রত্যয়-ঘটিত ভুল ঃ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য	জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা
সখ্যতা	সখ্য, সখিত্ব	চৌর্য্য	চুর্য

ছাত্রদের লেখায় উপরিউক্ত বানানগুলি ছাড়াও আরও নানাপ্রকার বানান-ভুল লক্ষ্য করা যায়। এইসব বানান-ভুল সংশোধন করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :—

(ক) ছাত্রদের বানান মুখস্থ করানোর পরিবর্তে বানান লেখানোর মাধ্যমে বানান-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নশ্রেণীতে **অনুলিপিলিখনের** (Transcription) উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(খ) **শ্রুতিলিখনের** (Dictation) সাহায্যে ছাত্রদের ভুল-বানানগুলি নির্ধারণ ক'রে সেগুলি সঠিকভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একটি ক'রে **শব্দতালিকা** প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির বানান লিখে অনুশীলন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) উচ্চারণের দোষে যেসব শব্দের বানান-ভুল হয় সেগুলির **সঠিক উচ্চারণের** প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) ছাত্রদের সন্ধি, সমাস, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত নিয়মগুলি ভালভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) ছাত্রদের সহজ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ কঠিন বানান শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও দুরূহ শব্দের বানান শেখানোর মাধ্যমে ছাত্রদের মনে বানানের প্রতি ভীতির সঞ্চার করা চলবে না।

(ছ) **ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতির** সাহায্যে বানান শিক্ষাকে ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার চেষ্টা করতে হবে।

(জ) নিম্নশ্রেণী থেকে ছাত্রদের **অভিধান ব্যবহারের** অভ্যাস গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে।

১১॥ নিম্নলিখিত দশটি শব্দের দুইটি করিয়া বানান দেওয়া হইয়াছে ; আপনি যে শব্দটির পক্ষপাতী তাহা নির্দেশ করুন এবং সেই পক্ষপাতের কারণ কী তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন ঃ

(ক) যাদুকর, জাদুকর ; (খ) স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর ;
(গ) পুনঃপুন, পুঃনপুনঃ ; (ঘ) ভাল, ভালো ;
(ঙ) অ্যাসিড, এসিড ; (চ) বাঙ্গালী, বাঙালী ;
(ছ) পাখি, পাখী ; (জ) করিও, করিয়ো ;
(ঝ) জিনিস, জিনিষ ; (ঞ) বিদ্বান্‌, বিদ্বান।

[C. U. B. T. 1969]

উত্তর ঃ আধুনিকতার মোহে পড়ে একদল নবীন বাংলা বানান নিয়ে যথেচ্ছাচার সুরু করেছেন। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপ এবং বিশুদ্ধি রক্ষা করার জন্য আমাদের কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়মগুলি অনুসরণ করে প্রদত্ত বানানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) যাদুকর, জাদুকর :– এটি একটি বিদেশী শব্দ, ফারসী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়মে 'য' কিংবা 'জ' সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নেই। বাংলা অভিধানে উভয় বানানই দেখানো হয়েছে। তবে 'যাদুকর' বানানটি ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুসরণ করার পক্ষপাতী। কারণ জাদু বা যাদু শব্দটির দুটি অর্থ (১) শিশুকে স্নেহ সম্বোধন বা বিদ্রূপাত্মক সম্বোধন বিশেষ এবং (২) ইন্দ্রজাল, কুহক, ভেলকি। প্রথম অর্থে জাদু এবং দ্বিতীয় অর্থে 'যাদু' শব্দ ব্যবহার করলে অর্থ বিপত্তির কোন আশংকা থাকে না। সেইজন্য 'যাদুকর' বানানটিরই আমি পক্ষপাতী।

(২) স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর : স্বয়ম্বর শব্দটি ব্যাকরণের দিক থেকে শুদ্ধ নয়। এর সন্ধি বিশ্লেষ করলে হয় স্বয়ম+বর। ম-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে ম্ এর স্থানে ং হয়। সুতরাং শব্দটি শুদ্ধ বানান হবে স্বয়ংবর। আবার এটি তৎসম শব্দ বলে এর শব্দরূপ স্বয়ংবরই গ্রহণীয়। ভাষায় ব্যবহার হলেও সংসদ অভিধানে স্বয়ম্বর বানানটিকে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৩) পুনঃপুন, পুনঃপুনঃ : এটি তৎসম শব্দ। সাধু ভাষাতেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধু ভাষার শব্দটি প্রয়োগকালে এর সাধু রূপটিই অর্থাৎ পুনঃপুনঃ লেখা উচিত।

(৪) ভাল, ভালো : বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়মে বলা হয়েছে সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থভেদ উপলব্ধির জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব কমা বা অন্ত চিহ্নগুলি বর্জন করাই বিধেয়। অর্থগ্রহণে বাধা হলেও কয়েকটি শব্দের অন্ত্য অক্ষরে ও-কার বিকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। হসন্তযুক্ত 'ভাল' শব্দটির অর্থ হল 'কপাল'। এক্ষেত্রে অন্ত্য ও-কার যোগ না করলে অর্থ বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে চলতি বাংলায় কপাল অর্থে ভাল শব্দটি ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ও-কার যোগ না করলেও খুব একটা অসুবিধা হয় না। তবু বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের যখন স্বাধীনতা আছে আমি উচ্চারণ অনুসরণ করে 'ভালো' গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

(৫) অ্যাসিড, এসিড : শব্দটি বিদেশী (Acid)। বাংলা শব্দের বানান সবসময় উচ্চারণ অনুযায়ী হয়না। এক্ষেত্রে তা করতে গিয়ে অদ্ভুত অ্যা বর্ণ সৃষ্টি করতে হয়। আমরা যেমন এক, এমন, এত ইত্যাদি শব্দের বানান অ্যাক, অ্যামন, অ্যাতো বলে কেউ লিখিনা সেরকম এক্ষেত্রে 'এসিড' বানানটিই রীতিসম্মত।

(৬) বাঙ্গালী, বাঙালী : বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী দুরকম বানানই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং, ঙ, বিধেয়। যেমন বাংলা, স্বরাশ্রিত হলে ঙ বিধেয়, যথা বাঙালী। সুতরাং আমি বাঙালী বানানটির পক্ষপাতী। এতে উচ্চারণের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য থাকবে।

(৭) পাখি, পাখী : পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম অনুযায়ী যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে। সংস্কৃত পক্ষিন শব্দের প্রথমার একবচন পক্ষী থেকে শব্দটি এসেছে। তাই নিয়ম অনুযায়ী 'পাখি' এবং 'পাখী' দুই বানানই শুদ্ধ। তবে বর্তমানে অনেকেই ই-কার ব্যবহার করছেন। রবীন্দ্রনাথ পাখি, বাড়ি, ধুলামন্দির বানান ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আমিও ই-কার যুক্ত বানানটিই ব্যবহার করতে চাই।

(৮) করিও, করিয়ো : সাধু বাংলা ভাষায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধু রীতি অনুযায়ী য়-শ্রুতির নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় বানানটিই শুদ্ধ। কিন্তু প্রথমটিরই ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যুগরুচি অনুযায়ী আমি 'করিও' বানানটিরই সমর্থক।

(৯) জিনিস, জিনিষ : আরবী জিন্‌স থেকে এর উদ্ভব। পূর্বে জিনিষ বানানটিরই প্রচলন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ

অনুসারে S-এর স্থানে স হবে। যথা ক্লাস, আসল, জিনিস ইত্যাদি। এছাড়া আরবী জিন্‌স এর মূল অন্ত্যাক্ষরের উচ্চারণ ছিল S-এর মত। সুতরাং জিনিস বানানটিই যুক্তিযুক্ত।

(১০) বিদ্বান, বিদ্বান্—শব্দটি তৎসম। সংস্কৃত প্রথমার একবচনে এর রূপ বিদ্বান্। কিন্তু বাংলা যেহেতু সংস্কৃত নয়, তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সকল চিহ্ন বাংলায় গৃহীত হয় না। অতএব বিদ্বান বানানটিই সিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী এই বানানটিই গ্রাহ্য। এছাড়া শব্দের শেষে সাধারণতঃ হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না। সুতরাং আমি 'বিদ্বান' এই বানানটিরই পক্ষপাতী।

॥ অতিরিক্ত সংযোজন ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার ঃ বাংলা বানানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ যে একটা বিশৃঙ্খলা চলে আসছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা তা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁরা বাংলা বানান সংস্কারের কিছু কিছু চেষ্টাও করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের কিছুটা সরলীকরণ ক'রে "বাংলা বানানের নিয়ম" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকার ভূমিকা থেকে জানা যায় যে "প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানের নিয়মগুলি অনুমোদন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলিই মোটামুটিভাবে অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু এই নিয়মগুলির মধ্যে বিকল্পের আধিক্য থাকায় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আবার নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চারণের কাছাকাছি বাংলা বানানকে কিভাবে ধ'রে রাখা যায় তার জন্য নতুন ক'রে আবার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ সালে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'বাংলা বানানের নিয়ম সমিতি' গঠন করেছেন। এই সমিতি সম্প্রতি (১৯৮১) তাঁদের বানান-সংক্রান্ত নতুন প্রস্তাবগুলি 'সুচিন্তিত অভিমত' সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে পাঠিয়েছেন। আশা করা যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। নতুন প্রস্তাবে সমিতি যতদূর সম্ভব বিকল্প বর্জন করেছেন। এছাড়া মূলতঃ বানান-সমিতি ১৯৩৬ সালের নিম্নলিখিত বিধিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন ঃ

১। বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হবে।

২। সুপ্রচলিত শব্দের যদি বানান সংস্কার করতেই হয়, তবে বানানের জটিলতা না বাড়িয়ে সরলতা আনতে হবে।

৩। শুধু বর্তমান লেখক-পাঠকদের সুবিধার জন্য নয়, ভবিষ্যতে যারা লেখাপড়া শিখবে তাদের যাতে অধিকতর সুবিধা হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বানান তৈরী হবে।

৪। অসংস্কৃত শব্দে 'ণ' বর্জন করলে বানান সরল হবে।

নতুন সমিতি বানান-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েই সংস্কার সাধ্য হইবে না।"

[১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানের নিয়মাবলীর জন্য রাজশেখর বসু সংকলিত **'চলন্তিকা'** অভিধানের পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।]

নিম্নে চলন্তিকা থেকে উক্ত নিয়মাবলীর কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রেই **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন** করতে হবে ;

যেমন, অর্চনা, মূর্ছা, সর্ব, শর্ত, কর্জ, চর্বি ইত্যাদি।

(খ) **হস্-চিহ্ন ঃ**—শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হবে না ; যেমন, ওস্তাদ, চেক, পকেট ইত্যাদি। কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয় ; শাহ্, তথ্‌ত্, বগু্ ইত্যাদি। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যেমন, চট্, সার্ ইত্যাদি।

(গ) **ই, ঈ, উ, ঊ ঃ**—যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ ঊ অথবা বিকল্পে ই উ হবে ; যেমন, কুম্ভীর>কুমীর/কুমির ; পক্ষী>পাখী/পাখি ; ঊনবিংশ>ঊনিশ/উনিশ।

(ঘ) **সন্ধির ক্ষেত্রে যদি প্রথম পদের শেষে 'ম্' থাকে এবং পর পদের প্রথমে ক খ গ ঘ থাকে** তাহলে 'ম্' স্থানে ং অথবা ঙ্ হবে ; যেমন, অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, সংঘাত ইত্যাদি।

(ঙ) **জ, যঃ**—নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে 'য্' এর পরিবর্তে 'জ' লিখতে হবে ঃ কাজ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জোড়, জোত, জোয়াল ইত্যাদি।

(চ) **ন, ণ ঃ**—অসংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হবে ; যেমন, কান, বামুন, সোনা, কোরান ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তাক্ষরে 'ণ' চলবে ; যেমন, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

(ছ) **ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা ঃ**—সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার বা ঊর্ধ্ব-কমা যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে শেষ অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যেতে পারে ; যেমন—কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; ইত্যাদি।

(জ) **শ, ষ, স ঃ**—তৎসম শব্দের বানান অনুযায়ী তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হবে ; যেমন, অংশু>আঁশ ; মশক>মশা ; সর্ষপ>সরিষা, ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হবে ; যেমন, মনুষ্য>মিনসে ; শ্রদ্ধা>সাধ, ইত্যাদি।

(ঝ) : [বিসর্গ] :—তৎসম শব্দের শেষে ':' থাকলে তা বর্জন করতে হবে ; যেমন—মন, যশ, বক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু তৎসম শব্দের মধ্যে ':' থাকলে তা বজায় থাকবে এবং বিসর্গ সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী বানান নির্ধারিত হবে ; যেমন—অধঃপত, সদ্যোঃজাত, ইত্যাদি।

(ঞ) ঙ্গ, ং, ঙ :—'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলবে।

হসন্ত ধ্বনি হ'লে বিকল্পে ং বা ঙ হবে, যেমন—রং/রঙ, সং/সঙ, বাংলা/বাঙলা, কিন্তু, স্বরাশ্রিত হ'লে 'ঙ' হবে ; যেমন—বাঙালী, রঙীন, ইত্যাদি।

॥ হস্তাক্ষর শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

১২॥ হাতের লেখা শিখাইবার উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া ইহা শেখান যায়? এ বিষয়ে শ্রুতি-লিখনের স্থান কোথায়? [C. U. B. T. 1955]

উত্তর : ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম। ভাষার সাহায্যে আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করি। এই আদান-প্রদান দুভাবে হতে পারে, কথাবার্তার মাধ্যমে কিংবা লেখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তির সঙ্গে আমরা ভাবের আদান-প্রদান করতে চাই সে যদি আমাদের সম্মুখে থাকে তাহলে কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা পরস্পর ভাব-বিনিময় করি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি দূরে থাকে তাহলে আমাদের লেখার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যালয়ে যেসব উদ্দেশ্যে ছাত্রদের হাতের লেখা শেখানো হয় সেগুলি হল :

(ক) ভাষার লিখিত রূপ আয়ত্ত করতে না পারলে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে জীবিকানির্বাহের জন্য যেসব পেশা অবলম্বন করবে সেগুলির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না।

(খ) কথ্য ভাষার ব্যবহার এবং লিখিত ভাষার ব্যবহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সম্পূর্ণভাবে কোন ভাষা শিখতে হলে তার কথ্য ও লিখিত দুটি রূপই আয়ত্ত করা প্রয়োজন। তা না হ'লে ভাষাশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষকরে মাতৃভাষায় লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিরাট অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে তাতে জীবনের অনেক কাজেই যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর হবে না।

(গ) হাতের লেখা শিখলে আমরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারি এবং স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি প্রভৃতি জায়গায় যেখানে লিখিতভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করতে হয় তা আমরা করতে পারি।

(ঘ) হাতের লেখা শিখলে ছাত্রেরা প্রবন্ধ, গল্প কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি লিখে তাদের সৃজনক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

(ঙ) হাতের লেখা না শিখলে লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের শিক্ষাগত অগ্রগতির পরিমাপ করা যায় না। নিম্নশ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হলেও ; উচ্চশ্রেণীতে লিখিত পরীক্ষা ছাড়া তাদের বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়।

(চ) হাতের লেখার চর্চা করলে বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের সঠিক রূপ ছাত্রদের মনে ভালভাবে গেঁথে যায় এবং লেখার মাধ্যমে ছাত্রেরা শব্দের বানান ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে।

ছাত্রদের হাতের লেখা শেখানোর জন্য বহুদিন যাবৎ যে পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে তাকে বলা হয় **বর্ণক্রম-পদ্ধতি**। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের প্রথমে স্বরবর্ণ ও তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ এইভাবে বর্গের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি একটি ক'রে বর্ণ লিখতে শেখানো হয়। এইভাবে ছাত্রদের সমস্ত বর্ণগুলি শেখা হয়ে গেলে তারা শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি লিখতে শেখে। এই পদ্ধতিতে খুবই যান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের হাতের লেখা শেখানো হয়। কারণ পৃথকভাবে এক-একটি বর্ণের কোন অর্থ নেই। সেইজন্য ছাত্রেরা যখন এই অর্থহীন বর্ণগুলির উপর বারবার পেন্সিল বুলিয়ে হাতের লেখা অভ্যাস করে তখন তারা এই কাজে কোনরূপ আগ্রহবোধ করে না এবং আনন্দও লাভ করে না। এই সব কারণে হাতের লেখা শেখার বর্ণক্রম-পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমানে হাতের লেখা শেখানোর জন্য **ভাষাক্রম পদ্ধতি** অবলম্বন করা হয়। ভাষাক্রম পদ্ধতিতে ছাত্রেরা প্রথমে মৌখিকভাবে ভাষা ব্যবহারের কৌশলগুলি আয়ত্ত করে। তারপর তারা যখন ভাষা-ব্যবহারে কিছুটা অভ্যস্ত হয় তখন তাদের হাতের লেখা শেখানো শুরু করা হয়। হাতের লেখা প্রথমে বর্ণের পরিবর্তে শব্দ দিয়ে শুরু হয়। অর্থাৎ ছাত্রেরা প্রথমে সহজ সহজ শব্দগুলি লিখতে শেখে। এই শব্দগুলি নির্বাচন করার সময় ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তাদের কাছে প্রীতিপদ শব্দগুলি নির্বাচন করার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ; যেমন, প্রথম দিকে এই শব্দগুলি হবে—বাবা, কাকা, দাদা, দিদি, মা, মামা, ভাত, হাত, বল, ফল ইত্যাদি। এইভাবে শিশুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সহজ শব্দগুলি দিয়ে লেখা শেখানো আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ তাদের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত নতুন নতুন শব্দগুলি লেখার অভ্যাস যাতে গ'ড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শব্দ লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দিয়ে ছোট ছোট বাক্য লেখানোর চেষ্টাও করতে হবে। এইভাবে ভাষাক্রম-পদ্ধতির সাহায্যে হাতের লেখা শেখানো হ'লে ছাত্রেরা যথেষ্ট আনন্দের সঙ্গে হাতের লেখা শেখার সুযোগ পাবে এবং শিক্ষার ফল অনেক স্থায়ী হবে। কিন্তু ভাষাক্রম পদ্ধতির সাহায্যে হাতের লেখা শেখানো শুরু করার পূর্বে

শিশুদের কিছুটা কলম ধ'রে হস্ত-সঞ্চালন করবার এবং চক দিয়ে আঁচড় কাটার সুযোগ দিতে হবে। এই আঁচড় কাটা প্রথমে খেলাচ্ছলে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ শিশুকে দিয়ে প্রথমে ছোট ছোট সরলরেখা ও পরে বক্ররেখা অঙ্কনের অভ্যাস করাতে হবে। তারপর শিক্ষক শিশুর হস্ত-চালনাকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেন যাতে তা এক একটি বিশেষ অক্ষর গঠনের সহায়ক হয়।

এইভাবে হাতের লেখা শেখাকে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক ক'রে তুলতে পারলে তারা খুব তাডাতাড়ি হাতের লেখা শিখে ফেলতে পারবে। হাতের লেখা শেখানোর জন্য নিম্নশ্রেণীতে অনুলিপির (transcription) সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া টেবিলের উপর কাগজ ঠিকমত রাখা, ঠিকমত কলম ধরা, সঠিক ভঙ্গীতে বসা, লিখবার কাগজকে চোখ থেকে এক ফুট দূরে রাখা, সঠিকভাবে হাত ও আঙুল সঞ্চালন করা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের উপযুক্ত অভ্যাস গ'ড়ে তোলায় চেষ্টা করতে হবে।

হাতের লেখা শেখানোর ব্যাপারে শ্রুতিলিখনের স্থান কোথায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার শুরুতেই একথা বলা প্রয়োজন যে শ্রুতিলিখনের দ্বারা হাতের লেখা শেখানো যায় না। তবে হাতের লেখার অভ্যাস-গঠন ও গতি-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রুতিলিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছাত্ররা ভাষা-শিক্ষায় ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হ'লে এবং হাতের লেখার দক্ষতা কিছুটা অর্জন করলে তবেই শ্রুতিলিখনের প্রয়োগ করা চলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ছাত্রেরা দীর্ঘদিন হাতের লেখা অভ্যাস করার পরও তাদের লেখার গতি খুবই মন্থর। ছাত্রেরা যতই উচ্চ শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই তাদের লেখাজোখার কাজও বেড়ে যায়। কিন্তু সেই অনুপাতে যদি তারা তাড়াতাড়ি লিখতে না পারে তাহলে লেখাপড়ায় তারা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং পরীক্ষাতেও তারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে আসতে পারবে না। এইসব ক্ষেত্রে শ্রুতিলিখনের সাহায্যে যদি নিয়মিতভাবে কিছুদিন হাতের লেখা অভ্যাস করানো যায় তাহলে ছাত্রদের লেখার গতি বৃদ্ধি পাবে। তবে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাড়াতাড়িতে লিখতে গিয়ে ছাত্রদের হাতের লেখা যেন দুর্বোধ্য হয়ে না যায়।

॥ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥

॥ উত্তম হস্তাক্ষরের লক্ষণ ॥

ভালো হাতের লেখার কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য-গুলিকে ভাল হাতের লেখার লক্ষণও বলা যেতে পারে। ভাল হাতের লেখার প্রধান লক্ষণগুলি হল—(১) **স্পষ্টতা** (distinctiveness); (২) **সরলতা** (simplicity); (৩) **ব্যবধান** (spacing); (৪) **সমরূপতা** (umiformity); (৫) **দ্রুততা** (speed) এবং (৬) **যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার** (proper use of punctuation)।

১। **স্পষ্টতা**—স্পষ্টতা ভালো হাতের লেখার একটি প্রধান গুণ। হাতের লেখা স্পষ্ট না হলে তা ভালভাবে পড়া যায় না এবং লিখিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা যায় না। সেইজন্য হাতের লেখা যাতে খুব স্পষ্ট হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। স্পষ্টতার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতারও বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই স্পষ্টতার সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করতে হবে।

২। **সরলতা**—ভাল হাতের লেখার অপর একটি গুণ হল সরলতা। হাতের লেখায় যে সমস্ত অক্ষর ব্যবহৃত হবে সেগুলির রেখা-বিন্যাস করার সময় কোনরূপ অপ্রয়োজনীয় অংশ যাতে অক্ষরগুলির সঙ্গে যুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন অক্ষরের রেখাবিন্যাসে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করা চলবে না।

৩। **ব্যবধান**—ভাল হাতের লেখায় শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি, লাইনের অন্তর্গত শব্দগুলি এবং পৃষ্ঠার অন্তর্গত লাইনগুলি পরস্পর উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে সাজানো থাকে। অক্ষর, শব্দ এবং লাইনের পারস্পরিক ব্যবধান সঠিকভাবে রক্ষিত না হ'লে হাতের লেখা কখনও ভাল ব'লে গ্রাহ্য হতে পারে না।

৪। **সমরূপতা**—ভাল হাতের লেখায় সমরূপতা বজায় থাকবে ; অর্থাৎ এই লেখার অক্ষরগুলির আকৃতি ও তাদের পারস্পরিক দূরত্ব একরূপ হবে, সেইগুলি একই লাইনে সাজানো থাকবে এবং অক্ষরের সরলরেখাগুলি একইভাবে খাড়া কিংবা হেলানো থাকবে।

দ্রুততা—দ্রুততা ভাল হাতের লেখার একটি প্রধান গুণ। অনেকে হয়তো ধীরে ধীরে খুব সুন্দরভাবে হাতের লেখা লিখতে পারে। কিন্তু দ্রুততার অভাবে বাস্তব জীবনে এই জাতীয় সুন্দর হাতের লেখা বড় একটা কাজে লাগেনা। সেইজন্য ছাত্রেরা হাতের লেখা চর্চা করার শুরু থেকেই যাতে তাদের লেখার গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। **যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার**—ভাল হাতের লেখায় যতিচিহ্নগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে। যতিচিহ্নগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে লিখিত বিষয়ের অর্থ অনেক সময় ঠিকভাবে বোঝা যায় না। সেইজন্য যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারকে ভাল হাতের লেখার অন্যতম গুণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটিতে ভাল হাতের লেখার বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে :

সমাণি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।
অব্যাকুলিত মাত্রানি যো বৈ লিখতি লেখকঃ॥

অর্থাৎ, অক্ষরগুলি সমআকৃতিবিশিষ্ট হবে, তাদের উচ্চতা (শীর্ষ) একরূপ হবে, তারা ঘনসন্নিবিষ্ট হবে, আবার তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব থাকবে এবং লেখার মাত্রাগুলি একই সরলরেখায় অবস্থান করবে।

॥ বিভিন্ন ধরনের লিখনশৈলী ॥

বাংলা হাতের লেখার প্রধানতঃ দুরকমের রীতি বা শৈলী প্রচলিত আছে—(১) ছাপা অক্ষরের অনুরূপ হাতের লেখা; এবং (২) জড়ানো বা টানা হাতের লেখা। জড়ানো হাতের লেখা নানারকমের হতে পারে। সঠিকভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির জড়ানো হাতের লেখার মধ্যে কিছু-না-কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকেই। তবে জড়ানো হাতের লেখার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে রাবীন্দ্রিক লিখনশৈলী শিক্ষিত সমাজে বহুদিন যাবৎ স্বীকৃত হয়ে আসছে। অনেকক্ষেত্রে জড়ানো বা টানা লেখার সুবিধার জন্য ছাপার অক্ষর থেকে কোন কোন অক্ষরের আকৃতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। জ, ট, ক, ধ প্রভৃতি অক্ষরের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়।

ছাত্রেরা যখন প্রথম হাতের লেখা শেখে তখন তাদের ছাপা অক্ষরের অনুরূপ হাতের লেখা শেখানো হয়। তারপর এই জাতীয় হাতের লেখা ভালভাবে রপ্ত হয়ে গেলে তারা জড়ানো বা টানা হাতের লেখা অভ্যাস করে। হাতের লেখার এই রীতি পরিবর্তনের সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা জড়ানো হাতের লেখা লিখতে গিয়ে কোন অক্ষরের রূপকে অযথা বিকৃত ক'রে না ফেলে।

জড়ানো হাতের লেখার অক্ষরগুলি সাধারণতঃ যে-লাইন বরাবর লেখা হয় তার সঙ্গে লম্বভাবে কিংবা বাম অথবা ডানদিকে হেলানোভাবে থাকে। তবে এইজাতীয় হাতের লেখায় সরলরেখার ব্যবহার বেশী না থাকলে লেখার হেলানো ভাবটা সঠিক-ভাবে ধরা যায় না। রাবীন্দ্রিক লিখনশৈলীতে সরলরেখার ব্যবহার নেই বললেই চলে। হেলানো হাতের লেখার ক্ষেত্রে বসবার ও হাত-রাখবার ভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় এবং এই জাতীয় লেখায় দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার সমানভাবে হয় না। কিন্তু খাড়া-লেখায় এইরূপ শারীরিক ভঙ্গীগত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে না। তাছাড়া পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, হেলানো লেখার চেয়ে খাড়া-লেখার গতি বেশী হয়।

॥ অনুবাদ শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

১৩॥ "ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদের আবশ্যকতা আছে। অনুবাদ শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন নহে।"—উক্তিটি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। এই প্রসঙ্গে অনুবাদ শিক্ষাদানের উপায়গুলিও লিপিবদ্ধ করুন।

[C. U. B. Ed. 1977]

উত্তর ঃ ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদের আবশ্যকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখানে ভাষা শিক্ষা বলতে বাংলা-ভাষাশিক্ষার কথাই বলা হয়েছে এবং অনুবাদ বলতে ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে আলোচ্য বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করলে

দাঁড়ায়, বাংলা অনুবাদ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ অভ্যাস করানোর কোন প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আবার একে ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক বলেও মনে করেন। কারণ সার্থক অনুবাদ করার জন্য ইংরাজী ও বাংলা এই দুটি ভাষাতেই বেশ ভাল রকম দখল থাকা প্রয়োজন। অথচ নবম ও দশম শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র ইংরাজা ও বাংলা ভাষায় এতখানি দক্ষতা অর্জন করে না যে তারা একটি অজানা ইংরাজী অনুচ্ছেদের সাবলীল বাংলা অনুবাদ করতে সক্ষম হবে।

১৯৭৪ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার যে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে তাতে নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজীর জন্য ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্বে এক সময় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ইংরাজীর জন্য ২৫০ নম্বর বরাদ্দ ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে অতি সঙ্গতভাবেই ইংরাজী ভাষার চর্চাকে কিছুটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে ইংরাজী ভাষার জ্ঞানের মাত্রা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। অতএব ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারটি বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রের কাছে স্বাভাবিক-কারণেই দুরূহ বলে মনে হচ্ছে। যে-কোন শিক্ষকের বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

আলোচ্য উক্তিটিতে ভাষাশিক্ষায় পক্ষে অনুবাদের আবশ্যকতার কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় অভিমতের পিছনে যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলি হল—(১) জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি আমাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না পারলে আমাদের উন্নতি ঘটা সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বইগুলি ইংরাজী ভাষায় লেখা। ইংরাজী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমেই কেবল ঐসব বিষয় সম্পর্কিত তথ্যগুলি আমাদের দেশের সমস্ত অধিবাসীর কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব। কাজেই এদেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকে প্রসারিত করার জন্য ছাত্রদের অনুবাদের কলা-কৌশলগুলি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। (২) ইংরাজী তথা বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষিত নাগরিকদের পরিচয় ঘটাতে হ'লে অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের জগতে অনুবাদ-সাহিত্য বর্তমানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। অনুবাদ-সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে অনুবাদ-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন। (৩) বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু দেশী ও বিদেশী ভাষার শব্দ গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। কেবল শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রেই নয় বাক্য গঠন কৌশল, রচনা-কৌশল, বাগ্‌ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা অন্যান্য ভাষা বিশেষ ক'রে ইংরাজী ভাষার দ্বারা

বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ইংরাজী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত কোন কোন ভাবকে সঠিকভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই জাতীয় অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা থেকেই ক্রমশঃ বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অনুবাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের সীমাবদ্ধতাগুলি জানা যায় এবং সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা যায়। কাজেই বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদের স্থান থাকা উচিত। (৪) জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খবর সংগ্রহ ক'রে বাংলা ভাষায় প্রচার করার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ ক'রে সাংবাদিকদের কাজকর্মে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কাজকর্মেও অনেক ক্ষেত্রে ইংরাজী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাশিক্ষার সহায়ক হিসাবে ছাত্রদের ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ অভ্যাস করানোর যে কিছুটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না।

এখন অনুবাদ শিক্ষাদানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ**, ইংরাজী ভাষাশিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হলে তবেই অনুবাদ শেখানো আরম্ভ করা উচিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে নবম শ্রেণী থেকে অনুবাদ শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরাজী বাক্যের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মায় এবং তাদের জানা ইংরাজী শব্দের সংখ্যাও অনুবাদের কাজ করার পক্ষে একেবারে কম থাকে না। তাছাড়া বাংলা ভাষাতেও মোটামুটিভাবে তাদের কিছুটা দখল জন্মায়। কাজেই নবম শ্রেণী থেকে অনুবাদ শেখানোর ব্যবস্থা করলে কিছুটা সুফল আশা করা যেতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, প্রথমে ইংরাজী পাঠ্যবই থেকে ছাত্রদের বাংলা অনুবাদ করতে দিতে হবে। এইভাবে কিছুটা অনুবাদের চর্চা করার পর দ্রুতপঠনের বই কিংবা ছাত্রদের উপযোগী অন্য কোন বই থেকে অনুবাদ শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ ছাত্রদের ইংরাজী শেখার অগ্রগতির সঙ্গে অনুবাদ শেখানোর একটা সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতে হবে। **তৃতীয়তঃ**, অনুবাদ শেখানোর সময় ইংরাজী ও বাংলা ভাষার বাক্যরীতি পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই উভয়রীতির পার্থক্য ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে হবে। অনুবাদ করার সময় ছাত্রেরা যাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীকে লঙ্ঘন না ক'রে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। **চতুর্থতঃ**, আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও রসানুবাদের মধ্যে বিদ্যালয় স্তরে প্রথম দুপ্রকার অনুবাদের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ইংরাজী বাক্যের প্রকাশভঙ্গীকে অনুসরণ করা হয়; আর ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্যকে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়, সেখানে ছাত্রদের ভাবানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলতে হবে।

রসানুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদকে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে রসানুবাদ প্রত্যাশা করাটা ভুল হবে।

ছাত্রদের অনুবাদ শেখানোর জন্য নিম্নলিখিতভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করা যেতে পারে :—

উদ্দেশ্য : (ক) প্রত্যক্ষ—প্রদত্ত ইংরাজী অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

(খ) পরোক্ষ—ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং অনুবাদের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করা।

আয়োজন : (ক) কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা।

(খ) ইংরাজী অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়ে পাঠঘোষণা করা।

উপস্থাপন : (ক) ইংরাজী অনুচ্ছেদটি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং শিক্ষক সেটি সরবে পাঠ করবেন।

(খ) প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের অজানা শব্দগুলি জেনে নিয়ে শিক্ষক সেগুলির অর্থ বোর্ডে লিখে দেবেন এবং যেসব অংশের আক্ষরিক অনুবাদ করা যাবে না সেগুলির ভাবানুবাদ করতে ছাত্রদের সাহায্য করবেন।

(গ) শিক্ষক দু তিনটি বাক্য ছাত্রদের দ্বারা অনুবাদ করাবেন এবং অনুবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। অনূদিত বাক্যগুলি ছাত্রেরা বোর্ডে লিখবে।

অভিযোজন : (ক) বোর্ডের লেখা মুছে দিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি নিজ নিজ খাতায় অনুবাদ করতে বলবেন, তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন।

(খ) শিক্ষক ছাত্রদের ত্রুটিগুলি সংশোধন ক'রে দেবেন এবং তাদের অনুবাদের দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের অনুবাদ শেখালে তারা অনুবাদের কলাকৌশলগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারবে।

॥ অনুশীলনী ॥

॥ ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

১। ব্যাকরণের পাঠকে কিরূপে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা যায় সে বিষয়ে আপনার অভিমত দৃষ্টান্ত ও যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করুন। [C. U. B. Ed. 1978]

২। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ পাঠের যথার্থ উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করুন এবং সাহিত্য-বিষয়ক পাঠদানে ব্যাকরণের স্থান নির্দেশ করুন। [C. U. B. Ed. 1975]

৩। বাংলা ব্যাকরণ পড়াইবার প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতির সহিত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির তুলনা করুন। [C. U. B. Ed. 1972]

৪। ব্যাকরণ পড়াইবার উদ্দেশ্য কি? বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যাপারে কি ধরনের সমস্যা আসিয়া থাকে? ব্যাকরণ পড়াইবার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1970]

৫। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহযোগে ব্যক্ত করুন। [C. U. B. T. 1969]

৬। ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? সাহিত্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণ সম্পর্কে যে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়, ছাত্রদের পক্ষে তাহাই কি পর্যাপ্ত অথবা ব্যাকরণ বিষয়ে তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিয়মিত শিক্ষাদান আবশ্যক? যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে আপনার মত ব্যক্ত করুন। [C. U. B. T. 1960]

৭। ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা কি? বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? [N. B. U. B. T. 1969]

৮। বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ব্যাকরণ পৃথকভাবে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে কি? কোন্ পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইতে পারে? যুক্তিসহকারে তাহা লিখুন। [B. U. B. Ed. 1972]

৯। ব্যাকরণ শেখানো কোন্ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করা উচিত? এ পাঠদানকে সরস করতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন। [B. U. B. T. 1969]

১০। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ পড়ানোর উদ্দেশ্য কি? উভয়ের কোন্ কোন্ দিক্ বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ স্তরে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া লিখুন। [B. U. B. T. 1965]

১১। মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ-পাঠের আবশ্যকতা কি? বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন, উদাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1973]

১২। মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1974]

১৩। বাংলা ব্যাকরণ পড়াইবার আধুনিক প্রণালী কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1965]

॥ রচনা শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি ॥

১৪। বাংলা রচনা শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একজন ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে আপনি যে নীতি-পদ্ধতিকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ বলিয়া মনে করেন তৎসম্পর্কে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করুন। [C. U. B. Ed. 1976]

১৫। বাংলা-রচনার দোষগুণ ও রচনা শিক্ষাদানের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1973]

১৬। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা রচনা-শিক্ষা সাধারণতঃ কিভাবে হয়? কিভাবে শিক্ষা দিলে রচনা-শিক্ষা সার্থক হইতে পারে বুঝাইয়া লিখুন। [B. U. B. Bd. 1972]

১৭। রচনা শেখাতে গিয়ে শিক্ষকের কোন্ কোন্ দিকে অবহিত থাকা উচিত? ছাত্রদের দিয়ে কোন একটি রচনা লিখিয়ে নেবার পর সেই লেখাগুলি শিক্ষক কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রেখে দেখে দেবেন? [B. U. B. T. 1971]

১৮। শ্রেণীকক্ষের কিরূপ পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং গ্রন্থাগারের সাহায্য লইবার মতো কিরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে শিক্ষার্থীদের রচনা-শিক্ষা ফলপ্রসূ করা যায়? [B. U. B. T. 1965]

১৯। প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধের বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য-বিচারের জন্য কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখিবে? রচনা লেখা শিখাইবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কি বিশ্লেষণ করুন। [B. U. B. T. 1968]

২০। প্রবন্ধ-রচনার দোষগুণ কি কি? রচনা শিখাইবার জন্য কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন? তাই বিশদভাবে বর্ণনা করুন। [K. U. B. Ed. 8972]

২১। ভাষা-শিক্ষা ও রসবোধের পক্ষে রচনা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি? রচনা-লিখন-শিক্ষা দেবার উৎকৃষ্ট প্রণালী কি? [K. U. B, Ed. 1968]

২২। রচনা শিখাইবার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি তাহা বিশদভাবে আলোচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1966]

২৩। রচনার দোষগুণ কি কি? আপনার মতে বাংলা রচনা শিখাইবার মূল নীতি ও পদ্ধতি কি হওয়া উচিত? [N. B. U. B. T. 1969]

২৪। সাহিত্যের প্রশ্নে এবং আলোচনার এই ইংরেজী শব্দগুলি প্রায় ব্যবহৃত হয়—Summary, Substance, Central, Idea, Paraphrase, Amplification.—এই শব্দগুলি বাংলা প্রতিশব্দ দিন। যদি কোন প্রচলিত প্রতিশব্দ আপনি পছন্দ না করেন, তৎপরিবর্তে আপনার মনোমত প্রতিশব্দ প্রস্তাব করুন। রচনা-শিক্ষার পক্ষে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কোন্‌টির উপযোগিতা কিরূপ, তাহা সংক্ষেপে বিচার করুন। [C. U. B. T. 1962, B. U. B. T. 1967]

॥ বানান-সমস্যা ও তার প্রতিকার ॥

২৫। 'শিক্ষার্থীদের বানান-ভুল ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌল সমস্যা, কিন্তু ইহার প্রতিকার সাধ্য।'—উক্তিটি সম্পর্কে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1976]

২৬। সাধারণতঃ কি কি কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখায় বানান ভুল হয়? বানান ভুল নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে—তাহা আলোচনা করুন। শুদ্ধ বানান শিক্ষা দিবার পদ্ধতিগুলিও বিশদভাবে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1978]

২৭। ছাত্র-ছাত্রী যেসব বানান ভুল করিয়া থাকে সেগুলির কারণ নির্ণয় করুন। বানান শিখাইতে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন? [C. U. B. Ed. 1970]

২৮। বাংলা বানান সম্পর্কে যে সমস্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়, তাহার স্বরূপটি কি বিশদভাবে বিবৃত করিয়া উহার সমাধানে পথ নির্দেশ করুন। [C. U. B. T. 1965]

২৯। আজকাল ছাত্রদের রচনায় বহু বানান-ভুল দেখা যায়। ইহার কারণ কি? শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। [C. U. B. T. 1961]

৩০। ছাত্রদের রচনায় সাধারণতঃ কি কি কারণে বর্ণাশুদ্ধি ঘটে এবং কি উপায়ে তা প্রতিকার করা যায় সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [C. U. B. T. 1960]

৩১। বাংলা ভাষার বানান সম্পর্কে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে কেন? এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে? [K. U. B. Ed. 1972]

৩২। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ কি কি কারণে বানান-ভুল হয়? কি উপায়ে এই ত্রুটি নিবারণ করা যায়? [B. U. B. Ed. 1972]

৩৩। মাতৃভাষা বাংলাতেও বানান-ভুল হয় কেন? বর্ণাশুদ্ধি দূর করিবার কোন্ কোন্ উপায় উল্লেখযোগ্য? কোন্ মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বানান শিক্ষা দেওয়া উচিত? [B. U. B. T. 1966]

৩৪। বাংলা বানান-সমস্যা ও ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তিসহ ব্যক্ত করুন। [N. B. U. B. T. 1969]

৩৫। বাংলা-বানান সম্পর্কে যে সমস্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়, তাহার স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করুন। [K. U. B. Ed. 1968]

৩৬। বানান-সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া বাঙলা বানান বিধির যে সংস্কার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রচলিত রীতির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করুন। [K. U. B. Ed. 1967]

৩৭। কি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের রচনায় বানান-ভুল ঘটিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিকারের উপায় হিসাবে হিসাবে কি করা যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করুন। [K. U. B. Ed. 1966]

৩৮। বাংলা ভাষায় বানানজনিত কি কি বাস্তব অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে? এই প্রসঙ্গে বাংলা বানান সংস্কারের কিরূপ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে? সমস্যাটি সম্পর্কে আপনার যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করুন।

॥ শ্রুতিলিখন ও হস্তাক্ষর শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

৩৯। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কার্যতালিকায় 'শ্রুতিলিখন' ব্যবস্থা থাকিবার কারণ কি? বানান শিখাইতে কিরূপ 'শ্রুতিলিখন পদ্ধতি' অবলম্বন করিবেন তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচনা করুন।
[B. U. B. T. 1963]

৪০। শিশুদের লিখন-বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক তাহাদের হস্তলিপি অনুশীলন কিভাবে করান যায় তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করুন। [K. U. B. Ed. 1967]

॥ অনুবাদ শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

৪১। ভাষা শিক্ষার পক্ষে অনুবাদ চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার অভিমত যুক্তি সহযোগে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন। [C. U. B. T. 1963]

৪২। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবাদচর্চা গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে দুই বৎসরকাল এই অনুবাদ প্রত্যানুবাদের পন্থা ধরে ভাষা-ব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় তাহলে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।"—এই মন্তব্যের আলোকে অনুবাদকে ইংরেজি ও বাংলা উভয় বিষয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত বিবৃত করুন। [C. U. B. T. 1866]

৪৩। বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াইবার সময় ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদের অভ্যাস করাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা কারণসহ আলোচনা করুন। [C. U. B. T. 1963]

৪৪। অনুবাদ শেখানোর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ শেখাবার সময় কোন্ কোন্ দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত? [B.U. B. Ed. 1970]

৪৫। মাতৃভাষা-শিক্ষায় অনুবাদশিক্ষার স্থান নির্দেশ কর। কোন্ স্তরে এই কাজ আরম্ভ করিবেন এবং তাহার পর শ্রেণীতে শ্রেণীতে ইহা কি পদ্ধতিতে শিখাইবেন সংক্ষেপে লিখুন। [B. U. B. Bd. 1967]

৬

সাহিত্যিক কার্যাবলী :

[Literary Activities : Dramatisation and role playing, dramatic reading, literary clubs, wall newspaper, bulletin boards, collections and albums, class and school magazines.]

নাট্যরূপ প্রদান ও ভূমিকা অভিনয়, নাটকীয় পঠন, সাহিত্য-সভ্য, দেওয়াল সংবাদপত্রিকা, বুলেটিন বোর্ড, সংগ্রহ ও আলেখ্য-পুস্তক, শ্রেণী ও বিদ্যালয় পত্রিকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ।

॥ সাহিত্যিক কার্যাবলী ॥

১॥ ছাত্রগণের সাহিত্যরসোপলব্ধির সহায়করূপে নাটকাভিনয়, নাটক-আবৃত্তি, গল্প-উপন্যাস নাট্যকরণ, সাহিত্য-বৈঠক, প্রাচীরপত্র-রচনা, চিত্রাদি সংগ্রহ ও সংকলন, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যিক কার্যাবলীর উপযোগিতা কতখানি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করুন; বর্তমান সময়ে শিক্ষকগণের পক্ষে তাহাদের নির্ধারিত কর্তব্য সমাপনের পর এ বিষয়ে ছাত্রগণকে কতখানি সাহায্য করা সম্ভব তাহাও আলোচনা করিয়া দেখান;

[C. U. B. T. 1967]

উত্তর : মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের আবেগের প্রশিক্ষণ এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মানুষের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য-সম্ভোগের একটি চিরন্তন আকাঙ্খা রয়েছে। এই মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবনই হচ্ছে এইসব কাব্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির প্রধান উপজীব্য বিষয়। কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করা এবং তার রসোপলব্ধির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ছাত্রদের সৌন্দর্য-সম্ভোগের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটে, অপরদিকে তেমনি তাদের মধ্যে উন্নত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের সৃষ্টি হয় এবং তাদের চরিত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য ছাত্রদের মানস-জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্য কোন ভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য তা পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথিগতভাবে কাব্য ও সাহিত্য পাঠ করার মধ্য দিয়েই ছাত্রেরা সবসময় যথাযথভাবে কাব্য ও সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া পরীক্ষা-ব্যবস্থার চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে কাব্য ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের উপযোগী পাঠদান করা

সম্ভবপর হয় না। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের সাহিত্যরসোপলব্ধির সহায়করূপে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রচলন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইসব কার্যাবলীর মধ্যে নাটকাভিনয়, নাটক-আবৃত্তি, গল্প-উপন্যাস নাট্যীকরণ, সাহিত্য-বৈঠক, প্রাচীরপত্র-রচনা, চিত্রাদি সংগ্রহ ও সংকলন, মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য-সভ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিচে এইসব সাহিত্যিক কার্যাবলীর উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল:

॥ এক ॥ **নাটকাভিনয় (Histrionics)**—বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাহিত্য-রসোপলব্ধির সহায়করূপে নাটকাভিনয়ের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য ছাত্রদের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং অভিনেতা ও দর্শকদের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাটক সাফল্যমণ্ডিত হয়। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণের জন্য ছাত্রদের চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয় এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে নাটকটির আবেদন সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই নাটকাভিনয় সাফল্য লাভ করে। এইভাবে নাটকে অংশ গ্রহণ ক'রে এবং নাটক দেখে ছাত্রেরা নাটকে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং নাট্য-সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে।

॥ দুই ॥ **নাটক-আবৃত্তি (Dramatic reading)**—কোন বড় নাটকের অংশবিশেষ কিংবা কোন কাব্য-নাট্য যখন উপযুক্ত ভাবাবেগ এবং কণ্ঠস্বরের উঠা-নামা সহ পাঠ করা হয় তখন তাকে নাটক-আবৃত্তি বলে। নাটক-আবৃত্তির জন্য পাঠকের স্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা এবং নিজ কণ্ঠস্বরের উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে পাঠককে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগের স্বরূপকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তা না হলে সে কখনই নাটক-আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে নাট্যাংশের আবেদন সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারবে না। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নাটক আবৃত্তি করার শিক্ষা দিলে তারা আরও ভালভাবে নাট্যাংশের অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার ফলে সামগ্রিকভাবে তাদের সাহিত্যরসোপলব্ধির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

॥ তিন ॥ **গল্প-উপন্যাস নাট্যীকরণ (Dramatization of stroties and fictions)**—গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে মানবজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেওয়া থাকে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধরনের গল্প ও উপন্যাসের অংশ নির্বাচন করা হয়। এইসব গল্প ও উপন্যাসের অংশ পাঠ ক'রে ছাত্রেরা মানবজীবন সংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করে। যদি ছাত্রদের গল্প কিংবা উপন্যাসের অংশবিশেষে বর্ণিত কোন ঘটনার নাট্যরূপ দিতে বলা হয় তাহলে তাদের ঐ ঘটনার স্বরূপটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং বর্ণনার পরিবর্তে সংলাপ রচনার মাধ্যমে ঘটনাটিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে গল্প-উপন্যাসের নাট্রীকরণের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা আরও ভালভাবে সাহিত্যরস উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

॥ চার ॥ **সাহিত্য-বৈঠক** (Literary sitting)—সাহিত্য সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাহিত্য-বৈঠক বলে। বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মাঝে এই জাতীয় বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন। সাহিত্য-বৈঠকে ছাত্রদের উপযোগী সাহিত্য সম্পর্কিত যে-কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ; যেমন, কোন ছোটগল্প কিংবা কোন কবিতার রসাস্বাদনমূলক আলোচনা ; কোন চরিত্র-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ; কোন নাট্যাংশের নাটকীয়তা বিচার প্রভৃতি। সাহিত্য-শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্রেরা এইসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে ; প্রয়োজনবোধে শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন। সাহিত্য-বৈঠকে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হবে এবং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহিত্য-রসাস্বাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

॥ পাঁচ ॥ **প্রাচীর পত্র বা দেওয়াল-পত্রিকা** (Wall Magazine)—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা এক বা একাধিক প্রাচীর পত্র প্রকাশ করতে পারে। প্রাচীর পত্র মাসিক কিংবা পাক্ষিক হতে পারে। প্রাচীর পত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রাচীর পত্র হাতে লিখে প্রকাশ করা হয় এবং ছাত্রদের আঁকা ছবি ও নক্সা দিয়ে এটিকে অলঙ্কৃত করা হয়। প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে ছাত্রদের সাহিত্য-চর্চার পথ প্রশস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রাচীর পত্র যে ছাত্রদের সাহিত্যরসোপলব্ধিতেও বিশেষ সহায়তা করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীর পত্রে প্রকাশিত ভাল ভাল রচনাগুলিকে বার্ষিক মুদ্রিত পত্রিকায় স্থান দিয়ে এইসব রচনার লেখকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করা যেতে পারে।

॥ ছয় ॥ **চিত্রাদি সংগ্রহ ও সংকলন** (Albums and Collection Books)—ছাত্রেরা যাতে প্রত্যেকে একটি করে চিত্রসংগ্রহ পুস্তিকা এবং একটি করে সংকলন গ্রন্থ তৈরী করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। চিত্রসংগ্রহ পুস্তিকায় ছাত্রেরা বিভিন্ন ধরনের ছবি সংগ্রহ করবে এবং ছবিগুলির পাশে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখে রাখবে। ছাত্রদের সংগৃহীত ছবিগুলির সঙ্গে তাদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন রচনার কিংবা যে-কোন গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংযোগ থাকলে ভাল হয়। সংকলন গ্রন্থে ছাত্রেরা তাদের ভাল-লাগা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদির লাইনগুলি টুকে রাখবে। এইভাবে চিত্রসংগ্রহ পুস্তিকা ও সংকলন গ্রন্থ তৈরী করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সাহিত্য-পাঠের এবং সাহিত্যরসোপলব্ধির আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে উন্নত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের সৃষ্টি হবে।

॥ সাত ॥ **মুদ্রিত পত্রিকা** (Printed Magazine)—প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বছরে একটি মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পত্রিকায় ছাত্রদের লেখা নির্বাচন করার সময় রচনার মানের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ মুদ্রিত পত্রিকা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষাগত মানের অনেকখানি পরিচয় বহন করে।

মুদ্রিত পত্রিকায় যেসব ছাত্রের রচনা প্রকাশের জন্য মনোনীত হয় স্বভাবতঃই তারা নিজেদের সাহিত্য কৃতি সম্পর্কে কিছুটা আত্মবিশ্বাস লাভ করে এবং আরও ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহিত হয়। এই সব ছাত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রেরাও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করে। তাছাড়া মুদ্রিত পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে ছাত্ররা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ লাভ করে।

॥ আট ॥ **সাহিত্য সঙ্ঘ** (Literary Club)—সাহিত্য-চর্চার জন্য ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যালয়ে এক কিংবা একাধিক সাহিত্য-সঙ্ঘ কিংবা সাহিত্য-চক্র (Literary Circle) গঠন করা যেতে পারে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সাহিত্য সঙ্ঘের বৈঠক আহ্বান করতে হবে। এই বৈঠকে ছাত্রেরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, স্বরচিত কবিতা-পাঠ, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সাহিত্য-রসসিক্ত পরিবেশ গ'ড়ে তুলবে। এইভাবে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে সাহিত্য-চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মনে সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি হবে। সাহিত্য-সঙ্ঘের নিজস্ব দেওয়াল পত্রিকা, হাতে-লেখা পত্রিকা ইত্যাদি থাকবে এবং সঙ্ঘ মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহিত্যালোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ করবে। এছাড়াও সঙ্ঘ বিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

॥ নয় ॥ **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান** (Social Function)—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মহাপুরুষদের জয়ন্তীকে কেন্দ্র ক'রে কিংবা পুরস্কার-বিতরণ, বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এইসব অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হল এতে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকেই অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং তার ফলে অনুষ্ঠানের সাফল্য-অসাফল্যের সঙ্গে প্রত্যেকেরই একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠান ছাত্রদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং তাদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করে।

[এই অধ্যায়ের শুরুতে **আবৃত্তি, বাগ্মিতা, বিতর্ক ও আলোচনা**—এই চারিটি কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

সাহিত্যিক কার্যাবলীর অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের ভূমিকা ঃ

বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকদের প্রধানতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পঠন-পাঠনকার্যেই ব্যস্ত থাকতে হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার উপর পরীক্ষার চাপ খুব বেশি থাকায় শিক্ষকেরা পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে কোন কাজ করতে বিশেষ উৎসাহবোধ করেন না। কিন্তু শিক্ষকদের যদি উৎসাহ থাকে তাহলে তাঁদের পক্ষে তাঁদের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁরা বিভিন্ন সাহিত্যিক কার্যাবলীর অনুশীলনে ছাত্রদের যথেষ্ট পরিমানে সাহায্য করতে পারেন। সময়ের

অভাবের চেয়ে উদ্যোগের অভাবই শিক্ষকদের এইসব কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন তাহলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রেরাই উপরি উক্ত কাজকর্মগুলি সম্পাদন করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের পক্ষেও এই কাজকর্মগুলি অনেক সহজসাধ্য হয়ে যায়।

॥ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ [Teaching Aids] ॥

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিশুকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশু-শিক্ষার পরিবেশ রচনার উপর বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু ছিল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই ছিল সবচেয়ে বেশী। সেইজন্য কোন বিষয়কে শিশুর নিকট আকর্ষনীয় ক'রে তোলার কোন প্রয়োজন তখন অনুভূত হয়নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় কোন বিষয়কে শিশুর নিকট উপস্থাপিত করার সময় সেটি তার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। শিক্ষাবিদেরা গবেষণার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছেন যে যদিও পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই শিশুরা তাদের জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে তথাপি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আবেদন তাদের কাছে সবচেয়ে বেশী। সেইজন্য কোন পঠনীয় বিষয় এমনভাবে শিশুর নিকট উপস্থাপিত করা প্রয়োজন যাতে তার দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঐ বিষয়ের আবেদন সরাসরি তার মনের মধ্যে গিয়ে পৌছায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের সাহায্যে পঠনীয় বিষয়গুলিকে শিশুর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হয়। বিশেষ ক'রে নিম্নশ্রেণীর শিশুদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য যে অপরিহার্য সেকথা সব শিক্ষাবিদেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সেইজন্য আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় এইজাতীয় উপকরণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের জন্য যেসব শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এই উপকরণগুলির শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১। **দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ** (Visual Aids),
২। **শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ** (Audio Aids), এবং
৩। **দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর উপকরণ** (Audio-Visual Aids)

যেসব উপকরণের আবেদন প্রধাণতঃ শিশুর দৃষ্টিশক্তির কাছে সেগুলি হল দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ ; যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি, মডেল, চার্ট, নক্সা, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ফিল্ম-প্রজেকটার প্রভৃতি। আর যেসব উপকরণের আবেদন প্রধানতঃ শিশুর শ্রবণশক্তির কাছে সেগুলি হল শ্রুতিনির্ভর উপকরণ ; যেমন—রেডিও, গ্রামোফোন, টেপ্-রেকর্ডার প্রভৃতি। আবার এমন কতকগুলি উপকরণ আছে। যেগুলি একই সঙ্গে দৃষ্টি নির্ভর এবং শ্রুতিনির্ভর ; যেমন—সবাক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, বিতর্ক, অভিনয়, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি।

দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ হিসাবে ছবি শিশুমনের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে দেখা যাক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "বাংলাদেশ" কবিতাটি পড়াবার সময় কবিতাটিতে বাংলাদেশের সৌন্দর্যের যে বর্ণনা আছে তার একটি চিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে। এই চিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর রূপটি অনায়াসেই শিশুর চোখের সামনে তুলে ধরা যায়। চিত্রটি রঙীন হলে সবচেয়ে ভাল হয়। এইরূপ চিত্র সহজেই ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের মনোরম রূপটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শুনে তারা বাংলাদেশের গৌরবের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে। নিছক মৌখিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা শিশু মনে উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ বিমূর্ত (abstract) বিষয় অপেক্ষা মূর্ত (concrete) বিষয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শ্রুতিনির্ভর উপকরণও দৃষ্টিনির্ভর উপকরণের ন্যায় শিশুমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ রেডিওর কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে আকাশবানী কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নানারূপ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এইসব অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শিশুদের নিকট খুবই আকর্ষনীয় হয়ে উঠতে পারে। ভ্রমণকাহিনী, শিক্ষামূলক গল্প, নাটক প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা রেডিওর মাধ্যমে পরিবেশিত হলে শিশুরা সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ঐসব অনুষ্ঠানগুলি তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে।

যেসব উপকরণগুলি একই সঙ্গে দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর শিশুদের মনের উপর সেগুলির প্রভাব আরও বেশি। উদাহরণস্বরূপ সবাক-চলচ্চিত্রের কথা বলা যেতে পারে। সবাক চলচ্চিত্রে শিশু বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। কাজেই চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত বিষয়বস্তুকে যদি শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচন করা যায় তাহলে তা শিশু মনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শিশু চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে মহাপুরুষদের জীবন, শিক্ষামূলক গল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এইসব বিষয় যথাযথভাবে পরিবেশিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষাকে শিশুদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষনীয় ও সজীব ক'রে তোলা সম্ভবপর হবে। এই জাতীয় উপকরণের মধ্যে টেলিভিশন, বিতর্ক, আবৃত্তি এবং অভিনয় ও বাংলা

ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নশ্রেণীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে অনুকূল পরিবেশ রচনার প্রয়োজনোপযোগী কী কী ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করার পক্ষপাতী তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।
[C. U. B. Ed. 1979]

২। মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকা বিচার প্রসঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক উপায় ও কার্য-সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। [C. U, B. Ed. 1975]

৩। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীগণের সৃজনশীল মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত করিবার জন্য সাহিত্যের শিক্ষক সাহিত্যিক কার্যাবলী কিভাবে সংগঠিত করিতে পারেন তাহা আলোচনা করুন।
[C. U. B. Ed. 1973]

৪। মাতৃভাষা ও সাহিত্যচর্চার বহুমুখী উদ্দেশ্য যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে তাহার জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীর উপর নির্ভর না করিয়া বিদ্যালয়ে সহপাঠ্য-কর্মসূচী প্রবর্তন করিতে হইবে— এই উক্তিটির সারবত্তা ব্যক্ত করুন। ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল কি কি ধরনের সহপাঠ্যকর্মসূচী বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা সম্ভব ? [C. U. B. Ed. 1971]

৫। বিদ্যার্থীগণের রসোপলব্ধি ও চিৎপ্রকর্ষের সহায়তাকল্পে তাহাদের আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, প্রবন্ধলেখন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রসংগ্রহ, পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উদ্যোগে উৎসাহ দান করা আবশ্যক।— কেন আবশ্যক তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকগণের পক্ষে ছাত্রদিগকে এই উদ্যোগে কতটা উপযুক্ত করা সম্ভব তাহা আলোচনা করুন।
[C. U, B. T. 1969]

৬। এই রাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলিতে—বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে—নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের পঠনপাঠন ব্যতীত ছাত্রগণের সাহিত্যানুশীলনের অনুকূল আর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত এবং বর্তমান অবস্থায় সম্ভব, তাহা যুক্তিসহকারে বিবৃত করুন। [C. U. B. T. 1966]

৭। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কোন্ কোন্ উপায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় ? কয়েকটি উপায়ের আলোচনা করুন।
[C. U. B. T. 1966]

৮। শিক্ষণকালে বাংলা পড়াইতে যেসব উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1970]

৭ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
[Tests and Evaluation]

১।। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও মূল্যাঙ্কনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পরীক্ষা-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য যে-ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার দ্বারা ছাত্রদের যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটে না। কারণ প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় রচনাধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে তাতে পরীক্ষকের **ব্যক্তিগত অভিরুচি** (subjectivity) প্রকাশের এত বেশী সুযোগ রয়েছে যে তার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা যায় না। তাছাড়া এই জাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে যে যে বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাপ করতে চাওয়া হয় সেইসব বিষয় ছাড়াও অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার এইসব ত্রুটি দূর করার জন্য বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে **মূল্যায়ন** (**evaluation**) কথাটির আবির্ভাব ঘটেছে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য হল পরীক্ষায় ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও তথ্যমূলক জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়, আর মূল্যায়ণে ছাত্রদের বৌদ্ধিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের অগ্রগতির পরিমাপ করা হয়। পরিমাপের পদ্ধতির দিক দিয়েও পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রধানতঃ রচনা-ধর্মী প্রশ্নের (essay type question) মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন এবং তাঁদের অগ্রগতির পরিচায়ক বিভিন্ন নম্বর প্রদান করেন। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার পরিমাপ করার জন্য নানারকম **আদর্শায়িত অভীক্ষা** (Stan-

dardised tests) আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব অভীক্ষায় ছাত্রদের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য বিশেষ ধরনের প্রশ্নপত্র রচনা করা হয় যাতে উত্তরপত্র পরীক্ষা করার সময় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি (subjectivity) প্রকাশিত হওয়ার কোন অবকাশ না থাকে। এইসব অভীক্ষাগুলির মধ্যে **আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলি** (New Type Objective Tests) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রের যে বৌদ্ধিক যোগ্যতার পরিমাপ করা হয় তা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কিন্তু মূল্যায়নের পরিমাপ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। যে কোন বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল, নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity), নির্ভরযোগ্যতা (reliability), ও যথার্থতা (validity)। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশের কোন অবকাশ নেই বলে এর ফলাফল অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য এবং এই জাতীয় পরীক্ষায় কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরীক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। আধুনিক নৈব্যক্তিক অভীক্ষায় মূল্যায়নের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকখানি বর্তমান রয়েছে। **প্রথমতঃ**, আধুনিক অভীক্ষার প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার জন্য এই জাতীয় পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ফলে উত্তরপত্রগুলি যে-কোন পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হোক না কেন পরীক্ষার ফলাফলের কোন পরিবর্তন হয় না। এইদিক থেকে বিচার করলে আধুনিক অভীক্ষাগুলি যে নৈর্ব্যক্তিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই জাতীয় অভীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করার সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ অভীক্ষকের পছন্দমত বিষয়গুলি প্রশ্নপত্রে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। কাজেই আধুনিক অভীক্ষাকে পুরোপুরি নৈব্যক্তিক বলা চলে না। **দ্বিতীয়তঃ**, আধুনিক অভীক্ষার পরীক্ষার্থীরা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না বলে এর সাহায্যে তাদের জ্ঞান বা দক্ষতার নিখুঁত পরিমাপ করা সম্ভব হয়। সেইজন্য এই জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষায় অনেকক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা অনুমানের উপর নির্ভর করে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে আধুনিক অভীক্ষায় এই ত্রুটি অনেক পরিমাণে দূর করা সম্ভব হলেও কিছুটা ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ**, আধুনিক অভীক্ষায় যে-বিষয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করতে চাওয়া হয় সে বিষয় ছাড়া অন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরীক্ষিত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং এই জাতীয় অভীক্ষার যাথার্থ্য যে রচনাধর্মী পরীক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে অনেক সময় এমন সব মানসিক শক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় যেগুলি পরীক্ষার আওতার মধ্যে পড়ে না। এরূপ ক্ষেত্রে অভীক্ষার যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে না। তাছাড়া এই জাতীয় অভীক্ষায়

ছাত্রদের অর্জিত অনেক প্রকার দক্ষতা, যেমন—সাহিত্যের সৌন্দর্য-উপলব্ধি (appreciation), রচনাকুশলতা ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা, তুলনামূলক বিচারশক্তি (comparison), কল্পনাশক্তির প্রয়োগ (imagination) প্রভৃতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বিবেচনা করে বর্তমানে ছাত্রদের ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার অগ্রগতির যথাযথ পরিমাপ করবার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়—(১) লিখিত পরীক্ষা (written examination); (২) মৌখিক পরীক্ষা (oral test); (৩) প্রদত্ত কর্ম-সম্পাদনী পরীক্ষা (assignment test); (৪) ছাত্রদের সৃজনমূলক কর্ম-সম্পাদন পরীক্ষা (pupils creative activity test প্রভৃতি।

১। **লিখিত পরীক্ষা** (written examination)—লিখিত পরীক্ষা প্রধানতঃ দু প্রকারের হয়—(ক) রচনাধর্মী পরীক্ষা (essay type examination) এবং (খ) নৈব্যক্তিক পরীক্ষা (objective tests)। এই উভয়প্রকার পরীক্ষার সাহায্যে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়।

রচনাধর্মী পরীক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও ভাষাগত দক্ষতার পরিমাপ করা যায়। এছাড়া এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি (appreciation), রচনাকুশলতা ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা, তুলনামূলক বিচারশক্তি (comparison), কল্পনাশক্তির প্রয়োগ (imagination) প্রভৃতি যেভাবে পরিমাপ করা যায় অন্যান্য পদ্ধতিগুলির দ্বারা তা করা যায় না। এই জাতীয় পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি হল এই যে এতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে রচনাধর্মী পরীক্ষার কতকগুলি সুবিধাও আছে; যেমন, এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও খাতা দেখা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই জাতীয় পরীক্ষা পরিচালনা করা ও অপেক্ষাকৃত সহজ। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপারটিকে যথাসম্ভব খর্ব করে রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যবহার করতে পারলে এর দ্বারা ছাত্রদের পূর্বে উল্লিখিত যোগ্যতাগুলির যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভবপর হয়।

নৈব্যক্তিক পরীক্ষার বিশেষত্ব হল এই যে এতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রকাশের কোন স্থান নেই। সেইজন্য রচনাধর্মী পরীক্ষার চেয়ে নৈব্যক্তিক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (reliability) অনেক বেশী: নৈব্যক্তিক পরীক্ষা নানাধরনের হতে পারে, যেমন—

(১) **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় পরীক্ষা** (True-false Test): এই জাতীয় পরীক্ষায় কতকগুলি বাক্য দেওয়া থাকে। ছাত্রদের সত্য ও মিথ্যা বাক্যগুলিকে যথাক্রমে √ ও × চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে বলা হয়; যথা—

(ক) রবীন্দ্রনাথ একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। (খ) জল থেকে বরফ হয়।

(২) **সঠিক উত্তর নির্বাচন পরীক্ষা** (Multiple choice Test) : এই জাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রদের কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে বলা হয় ; যথা—

(ক) হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম—কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী, মাউণ্ট এভারেষ্ট।

(৩) **সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূরণ পরীক্ষা** (Completion Test) : এই জাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রদের বাক্যের অন্তর্গত শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয় ; যথা—

(ক) — পর শরৎকালের আগমন হয়।

(৪) **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান পরীক্ষা** (Short Answer Test) : এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এমনভাবে রচনা করা হয় যাতে তাদের উত্তরগুলি হয় খুব সংক্ষিপ্ত আকারের ; যথা—

(ক) গীতাঞ্জলী পুস্তকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (অনধিক ৫/৬ লাইন)

(৫) **সদৃশীকরণ পরীক্ষা** (Matching Test) : এই জাতীয় পরীক্ষায় দুটি সারিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে, ছাত্রদের সেগুলি সঠিকভাবে সাজিয়ে লিখতে বলা হয় ; যথা—

(ক) রবীন্দ্রনাথ……বৈজ্ঞানিক (খ) গ্রীষ্ম……কবি (গ) নিউটন……ঋতু (ঘ) গঙ্গা……পর্বত (ঙ) পূর্বঘাট……নদী

(৬) **স্মৃতিমন্থন পরীক্ষা** (Recall Test) : এই জাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় ; যথা—

(ক) 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির রচয়িতা কে ? ইত্যাদি।

উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি ছাড়াও ছাত্রদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য যেসব নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করা হয় তাদের মধ্যে বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা (Scholastic Test), প্রবণতার পরীক্ষা (Aptitude Test), কৃতিত্বের পরীক্ষা (Achievement Test) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৭) **রসানুভূতিমূলক পরীক্ষা** (Appreciation Test) : এইজাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রদের সাহিত্যরসোপলব্ধির পরিমাপ করা হয় ; যথা—

(ক) 'রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসে।' একথা কবি কেমনভাবে প্রকাশ করেছেন ? ['হাট' দ্বিতীয় স্তবক]

(খ) 'রাত্রি'র পরিবর্তে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ? [ঐ]

(গ) নিচে একটি প্রশ্ন এবং তার সম্ভাব্য কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে, তুমি যে উত্তরটি সবচেয়ে ভাল বলে মনে কর তার পাশে √ চিহ্ন দাও ; ইত্যাদি।

২। **মৌখিক পরীক্ষা** (Oral test)—মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের পঠন-ক্ষমতা, উচ্চারণ-ভঙ্গী, কথ্য ভাষার উপর দখল, স্মরণশক্তি ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়। লিখিত পরীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত দক্ষতাগুলির পরিমাপ করা সম্ভবপর নয় বলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। **প্রদত্ত কর্মসম্পাদনী পরীক্ষা** (Assignment test)ঃ এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের এমন সব প্রশ্নের উত্তর তৈরী করতে বলা হয় যার জন্য তাদের বিভিন্ন সাহায্যকারী পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ছাত্রদের উত্তরগুলি পরীক্ষা করলে তা থেকে তাদের সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষমতা ও স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি পরিমাপ করতে এই জাতীয় পরীক্ষার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

৪। **ছাত্রদের সৃজনমূলক কর্ম-সম্পাদন পরীক্ষা** (Pupils creative activity test)—এই জাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-সৃজনমূলক কর্মের মূল্যায়ন করে তা থেকে তাদের ভাষা ও সাহিত্য রচনার দক্ষতার পরিমাপ করা হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

১। ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার কোন্ কোন্ স্থলে নৈব্যক্তিক প্রশ্ন সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে? বিভিন্নপ্রকার প্রশ্নাদি উল্লেখ করিয়া আলোচনা করুন। (N. B. U. B. T. 1968)

॥ পাঠটীকা ॥

[Lesson Plan]

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য নানাবিধ শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয়কে কিভাবে শিশুর নিকট উপস্থাপিত করলে সে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে, সে সম্পর্কে গবেষণার শেষ নেই। বিদ্যালয়ে পাঠদানের যে গতানুগতিক রীতি প্রচলিত আছে তাতে শিক্ষকের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণতঃ শিক্ষক বক্তা এবং ছাত্র শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষকের ভূমিকাই এক্ষেত্রে মুখ্য আর ছাত্রের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার জন এডাম্‌স্‌-এর ভাষায় "Education is a bi-polar process." অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এর একদিকে রয়েছেন শিক্ষক, অপরদিকে রয়েছে শিক্ষার্থী। শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারে তারজন্য শিক্ষককে এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা (lesson plan) রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হতে পারে। শিক্ষার এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সার্থক পাঠের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ থাকা উচিত। এই লক্ষণগুলি নিম্নরূপ :

১। **সার্থক পাঠ সর্বদা শ্রেণীর উপযুক্ত হবে**—বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে বিষয়টি সহজবোধ্য নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট তা কঠিন বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আবার একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে গ্রহণক্ষমতার অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকতে পারে। শ্রেণীর মধ্যে মেধাবী ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতা বেশী আর পশ্চাৎপদ ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতা কম। কাজেই পাঠদানের সময় শিক্ষককে শ্রেণীর সকল ছাত্রের গ্রহণক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের সাহায্যে তা এমনভাবে তাদের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে যাতে ঐ বিষয়বস্তু তাদের নিকট সহজবোধ্য হয়।

২। **সার্থক পাঠের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হবে**—আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা। ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি না হলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদান করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে ছাত্রদের মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করা যায় তাহলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদান করা সহজসাধ্য হয়, অপরদিকে তেমনি ছাত্ররাও পড়াশুনায় যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারে। সেইজন্য যে পাঠের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে যতবেশী আগ্রহের সঞ্চার হবে সেই পাঠ তত বেশী সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

৩। **সার্থক পাঠে ছাত্রেরা অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করবে**—আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রেরা সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। "Learning by doing" অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করাই হল আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলনীতি। ছাত্রেরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণ করতে পারে তারজন্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষককে এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে যাতে ছাত্রেরা অধিক পরিমাণে পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত হয় তাহলে তাকে শিক্ষা-দানের সকল আয়োজনই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৪। **সার্থক পাঠে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হবে**—আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র (individual difference) অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ছাত্রকে তার আপন গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়াই আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে হবে। যে পাঠের দ্বারা প্রতিটি ছাত্র কিছু-না-কিছু শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাকেই আমরা সার্থক পাঠ আখ্যা দিতে পারি।

৫। **সার্থক পাঠে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসৃত হবে**—মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিতর্কের বাঁধাধরা পথ পরিত্যাগ করে শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীর নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহবোধকে উদ্দীপিত করে তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির লক্ষ্য।

সার্থক পাঠের উপরি উক্ত লক্ষণগুলির কথা মনে রেখে আমাদের এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদান করতে হবে যাতে তা বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে সার্থক পাঠদান করতে হলে আমাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ হার্বার্টের (Herbart) শিক্ষণতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ হার্বার্টের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। হার্বার্টের শিক্ষা-দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পূর্ব-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা ভাবজটের (apperceptive mass) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নতুন পাঠদান করার উপর পাঠের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই মতবাদ অনুযায়ী তিনি পাঠদান প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত চারটি সোপানে ভাগ করেছেন—(১) স্পষ্টতা (clearness); (২) সংযোগ (association); (৩) পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা (system); এবং (৪) পদ্ধতি (method)। হার্বার্টের এই শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে পাঠদান প্রক্রিয়াকে **আয়োজন** (preparation), **উপস্থাপন** (presentation) এবং **অভিযোজন** (application)—এই তিনটি সোপানে ভাগ করা হয়েছে।

কোন বিষয়ের উপর পাঠটীকা রচনা করার সময় পাঠের উদ্দেশ্য কি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কারণ পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তিনি সার্থকভাবে পাঠদান করতে ব্যর্থ হবেন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যে সমস্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে পাঠটীকায় তা উল্লেখ করতে হবে। এরপর উপরিউক্ত তিনটি সোপান অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠটীকা রচনা করতে হবে।

আয়োজন (Preparation)—পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং ছাত্রদের মনে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করতে হবে। এরজন্য ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে এমনভাবে নতুন পাঠের সংযোগ স্থাপন করতে হবে যাতে স্বাভাবিকভাবে ছাত্রদের মনে নতুন বিষয় সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপর **পাঠঘোষণা (announcement)** করতে হবে।

উপস্থাপন (presentation)—পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রশ্নের মাধ্যমে এক একটি অংশ ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে। প্রশ্নগুলি হবে সহজ, সরল ও চিন্তা উদ্রেককারী (thought provoking)। গতানুগতিক প্রশ্নের পরিবর্তে শিক্ষামূলক প্রশ্ন, অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন, শাসনমূলক প্রশ্ন প্রভৃতির সাহায্যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে পাঠদানের ব্যাপারে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রভৃতি শিক্ষাদানের অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

অভিযোজন (Application)—উপস্থাপন পর্বে যে-বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা হল সেটি তারা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানবার জন্য তাদের কয়েকটি পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করতে হবে কিংবা অর্জিত জ্ঞানকে যাতে তারা নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে।

পাঠদান শেষ হলে ছাত্রদের **বাড়ীর কাজের (Home work)** জন্য পাঠটীকায় এক বা একাধিক প্রশ্নের উল্লেখ থাকবে। ছাত্রেরা বাড়ীতে এইসব প্রশ্নের উত্তর লিখবে এবং এইভাবে বিদ্যালয়ে শেখা বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে।

উপরি উক্ত পাঠটীকা অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে কার্যকরীভাবে পাঠদান করতে হলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। **প্রথমতঃ**, ছাত্রদের প্রশ্ন করার সময় কোন নির্দিষ্ট ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে শ্রেণীর ছাত্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে হবে। তারপর কোন একজন ছাত্রকে উত্তর দিতে বলা হবে। এতে কোন ছাত্রের অমনোযোগী হবার সুযোগ থাকবে না। তাছাড়া একাধিক ছাত্র যাতে একসঙ্গে উত্তর না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেবলমাত্র বুদ্ধিমান ছাত্রদের

জিজ্ঞাসা না করে প্রশ্নগুলি শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেবার চেষ্টা করতে হবে। অমনোযোগী ছাত্রদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। যেসব ছাত্র পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ**, পাঠ্য বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা ও বিষয়টি বুঝতে তাদের সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। বিশেষভাবে ব্ল্যাকবোর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। **তৃতীয়তঃ**, একসঙ্গে বেশীক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পরিবর্তে যথাসম্ভব শিক্ষামূলক প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফল ছাত্রেরা নিজেরাই নতুন জ্ঞান কিংবা তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার সৃজন ও উদ্ভাবনমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। এইভাবে একদিকে ছাত্রদের অধিক পরিমাণে পাঠে অংশগ্রহণ করার সুযোগ-প্রদান এবং অপরদিকে শ্রেণীকক্ষে জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে কার্যকরীভাবে পাঠদান করা সম্ভব হবে।

পাঠটীকা—১

॥ কবিতা ॥

১। ষষ্ঠ শ্রেণীতে একজন প্রখ্যাত কবির একটি **কবিতা বা কবিতাংশ** লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন। (কবিতাটি বা কবিতাংশটুকু উদ্ধৃত করিতে হইবে)।
[C. U. B. Ed 1973]

দেশের মাটি

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধু—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি !
চন্দনেরি গন্ধে-ভরা,—
শীতল-করা, ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি !
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—ষষ্ঠ	সাধারণ পাঠ—কবিতা
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ—দেশের মাটি
গড় বয়স—১১ +	—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সময় - ৪৫ মিনিট	পাঠক্রম * ১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক
তারিখ—	২। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক
শিক্ষক—	* অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য ঃ রসসঞ্চারী পাঠের সাহায্যে কবিতাটির ভাষা, ভাব, ছন্দ, মিল প্রভৃতির সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাব্যরস উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং আলোচ্য স্তবকগুলির বিষয়বস্তুর অর্থ গ্রহণে সাহায্যকারী একখানি চিত্র।

আয়োজন ঃ অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। তোমরা যে দেশে বাস কর তার নাম কি ?

২। নিজের দেশকে তোমার কেমন লাগে ?

৩। তোমার নিজের দেশকে কেন ভাল লাগে ?

৪। "কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?"
—এই লাইনগুলি কার লেখা ?

পাঠঘোষণা ঃ—আজ আমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা আর একটি কবিতা পড়ব। কবিতাটির নাম "দেশের মাটি"। এই কবিতাটিতে কবি খুব সুন্দর ভাবে নিজের জন্মভূমি যে তার কাছে কত প্রিয় সেকথা বলেছেন। সাধারণ অর্থে বাংলা দেশকেই কবি তাঁর জন্মভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ কবির কাছে খুবই মধুর। এদেশের পথের ধূলাও তাঁর কাছে মূল্যবান এবং পবিত্র।

উপস্থাপন ঃ—কবিতাটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, যতি, মিল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে আলোচ্য অংশটির আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে পাঠের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর দু'তিনজন ছাত্রকে কবিতাংশটি সরবে পাঠ করতে বলা হবে এবং পাঠে ভুল হ'লে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

এরপর প্রত্যেকটি স্তবককে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করে নিম্নলিখিত ভাবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হবে :

বিষয়	পদ্ধতি
১। প্রথম স্তবক "মধুর চেয়েও……চাইতে খাঁটি।" **শব্দার্থ ঃ** মধু—একপ্রকার সুমিষ্ট রস, যা ফুল থেকে মৌমাছিরা সংগ্রহ করে। মধু—মিষ্টি, তৃপ্তিদায়ক। খাঁটি—বিশুদ্ধ, এখানে মূল্যবান ও পবিত্র। চাইতে—চেয়ে।	**১। প্রথম স্তবক :** (ক) স্তবকটির হৃদয়গ্রাহী সরব পাঠ দেওয়া হবে। (খ) কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। (গ) স্তবকটি ব্যাখ্যা করা হবে এবং অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে : কবির কাছে তাঁর জন্মভূমি খুবই প্রিয়। জন্মভূমি তাঁর কাছে কত প্রিয় বোঝাবার জন্যে কবি এই কবিতায় স্বাদ, গন্ধ, মূল্য ইত্যাদির দিক থেকে উৎকৃষ্ট কতকগুলি বস্তুর সঙ্গে জন্মভূমির বিভিন্ন জিনিসের তুলনা করেছেন। এই অংশে কবি মধু ও খাঁটি সোনার সঙ্গে দেশের মাটির তুলনা করেছেন। মধু খুবই সুমিষ্ট অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক। কবির কাছে দেশের মাটি তার চেয়েও তৃপ্তিদায়ক। সোনা একটি মূল্যবান ধাতু। খাঁটি সোনা আরও বেশী মূল্যবান। কবির কাছে তাঁর দেশের পথের ধূলা খাঁটি সোনার চেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র। কারণ এই দেশেই কবির পূর্বপুরুষেরা জন্মেছেন—এই ধূলার সঙ্গে তাদের পায়ের ধূলা মিশে আছে। তুলনীয় : ১। "কোন্ দেশেতে…আমাদেরই বাংলা রে।" 'বাংলা দেশ'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ২। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বিষয়	পদ্ধতি
	(ঘ) বিষয়বস্তু ও শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী : (১) কবি এখানে 'আমাদের দেশের মাটি' বলতে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন ? (২) মধু কি ? মধুর বৈশিষ্ট্য কি ? (৩) কবি দেশের মাটিকে মধুর চেয়েও মধুর বলেছেন কেন ? (৪) 'পথের ধূলা' খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি—কবি একথা বলেছেন কেন ?
২। দ্বিতীয় স্তবক : "চন্দনেরি গন্ধে…… শীতল পাটি।" **শব্দার্থ :** চন্দন—একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত গাছ। ক্লান্তিহরা—যা অবসাদ দূর করে। অঙ্গ—দেহের অংশ। শীতলপাটি—একপ্রকার মাদুর বিশেষ।	**২। দ্বিতীয় স্তবক :** (ক) স্তবকটির হৃদয়গ্রাহী সরব পাঠ দেওয়া হবে। (খ) কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। (গ) স্তবকটি ব্যাখ্যা করা হবে : এই অংশে কবি চন্দনের গন্ধের সঙ্গে তাঁর জন্মভূমির বাতাসে যে সুগন্ধ আছে তার তুলনা করেছেন। চন্দনের গন্ধের মত সুগন্ধে বাংলাদেশের বাতাস ভরপুর হয়ে থাকে। এই বাতাসে শরীর শীতল হয় এবং দেহের ক্লান্তি দূর হয়। শীতল পাটিতে শয়ন করলে যেমন শরীর জুড়িয়ে যায়—কবির জন্মভূমির মাটিতে শয়ন করলেও তেমনি শরীর জুড়িয়ে যায়। (ঘ) বিষয়বস্তু ও শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী : (১) জন্মভূমির বাতাস চন্দনের গন্ধে ভরা—কবি একথা বলেছেন কেন ? (২) বাতাসকে 'ক্লান্তিহরা' কেন বলা হয়েছে ? (৩) কবি দেশের মাটিকে শীতল পাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন ?

বিষয়	পদ্ধতি
৩। তৃতীয় স্তবক ঃ "শিয়রে তার .....রূপার কাঠি।" শিয়রে—মাথার কাছে। সোনার কাঠি—রূপকথার গল্পের সোনার কাঠি, এখানে সূর্যের আলো। ছোঁয়ায়—স্পর্শ করায়। মহল—বাড়ীর অংশ। নিদ্‌মহল—বাড়ীর যে-অংশে সকলে ঘুমায়। জ্যোৎস্না - চাঁদের আলো। নিতি—নিত্য, প্রতিদিন। বুলায়—হাল্কাভাবে স্পর্শ ক'রে চালনা করে। রূপার কাঠি—রূপকথার গল্পের রূপার কাঠি। এখানে চাঁদের আলো।	৩। তৃতীয় স্তবক ঃ (ক) স্তবকটির হৃদয়গ্রাহী সরব পাঠ দেওয়া হবে। (খ) কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া। হবে। (গ) স্তবকটি ব্যাখ্যা করা হবে : আমাদের চারিদিকে আমরা যা দেখি তার সব কিছু সুন্দর নয়। কিন্তু রূপকথার জগতে যা থাকে তা সবই সুন্দর। তাই রূপকথার গল্প আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু কবির চোখে তাঁর দেশের সব কিছুই রূপকথার জগতের মত সুন্দর। রূপকথার গল্পে আছে যে ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় সোনার কাঠি ছোঁয়ালে সে জেগে উঠত, আর তার পায়ে রূপোর কাঠি ছোঁয়ালে সে ঘুমিয়ে পড়ত। তেমনি প্রতিদিন সূর্যের আলো এসে কবির দেশের অর্থাৎ দেশের লোকেদের ঘুম ভাঙ্গায়। আর রাত্রে চাঁদের আলোর স্পর্শে কবির জন্মভূমি ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে সোনার কাঠি হচ্ছে সূর্যের আলো আর রূপার কাঠি হচ্ছে চাঁদের আলো। নিতি শব্দটি লক্ষ্য কর। নিতি মানে প্রতিদিন। কিন্তু প্রত্যেক দিন কি জ্যোৎস্না ওঠে? ওঠে না। কিন্তু কবির কল্পনায় প্রত্যেক দিনই জ্যোৎস্না ওঠে; যেমন, যাকে আমরা ভালবাসি তার সবকিছুই সুন্দর লাগে। (ঘ) বিষয়বস্তু ও শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী : (১) এখানে সোনার কাঠি বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

বিষয়	পদ্ধতি
	(২) 'শিয়রে' শব্দটির অর্থ কি ? (৩) সূর্য কার মাথায় সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ? সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর অর্থ কি ? (৪) 'নিদ্‌মহলে' শব্দটির অর্থ কি ? (৫) জ্যোৎস্না কার পায়ে রূপার কাঠি বোলায় ? রূপার কাঠি বোলানোর অর্থ কি ? এরপর আলোচ্য স্তবকগুলি নীরবে পাঠ করার জন্য ছাত্রদের কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হবে এবং তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলা হবে।

অভিযোজন :—ছাত্রেরা আলোচ্য কবিতাংশটি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। কবির জন্মভূমি তাঁর কাছে এত প্রিয় কেন ?
২। জন্মভূমি সম্পর্কে লেখা কবির আর একটি কবিতার নাম বল।
৩। জন্মভূমির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাবার জন্য কবি কি কি উপমা ব্যবহার করেছেন ?
৪। জন্মভূমিকে তোমাদের কেমন লাগে ? কেন ভাল লাগে ?

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রেরা বাড়ী থেকে কবিতাংশটি মুখস্থ করে আসবে।

পাঠটীকা—২

॥ কবিতা ॥

২। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতিসহ) লইয়া একটি পাঠ-টীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1980]

বঙ্গভূমির প্রতি

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন করো না গো, তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এদেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে।

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—সপ্তম ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স—১২+ সময় ৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—কবিতা বিশেষ পাঠ—বঙ্গভূমির প্রতি —মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাঠক্রম—*১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক। ২। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক। *অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য :—রসসঞ্চারী পাঠের সাহায্যে কবিতাটির ভাষা, ভাব, ছন্দ, মিল প্রভৃতির সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাব্যরস উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

উপকরণ :—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং বঙ্গভূমির সম্মুখে প্রার্থনারত মাইকেল মধুসূদনের একটি চিত্র।

আয়োজন :—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে:

১। জন্মভূমি কাকে বলে?

২। আমাদের জন্মভূমির নাম কি?

৩। জন্মভূমিকে আমরা ভালবাসি কেন ?

৪। জন্মভূমিকে ছেড়ে অনেক দূর দেশে যেতে হলে আমাদের মনের অবস্থা কেমন হয় ?

পাঠঘোষণা :—আজ আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বঙ্গভূমির প্রতি' নামক একটি কবিতা পড়ব। এই কবিতাটি কবি বিদেশে যাবার সময় লিখেছিলেন। এখানে কবি জন্মভূমির কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন যে বিদেশে তিনি যেভাবেই থাকুন না কেন, দেশমাতা যেন তাঁকে না ভোলেন।

উপস্থাপন :—কবিতাটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, যতি, মিল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে আলোচ্য অংশটির আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে পাঠের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর দু'তিনজন ছাত্রকে কবিতাংশটি সরবে পাঠ করতে বলা হবে এবং পাঠে ভুল হলে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

কবিতাংশটির সরব পাঠ ছাত্রদের মনে কিরূপ রেখাপাত করেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন করা হবে :—

ক। কবি জন্মভূমির কাছে কি মিনতি করছেন ?

খ। বিদেশে মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও কবি দুঃখিত হবেন না কেন ?

এরপর প্রত্যেকটি স্তবককে পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করে নিম্নলিখিতভাবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা ও ছাত্রদের মধ্যে রসসঞ্চার করা হবে :

১। **প্রথম স্তবক :** "রেখো মা ...কোকনদে !"

(ক) স্তবকটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে স্তবকটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করে স্তবকটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :—

(১) কবি কার কাছে মিনতি করছেন ?

(২) কবি কি মিনতি করছেন ?

(৩) "বঙ্গভূমি যেন মধুসূদনকে মন থেকে মুছে না ফেলেন"—একথা কবি কিভাবে প্রকাশ করেছেন ?

(৪) 'কোকনদ' শব্দের অর্থ কি ?

(৫) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরিবর্তে কবি কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন—অনুরোধ, পূর্ণ করতে, ইচ্ছা, প্রমাদ ?

(গ) স্তবকটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে ; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

২। **দ্বিতীয় স্তবক :** "প্রবাসে......খেদ তাহে।"

(ক) স্তবকটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে স্তবকটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করে স্তবকটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :

(১) 'বিদেশে থাকার সময় দৈবাৎ কবির মৃত্যু হতে পারে'—একথা কবি কিভাবে প্রকাশ করেছেন ?

(২) কবি মৃত্যু হওয়াকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

(৩) বিদেশে মৃত্যুর সম্মুখীন হলে কবির মনের অবস্থা কেমন হবে ?

(৪) 'দুঃখ' শব্দটির পরিবর্তে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ?

(৫) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরিবর্তে কবি কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন—বিদেশ, প্রভাবে, দুঃখ।

(গ) স্তবকটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে ; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

৩। **তৃতীয় স্তবক :**

(ক) স্তবকটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে স্তবকটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করে স্তবকটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :—

(১) বিদেশে মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও কবির দুঃখ হবে কেন ?

(২) জীবনকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

(৩) কবি নদীর সঙ্গে জীবনের কিরকম মিল লক্ষ্য করেছেন ?

(৪) 'জল' শব্দটির পরিবর্তে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ?

(৫) 'জীবন-নদ' বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

(গ) স্তবকটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্প সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে ; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

এরপর আলোচ্য স্তবকগুলি নীরবে পাঠ করার জন্য ছাত্রদের কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হবে এবং তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলা হবে।

অভিযোজন :—ছাত্রেরা আলোচ্য কবিতাংশটি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। কবি কাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন ?

২। বিদেশে কবির কিরূপ ক্ষতি হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন ?

৩। কবি নিজেকে কিভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন ?

৪। কবি জীবনের সঙ্গে কি কি জিনিসের তুলনা করেছেন ?

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রেরা নিজের ভাষায় কাব্যাংশটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বাড়ী থেকে সংক্ষেপে কিছু লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৩

॥ কবিতা ॥

৩। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতিসহ) লইয়া একটি পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1980]

বনবাসে

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বনবাস মোর শেষ হবে কবে? জান যদি কেহ, কহরে।
চৌদ্দ বরষ রহেছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি শহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল, ছিল ফুল তরু লতিকা
স্বচ্ছ সলিলা ছিল গোদাবরী সকল বেদনা হারিকা।
এখানে তো নাই বন মর্মর বন বিহগের সাড়াটি,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি ক্ষীণবল জল ধারাটি।
কোথা আমগাছে ঝুপ ঝাল্লুর কোথা বটগাছে ঝুলব?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল যেথা বুনোকুল তুলব।

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—অষ্টম	সাধারণ পাঠ—কবিতা
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ—বনবাসে
গড় বয়স—১৩+	—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
সময়—৪৫ মিনিট	পাঠক্রম—অদ্যকার পাঠ
তারিখ—	*১। প্রথম আট লাইন।
শিক্ষক—	২। শেষ ছ'লাইন।
	*অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য :—রসসঞ্চারী পাঠের সাহায্যে কবিতাটির ভাষা, ভাব, ছন্দ, মিল প্রভৃতির সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাব্যরস উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

উপকরণ :—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং আলোচ্য কবিতাংশটির বিষয়বস্তুর অর্থগ্রহণে সাহায্যকারী একখানি চিত্র।

আয়োজন :—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে:

১। রাম কত বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন?
২। বনবাসে যাওয়ার ফলে রামকে কি ত্যাগ করতে হয়েছিল?
৩। বনবাসে থাকাকালীন রাম কিভাবে জীবনযাপন করতেন?
৪। শহর ও গ্রামের মধ্যে কোথাকার জীবনযাত্রা তোমার ভাল লাগে?

পাঠঘোষণা :—আজ আমরা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা 'বনবাসে' নামক একটি কবিতা পড়ব। এই কবিতাটিতে কবি তাঁর নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে থাকার দুঃখের কথা বর্ণনা করেছেন। কবি যখন নিজের গ্রামে থাকতেন তখন তিনি প্রকৃতির বুকে অবাধে বিচরণ করতেন। কিন্তু শহরের জীবনে কোথাও প্রকৃতির সেই মনোমুগ্ধকর রূপের দেখা পাওয়া যায় না। সেইজন্য কবি এখানে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

উপস্থাপন :—কবিতাটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, যতি, মিল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে আলোচ্য অংশটির আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে পাঠের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর দু'তিনজন ছাত্রকে কবিতাংশটি সরবে পাঠ করতে বলা হবে এবং পাঠে ভুল হলে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

কবিতাংশটির সরব পাঠ ছাত্রদের মনে কিরূপ রেখাপাত করেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন করা হবে :—

ক। চৌদ্দ বছর ধরে কবি কোথায় আছেন ?

খ। শহরে কবি কিসের অভাব বোধ করছেন ?

এরপর কবিতাংশটিকে দুটি ভাগে ভাগ ক'রে নিম্নলিখিতভাবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা এবং ছাত্রদের মধ্যে রসসঞ্চার করা হবে :

১। **প্রথম চার পংক্তি** :

(ক) আলোচ্য অংশটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত **প্রশ্নের সাহায্যে** ছাত্রদের মধ্যে অংশটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে অংশটির রসোপলব্ধিতে সহায়তা করা হবে :—

(১) কবি কোথায় বনবাসে রয়েছেন ?

(২) কতদিন তিনি শহরে বাস করেছেন ?

(৩) শহরে বাস করাকে কবি বনবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন ?

(৪) আগে তিনি কোথায় বাস করতেন ?

(৫) বনবাসে রামের কি কি সুখ ছিল ?

(৬) "গোদাবরী নদী রামের সমস্ত বেদনা দূর করত"—একথা কবি কিভাবে প্রকাশ করেছেন ?

(৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরিবর্তে কবি কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন—বছর, আমার, বন, লতা, জল, হরণকারিনী ?

(গ) আলোচ্য অংশটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে ; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

২। **পঞ্চম থেকে অষ্টম পংক্তি ঃ**

(ক) আলোচ্য অংশটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত **প্রশ্নের সাহায্যে** ছাত্রদের মধ্যে অংশটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে অংশটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :—

(১) শহরে কবি কি কি জিনিসের অভাব বোধ করেছেন ?

(২) "নদীর প্রচুর জলের পরিবর্তে কবি কলের জলের ক্ষীণ ধারা পেয়েছেন"—একথা কবি কিভাবে প্রকাশ করেছেন ?

(৩) 'ঝুপ ঝাল্লুর' বলতে কি বোঝ ?

(৪) গ্রামের আমগাছ ও বটগাছে কবি কি করতেন ?

(৫) অজয় নদীর তীরে কবি কি করতেন ?

(৬) কবি 'রাজা হব' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

(৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরিবর্তে কবি কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন—পাতার শব্দ, পাখী, পাখীর ডাক, গভীর, সবুজ তীর, টাটকা, সৎমা ?

(গ) আলোচ্য অংশটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে ; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

এরপর সমগ্র অংশটি নীরবে পাঠ করার জন্য ছাত্রদের কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হবে এবং তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলা হবে।

অভিযোজন ঃ—ছাত্রেরা আলোচ্য কবিতাংশটি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ঃ

১। 'বনবাস' বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

২। কবি শহরে কিসের অভাব বোধ করছেন ?

৩। গ্রামের জীবন তাঁর ভাল লাগে কেন ?

৪। কবি কি অর্থে রাজা হতে চেয়েছেন ?

বাড়ীর কাজ ঃ—ছাত্রেরা নিজের ভাষায় কাব্যাংশটির বিষয়বস্তু ও কাব্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে বাড়ী থেকে সংক্ষেপে কিছু লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৪

॥ কবিতা ॥

৪। নবম শ্রেণীতে—যে-কোন একটি কবিতা বা কবিতাংশ লইয়া একটি বিশদ পাঠটীকা রচনা করুন ; ঐ কবিতা বা কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতে হইবে।

[C. U. B. Ed. 1971]

হাট

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট।
নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—বাংলাভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—নবম	সাধারণ পাঠ—কবিতা
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ—হাট
গড় বয়স—১৪+	—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
সময়—৪৫ মিনিট	পাঠক্রম—অদ্যকার পাঠ
তারিখ—	*১। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক
শিক্ষক—	২। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক
	*অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য :—রসসঞ্চারী পাঠের সাহায্যে কবিতাটির ভাষা, ভাব, ছন্দ, মিল প্রভৃতির সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাব্যরস উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

উপকরণ :—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং আলোচ্য স্তবকগুলির বিষয়বস্তুর অর্থগ্রহণে সাহায্যকারী একখানি চিত্র।

আয়োজন :—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য কোনখানে যায় ?

২। হাট কখন শেষ হয় ?

৩। হাট শেষ হলে যারা বেচাকেনা করতে আসে তারা কোথায় যায় ?

৪। তখন হাট দেখতে কেমন লাগে ?

পাঠঘোষণা :—এই রকম এক হাটের কথা আজ আমরা পড়ব। চারিদিকে গ্রামের মাঝখানে হাট বসে। সারাদিন ধরে সেখানে চলে কোলাহল। তারপর সন্ধ্যাবেলা যে-যার ঘরে ফিরে যায়। দূরে গ্রামে গ্রামে আলো জ্বলে ওঠে। হাট পড়ে থাকে অন্ধকারে। রাত্রিবেলা জায়গাটা থমথম করতে থাকে। কখনো কখনো দু'একটা কাকের ডাক আর বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ শোনা যায়। আজ আমরা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'র 'হাট' কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক পড়ব যেখানে হাটের এইরূপ বর্ণনা আছে।

উপস্থাপন :—কবিতাটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, যতি, মিল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে আলোচ্য অংশটির আদর্শ সরব পাঠ দেওয়া হবে। প্রয়োজনবোধে পাঠের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপর দু'তিনজন ছাত্রকে কবিতাংশটি সরবে পাঠ করতে বলা হবে এবং পাঠে ভুল হলে তা সংশোধন ক'রে দেওয়া হবে।

কবিতাংশটির সরব পাঠ ছাত্রদের মনে কিরূপ রেখাপাত করেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন করা হবে :—

ক। সন্ধ্যাবেলা হাটের অবস্থা কেমন হয় ?

খ। রাত্রিবেলা নির্জন হাটে কিসের শব্দ শোনা যায় ?

এরপর প্রত্যেকটি স্তবককে পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করে নিম্নলিখিতভাবে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা ও ছাত্রদের মধ্যে রসসঞ্চার করা হবে :

১। **প্রথম স্তবক :**

(ক) স্তবকটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত **প্রশ্নের সাহায্যে** ছাত্রদের মধ্যে স্তবকটির ভাব সঞ্চারিত করা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে স্তবকটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :—

(১) হাটটি কোথায় অবস্থিত ?

(২) হাটে লোকেরা কি জন্য আসে ?

(৩) বেচা-কেনা সেরে তারা কোথায় যায় ?

(৪) "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দিনের আলো চলে যাচ্ছে"—একথা কবি কিভাবে প্রকাশ করেছেন ?

(৫) 'পূর্বদিক' বোঝাতে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ?

(৬) দূরের গ্রামগুলিতে সন্ধ্যাবেলা কি জলে ওঠে ?

(৭) 'হাট' তখন কি রকম অবস্থায় থাকে ?

(৮) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরিবর্তে কবি কি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন—সকলে, বিক্রয়, পূর্ব, প্রদীপ, অন্ধকার।

(গ) স্তবকটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্পসৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

২। **দ্বিতীয় স্তবক ঃ**

(ক) স্তবকটি সরবে পাঠ করা হবে।

(খ) নিম্নলিখিত **প্রশ্নের সাহায্যে** ছাত্রদের মধ্যে স্তবকটির ভাব সঞ্চারিতকরা হবে এবং কঠিন শব্দ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে স্তবকটির রসোপলব্ধিতে ছাত্রদের সহায়তা করা হবে :—

(১) 'রাত্রি'র পরিবর্তে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন?

(২) 'দলছাড়া' শব্দটির বদলে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন?

(৩) "রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসে"—একথা কবি কেমনভাবে প্রকাশ করেছেন?

(৪) আমরা যখন নিঃশ্বাস ফেলি তখন কেমন শব্দ হয়?

(৫) নদীর বাতাস যখন গাছের শাখায় এসে লাগে তখন কেমন শব্দ হয়?

(৬) 'চোখ'-এর পরিবর্তে কবি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন?

(৭) 'মুদিল' শব্দটির অর্থ কি?

(৮) 'হাটের দোচালা মুদিল নয়ান'—এ কথার অর্থ কি?

(৯) রাত্রিবেলা হাট কাউকে আহ্বান করে না কেন?

(১০) 'বিদ্রূপ-বাঁশি' শব্দগুচ্ছটির অর্থ কি?

(১১) বাতাসের শব্দকে কবির বিদ্রূপাত্মক বলে মনে হচ্ছে কেন?

(১২) কবি নির্জন হাটে কিসের ডাক শুনতে পাচ্ছেন?

(গ) স্তবকটির অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্প-সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে; অর্থসহ দুরূহ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশের উল্লেখ করা হবে।

এরপর আলোচ্য স্তবকগুলি নীরবে পাঠ করার জন্য ছাত্রদের কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হবে এবং তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলা হবে।

অভিযোজন ঃ—ছাত্রেরা আলোচ্য কবিতাংশটি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে:

১। 'হাট' কবিতায় কবি কোন্ সময়ের হাটের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন?

২। কবি সন্ধ্যার আগমনের দৃশ্যটি কেমনভাবে বর্ণনা করেছেন?

৩। রাত্রিকালে অন্ধকার নির্জন হাটের কবি কিরূপ বর্ণনা দিয়েছেন?

৪। রাত্রিকে শ্রেণীহারা ক্লান্ত কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

বাড়ীর কাজ ঃ—ছাত্রেরা নিজের ভাষায় স্তবক দুটির বিষয়বস্তু ও কাব্য সৌন্দর্য সম্বন্ধে বাড়ী থেকে সংক্ষেপে কিছু লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৫

॥ ব্যাকরণ ॥

৫৩। ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণের একটি বিষয় লইয়া একটি পাটটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1979]

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—ষষ্ঠ	সাধারণ পাঠ—ব্যাকরণ
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ—স্বরসন্ধি
গড় বয়স—১১+	পাঠক্রম—*১। স্বরসন্ধির প্রথম তিনটি সূত্র।
সময়—৪৫ মিনিট	২। স্বরসন্ধির অবশিষ্ট সূত্র।
তারিখ—	* অদ্যকার পাঠ
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য ঃ মুখ্য ঃ বাংলা স্বরসন্ধির সূত্রাবলী গঠন করতে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে ঐ সূত্রাবলীর প্রয়োগ করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ ঃ ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

উপকরণ ঃ শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং বাংলা স্বরসন্ধির আলোচ্য সূত্রগুলি সম্পর্কে একটি চার্ট।

আয়োজন ঃ অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

১। স্বরবর্ণ কাকে বলে?

২। ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে?

৩। 'সিংহ' এই শব্দটির শেষে কি স্বরবর্ণ আছে?

৪। 'সিংহাসন' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা কি কি শব্দ পাই?

পাঠঘোষণা ঃ আজ আমরা বাংলা স্বরসন্ধির প্রথম তিনটি সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন ঃ অদ্যকার পাঠকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে **আরোহ পদ্ধতির** সাহায্যে সূত্রগুলি গঠন করার চেষ্টা করা হবে ঃ

বিষয়	পদ্ধতি
উদাহরণ : ১। সিংহ (অ)+(আ) আসন =সিংহাসন।	**প্রথম পর্যায় :** উদাহরণ ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হবে এবং ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে— ১। 'সিংহাসন', 'নরাধম' ও 'রবীন্দ্র' —এই শব্দ তিনটি কি কি শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে ? ২। 'সিংহ' শব্দটির শেষে ও 'আসন' শব্দটির প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৩। এই বর্ণদুটির মিলনে কি বর্ণ উৎপন্ন হয়েছে ? এইভাবে একটি স্বরবর্ণের সঙ্গে অপর একটি স্বরবর্ণের মিলনের ফলে যখন অপর একটি স্বরবর্ণ উৎপন্ন হয় তখন এই দুটি স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্রগঠন ক'রে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র : স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।	**প্রশ্ন :** স্বরসন্ধি কাকে বলে ?
উদাহরণ : ১। নর (অ)+(অ) অধম=নরাধম। ∴ অ+অ=আ ২। দেব (অ)+(আ) আলয় =দেবালয়। ∴ অ+আ=আ ৩। যথা (আ)+(অ) অর্থ=যথার্থ। ∴ আ+অ=আ	**দ্বিতীয় পর্যায় :** **প্রশ্ন :** ১। 'নর' শব্দের শেষে এবং 'অধম' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ২। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ? ৩। 'দেব' শব্দের শেষে এবং 'আলয়' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৪। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ? ৫। 'যথা' শব্দের শেষে এবং 'অর্থ' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৬। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?

বিষয়	পদ্ধতি
৪। বিদ্যা (আ)+(আ) আলয় =বিদ্যালয়। ∴ আ+আ=আ	৭। 'বিদ্যা' শব্দের শেষে এবং 'আলয়' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৮। এই বর্ণ দুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ? . তাহলে আমরা দেখলাম যে, অ-কার কিংবা আ-কারের সঙ্গে অ-কার কিংবা আ-কার মিলিত হলে আ-কার উৎপন্ন হয়, এই আ-কারটি কোথায় যুক্ত হয়েছে লক্ষ্য কর। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র-গঠন ক'রে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ অ-কার কিংবা অ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।	**প্রশ্ন ঃ** স্বরসন্ধির প্রথম সূত্রটি গঠন কর।
উদাহরণ ঃ	**তৃতীয় পর্যায় ঃ** **প্রশ্ন ঃ**
১। রবি (ই)+(ই) ইন্দ্র=রবীন্দ্র। ∴ ই+ই=ঈ	১। 'রবি' শব্দের শেষে এবং 'ইন্দ্র' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ২। এই বর্ণ দুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
২। পরি (ই)+(ঈ) ঈক্ষা=পরীক্ষা। ∴ ই+ঈ=ঈ	৩। 'পরি' শব্দের শেষে এবং 'ঈক্ষা' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৪। এই বর্ণ দুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
৩। রথী (ঈ)+(ই) ইন্দ্র=রথীন্দ্র। ∴ ঈ+ই=ঈ	৫। 'রথী' শব্দের শেষে এবং 'ইন্দ্র' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৬। এই বর্ণ দুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
৪। শ্রী (ঈ)+(ঈ) ঈশ=শ্রীশ। ∴ ঈ+ঈ=ঈ	৭। 'শ্রী' শব্দের শেষে এবং 'ঈশ' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৮। এই দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?

বিষয়	পদ্ধতি
	তাহলে আমরা দেখলাম যে, ই-কার কিংবা ঈ-কারের সঙ্গে ই-কার কিংবা ঈ-কার মিলিত হলে ঈ-কার উৎপন্ন হয়, এই ঈ-কারটি কোথায় যুক্ত হয়েছে লক্ষ্য কর। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র-গঠন ক'রে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।	**প্রশ্ন ঃ** স্বরসন্ধির দ্বিতীয় সূত্রটি গঠন কর।
	চতুর্থ পর্যায় ঃ
উদাহরণ ঃ	**প্রশ্ন ঃ**
১। কটু (উ)+(উ) উক্তি=কটূক্তি। ∴ উ+উ=ঊ	১। 'কটু' শব্দের শেষে এবং 'উক্তি' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ২। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
২। লঘু (উ)+(উ) ঊর্মি=লঘূর্মি। ∴ উ+ঊ=ঊ	৩। 'লঘু' শব্দের শেষে এবং 'ঊর্মি' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৪। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
৩। বধূ (ঊ)+(উ) উক্তি=বধূক্তি। ∴ ঊ+উ=ঊ	৫। 'বধূ' শব্দের শেষে এবং 'উক্তি' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৬। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
৪। ভূ (ঊ)+(ঊ) ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব। ∴ ঊ+ঊ=ঊ	৭। 'ভূ' শব্দের শেষে এবং 'ঊর্ধ্ব' শব্দের প্রথমে কি কি বর্ণ আছে ? ৮। এই বর্ণদুটি মিলিত হয়ে কোন্ বর্ণ উৎপন্ন করেছে ?
	তাহলে আমরা দেখলাম যে, উ-কার কিংবা ঊ-কারের সঙ্গে উ-কার কিংবা ঊ-কার মিলিত হলে ঊ-কার উৎপন্ন হয়, এই ঊ-কারটি কোথায় যুক্ত হয়েছে লক্ষ্য

বিষয়	পদ্ধতি
সূত্র : উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।	কর। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র-গঠন করে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। **প্রশ্ন :** স্বরসন্ধির তৃতীয় সূত্রটি গঠন কর।

অভিযোজন : ছাত্রেরা স্বরসন্ধির সূত্রগুলি কতখানি বুঝতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। সন্ধি কর—চরণ + অমৃত, পুস্তক + আগার, আজ্ঞা + অধীন, মহা + আনন্দ। এখানে কোন্ সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে তা বল।

২। স্বরসন্ধির দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে এমন কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর—সুধীন্দ্র, অভীষ্ট, প্রতীক্ষা, মরুস্থান, বধূৎসব, জলাশয়, পরাধীন।

বাড়ীর কাজ : ছাত্রেরা বাড়ী থেকে স্বরসন্ধির প্রথম তিনটি সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে এমন কতকগুলি নতুন নতুন শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে আনবে।

পাঠটীকা—৬

॥ ব্যাকরণ ॥

৬। সপ্তম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণের একটি বিষয় লইয়া একটি পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1977]

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—সপ্তম ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স—১২ + সময়— ৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—ব্যাকরণ বিশেষ পাঠ—কারক পাঠক্রম—*১। কারক ও তার শ্রেণীবিভাগ ২। কর্তৃকারক ৩। কর্মকারক * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য : মুখ্য : কারকের সূত্রগঠন ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ : ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

উপকরণ : শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং কারকের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত একটি চার্ট।

আয়োজন : অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। বাক্য কাকে বলে ?
২। পদ কাকে বলে ?
৩। পদ কয় প্রকার ও কি কি ?
৪। "বালকটি ফুটবল খেলিতেছে"—এই বাক্যটিতে কি কি পদ রয়েছে বল।

পাঠঘোষণা : আজ আমরা বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

উপস্থাপন : অদ্যকার পাঠকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে **আরোহ পদ্ধতির** সাহায্যে সূত্রগুলি গঠন করার চেষ্টা করা হবে :

বিষয়	পদ্ধতি
উদাহরণ : ১। তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তে ভাণ্ডার হইতে দরিদ্রকে ধন **দিতেছেন**।	**প্রথম পর্যায় :** উদাহরণটি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হবে এবং ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :— ১। এই বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোন্‌টি ? ২। কে দিতেছেন ? ৩। কি দিতেছেন ? ৪। কিসের দ্বারা দিতেছেন ? ৫। কাহাকে দিতেছেন ? ৬। কোথা হইতে দিতেছেন ? ৭। কোথায় দিতেছেন ? অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'রাজা', 'ধন', 'স্বহস্তে', 'দরিদ্রকে', 'ভাণ্ডার হইতে' এবং 'তীর্থক্ষেত্রে'—এই পদগুলির সঙ্গে 'দিতেছেন' এই ক্রিয়াপদটির সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধের নাম

বিষয়	পদ্ধতি
	কারক। ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত ঐ পদগুলিকে এক-একটি কারক বলে। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্রগঠন ক'রে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ ক্রিয়ার সহিত অন্য পদের যে সম্বন্ধ তার নাম কারক।	**প্রশ্ন ঃ** কারক কাকে বলে ?
	দ্বিতীয় পর্যায় ঃ
উদাহরণ ঃ ২। রামের ছাতা চুরি গিয়াছে।	**প্রশ্ন ঃ** ১। এই বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ কোন্‌টি ? ২। কি চুরি গিয়াছে ? ৩। ছাতাটি কার ? এখানে লক্ষ্য কর যে 'রামের' এই পদটির সঙ্গে 'চুরি গিয়াছে' এই ক্রিয়াপদের কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য 'রামের' এই পদটি কারক নয়—এটি সম্বন্ধ পদ। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্রগঠন ক'রে সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ থাকে না ব'লে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।	**প্রশ্ন ঃ** সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন ?
	তৃতীয় পর্যায় ঃ
উদাহরণ ঃ ৩। (ক) রাম খেলা করে। (খ) মধু বই পড়ে।	**প্রশ্ন ঃ** ১। কে খেলা করে ? ২। কে বই বই পড়ে ? ৩। 'খেলা করা' ও 'বই পড়া' এই কাজ দুটি কে কে সম্পন্ন করছে ? এইরূপে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

বিষয়	পদ্ধতি
সূত্র ঃ যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।	**প্রশ্ন ঃ** কর্তৃকারক কাকে বলে? কারক কয়প্রকার?

অভিযোজন ঃ ছাত্রেরা অদ্যকার পাঠ কতখানি বুঝতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ঃ

১। কারক কাকে বলে?

২। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন?

৩। কারক কয় প্রকার? কর্তৃকারক কাকে বলে?

৪। নিচের বাক্যগুলি থেকে সম্বন্ধ পদ ও কারক বের কর—

(ক) ছেলেরা স্কুলের মাঠে খেলা করিতেছে?

(খ) রামের ভাই আমাকে একটি কলম দিয়াছিল।

(গ) শিক্ষক মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।

বাড়ীর কাজ ঃ ছাত্রেরা বাড়ী থেকে কর্তৃকারক ও সম্বন্ধ পদের ব্যবহার সম্বলিত কতকগুলি বাক্য খাতায় লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৭

॥ ব্যাকরণ ॥

১। অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণের একটি বিষয় লইয়া একটি পাঠটীকা রচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1972 '75 '78]

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—অষ্টম ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স—১৩+ সময়—৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—ব্যাকরণ বিশেষ পাঠ—সমাস পাঠক্রম—১। দ্বন্দ্ব সমাস *২। তৎপুরুষ সমাস (৩য়া তৎপুরুষ পর্যন্ত) ৩। তৎপুরুষ সমাস (৭মী তৎপুরুষ পর্যন্ত) * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য : মুখ্য : তৎপুরুষ সমাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সহায়তা করা।

গৌণ : ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

উপকরণ : শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ সম্বন্ধে একটি চার্ট।

আয়োজন : অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। 'পিতামাতা' ও 'রামলক্ষ্মণ'—এই দুটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর।

২। সমস্যমান পদ ও সমস্তপদ কাকে বলে ?

৩। সমাস কয় প্রকার এবং কি কি ?

৪। ব্যাসবাক্য কাকে বলে ?

পাঠঘোষণা : আজ আমরা 'তৎপুরুষ সমাস' সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

উপস্থাপন : অদ্যকার পাঠকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে **আরোহ পদ্ধতির** সাহায্যে সূত্রগুলি গঠন করার চেষ্টা করা হবে।

বিষয়	পদ্ধতি
উদাহরণ : ১। শরণাগত, মধুমাখা, অগ্নিভয়। শরণকে আগত = শরণাগত, মধুর দ্বারা মাখা = মধুমাখা, অগ্নি হইতে ভয় = অগ্নিভয়।	**প্রথম পর্যায় :** **প্রশ্ন :** ১। এই শব্দ তিনটির ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর। ২। পূর্বপদের সঙ্গে কি কি বিভক্তি যোগ হয়েছে ? ৩। সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদ অথবা পরপদ—কোন্ পদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করেছে ? লক্ষ্য কর যে পূর্বপদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিগুলি সমস্তপদ গঠন করার সময় লুপ্ত হয়েছে। এইরূপ যে সমাসে পূর্ব-পদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তি লুপ্ত হয় এবং সমস্ত পদটিতে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় তৎ-পুরুষ সমাসের সূত্র নির্ণয় করা হবে এবং সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।

বিষয়	পদ্ধতি
সূত্র ঃ যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি বিভক্তি লুপ্ত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়। তৎপুরুষ সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।	**প্রশ্ন ঃ** তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?
	দ্বিতীয় পর্যায় ঃ
উদাহরণ ঃ ২। ব্যক্তিগত, হস্তগত, বয়ঃপ্রাপ্ত, বিপদাপন্ন, দেবাশ্রিত, শরণাগত। ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত, হস্তকে গত = হস্তগত, বয়ঃকে প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত, বিপদ্‌কে আপন্ন = বিপদাপন্ন, দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত, শরণকে আগত = শরণাগত।	**প্রশ্ন ঃ** ১। বোর্ডে লিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর। ২। পূর্বপদের সঙ্গে কি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে? ৩। পরপদগুলি কি কি তা বল? ৪। সমস্তপদগুলিতে কোন্ পদের প্রাধান্য লাভ করেছে? লক্ষ্য কর যে এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাসবাক্য গঠন করার সময় পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এবং সমস্ত পদে এই বিভক্তি লুপ্ত হয়েছে। এইরূপ তৎপুরুষ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র-গঠন করা হবে এবং সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, আগত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।	**প্রশ্ন ঃ** দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

বিষয়	পদ্ধতি
	তৃতীয় পর্যায় ঃ
উদাহরণ ঃ ৩। বজ্রাহত, হাতছানি, রবাহুত, শোকাকুল, কীটদষ্ট। বজ্র দ্বারা আহত=বজ্রাহত, হাত দ্বারা ছানি=হাতছানি, রব দ্বারা আহত=রবাহুত, শোক দ্বারা আকুল=শোকাকুল, কীট দ্বারা দষ্ট=কীটদষ্ট।	**প্রশ্ন ঃ** ১। বোর্ডে লিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর। ২। পূর্বপদের সঙ্গে কি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ? ৩। সমস্তপদগুলিতে কোন্ পদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করেছে ? লক্ষ্য কর যে এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাসবাক্য গঠন করার সময় পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এবং সমস্ত পদে এই বিভক্তি লুপ্ত হয়েছে। এইরূপ তৎপুরুষ সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। এরপর ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র-গঠন করা হবে এবং সেটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।
সূত্র ঃ পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।	**প্রশ্ন ঃ** তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে ?

অভিযোজন ঃ ছাত্রেরা তৎপুরুষ সমাসটি কতখানি বুঝতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে ঃ

১। তৎপুরুষ সমাস কয়প্রকার ও কি কি ?

২। কিভাবে তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হয় ?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর ঃ

মজ্জাগত, বিদ্যাহীন, সাহায্যপ্রাপ্ত, বাণবিদ্ধ, রোগজীর্ণ, চরণাশ্রিত, ঋণগ্রস্ত, মেঘাচ্ছন্ন, আলোকপ্রাপ্ত।

বাড়ীর কাজ ঃ ছাত্রেরা বাড়ী থেকে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া তৎপুরুষের আরও দশটি নতুন উদাহরণ (ব্যাসবাক্য সহ) খাতায় লিখে নিয়ে আসবে।

পাঠটীকা—৮

॥ গদ্যাংশ ॥

৮। নবম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা গদ্যাংশের একটি বিষয় লইয়া একটি পাঠটীকা রচনা করুন।

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—নবম ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স ১৪+ সময়— তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—গদ্যাংশ বিশেষ পাঠ—অচেনার আনন্দ —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পঠাক্রম * ১। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। ২। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ। * অদ্যকার পাঠ।

উদ্দেশ্য : মুখ্য : আলোচ্য গদ্যাংশটিতে বাংলা গদ্য রচনার যে নিদর্শন এবং সাহিত্যরস রয়েছে তা উপলব্ধি করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ : ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগের সঞ্চার করা।

উপকরণ : শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং গদ্যাংশটির বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একখানি চিত্র।

আয়োজন : অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :—

১। আমাদের আশেপাশে আমরা কিরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাই ?

২। কোন গ্রামের কাছে নদী থাকলে তা থেকে গ্রামের লোকেরা কি কি সুবিধা পায় ?

৩। গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোথাকার লোকেদের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগ বেশি।

পাঠঘোষণা : আজ আমরা একটি গ্রাম্য বালকের প্রকৃতির রহস্যকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর গদ্য-রচনা পড়বো। এই রচনাটির নাম 'অচেনার আনন্দ' এর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাটি লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র একটি অংশ।

উপস্থাপন : প্রথমে শিক্ষক আলোচ্য গদ্যাংশটির একটি আদর্শ **সরব পাঠ** দেবেন। তারপর তিন-চারজন ছাত্রকে কয়েকটি ক'রে লাইন সরবে পাঠ করতে বলবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সঠিকভাবে পাঠ করতে সাহায্য করবেন। এবার আলোচ্য গদ্যাংশটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হবেন।

বিষয়	পদ্ধতি
১। 'এবার বাড়ি হইতে………… কতকালের পুরাতন গাছটা।' **শব্দার্থ :** বেরুলে—বের হলে। সারবে—উন্নতি ঘটবে। অবধি—হইতে [শুদ্ধ রূপ জন্ম অবধি] সড়ক—রাস্তা। দৌড়—গন্তব্যের শেষসীমা। গুলঞ্চলতা দুলানো—যাহা গুলঞ্চলতাকে দোলায়।	**প্রথম পর্যায় :** ক। ছাত্রের এই অংশটি কয়েক মিনিট নীরবে পাঠ করবে এবং তাদের অজানা শব্দগুলির অর্থ শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করবে। শিক্ষক অজানা শব্দ ও সেগুলির অর্থ বোর্ডে লিখে দেবেন। খ। **প্রশ্ন :** (১) হরিহর ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছিল কেন ? (২) হরিহরের উক্তি থেকে তার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায় ? (৩) অপুর গন্তব্যের সীমা কতদূর ছিল ? (৪) খুব গরম পড়লে অপুর মা কি করত ? (৫) নদীর তীরে কি কি জিনিস দেখা যেত ? গ। **বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :** হরিহর ছিল একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গুরুগিরি ও পুরোহিতগিরি ছিল তার পেশা। সে তার ছেলে অপুকে নিয়ে শিষ্যের বাড়ী যাচ্ছিল। হরিহরের গ্রামের নাম ছিল নিশ্চিন্তপুর। অপু এই প্রথম গ্রামের বাইরে যাচ্ছিল। আলোচ্য অংশে আমরা অপুর গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং তার সঙ্গে অপুর যোগাযোগের কথা জানতে পারি।
২। 'রাখালেরা নদীর তীরে…… তুই একটা পাগল।'	**দ্বিতীয় পর্যায় :** ক। ছাত্রেরা এই অংশটি কয়েক মিনিট নীরবে পাঠ করবে এবং তাদের অজানা শব্দগুলির অর্থ শিক্ষককে জিজ্ঞাসা

বিষয়	পদ্ধতি
শব্দার্থ : জেলে-ডিঙ্গি—জেলেদের ব্যবহৃত ছোট নৌকা বিশেষ। দোয়াড়ি—মাছ ধরবার জন্য এক ধরনের খাঁচা।	করবে। শিক্ষক অজানা শব্দ ও সেগুলির অর্থ বোর্ডে লিখে দেবেন। খ। **প্রশ্ন :** (১) রাখালেরা বৈকালে নদীর ধারে কেন আসত ? (২) অক্রুর মাঝি নদীতে কি করত ? (৩) মাঠের মাঝে মাঝে কি দেখা যেত ? (৪) তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত'—একথার অর্থ কি ? (৫) অপুর মনটা কখন 'কেমন হইয়া যাইত' ? কেন 'কেমন হইয়া যাইত' ? (৬) এই 'কেমন হয়ে যাওয়া' থেকে অপুর মনের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ? (৭) অপু তার দিদিকে কি বলত ? (৮) অপুর কথাটা শুনে দুর্গা কি ভাবত ? গ। **বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :** অপুর মনটা ছিল ভাবুক-প্রকৃতির। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেত—তাই তাই তার মনটা কেমন করত। এই মুগ্ধতার স্বরূপ সে নিজেও জানত না। কিন্তু দুর্গার মধ্যে এইরূপ ভাবুকতা ছিল না, তাই সে অপুর মনোভাব সঠিকভাবে বুঝতে পারত না। **তৃতীয় পর্যায় :**
৩। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :** (১) গুলঞ্চের লতা—ষষ্ঠী তৎ, তাহা দোলায় যাহা—উপপদ তৎ। জেলেদের ডিঙ্গি—ষষ্ঠী তৎ। বনের রেখা—ষষ্ঠী তৎ। গোঁসাইদের বাগান—ষষ্ঠী তৎ।	ক। **ব্যাকরণ আলোচনা :** (১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাস-বাক্যসহ সমাস বল :— গুলঞ্চলতা-দুলানো, জেলে-ডিঙ্গি, বনরেখা, গোসাইবাগান।

বিষয়	পদ্ধতি
(২) ঘাটে—অধিকরণে ৭মী। গাছটাকে—কর্মে ২য়া।	(২) নিম্নরেখ পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :— (ক) তাহার মা বৈকালে নদী ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। (খ) শিমুল গাছটাকে দেখলে মনে হইত।

অভিযোজন :—ছাত্রেরা অদ্যকার পাঠ কতখানি বুঝতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। অপুদের গ্রামের নাম কি ছিল ?

২। হরিহর তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল ?

৩। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অপুর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হত ?

৪। দুর্গা অপুকে 'পাগল' বলেছিল কেন ?

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রেরা বাড়ী থেকে অপুর মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েক লাইন ক'রে লিখে আনবে।

পাঠটীকা—৯

॥ রচনা ॥

৯। ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনার পাঠটীকা রচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1975, 80]

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—ষষ্ঠ ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স—১১+ সময়—৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—অনুচ্ছেদ রচনা বিশেষ পাঠ—*একটি মেলা * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য : মুখ্য :—একটি মেলা সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ :—ছাত্রদের ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

উপকরণ ঃ—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং একটি মেলার দৃশ্য সম্বলিত একখানি চিত্র।

আয়োজন ঃ—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

১। মেলা কাকে বলে ?

২। মেলা সাধারণত কোন্ সময়ে হয় ?

৩। মেলায় কি কি জিনিস পাওয়া যায় ?

৪। তোমার দেখা একটি মেলার নাম বল।

পাঠঘোষণা ঃ—আজ আমরা 'একটি মেলা' সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করার চেষ্টা করব।

উপস্থাপন ঃ—আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করা হবে এবং প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে 'মেলা' সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবিহিত করা হবে ঃ— সূচনা—মেলার স্থান ও উপলক্ষ্য—দোকান-পাটের বর্ণনা—আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা—উপসংহার। শিক্ষক এই শীর্ষগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন এবং ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ

১। **সূচনা ঃ**

(ক) মেলা কাকে বলে ?

(খ) মেলায় যেতে তোমার ভাল লাগে কেন ?

২। **মেলার স্থান ও উপলক্ষ্য ঃ**

(ক) একটি মেলার নাম বল।

(খ) এই মেলাটি কোথায় বসে ?

(গ) কি উপলক্ষ্যে এই মেলা হয় ?

(ঘ) কোন্ সময়ে এই মেলা হয় ?

৩। **দোকান-পাটের বর্ণনা ঃ**

(ক) মেলায় কোন্ কোন্ জিনিসের দোকান দেখা যায় ?

(খ) দোকানগুলি দেখতে কেমন হয় ?

(গ) দোকানের বিক্রেতারা কিভাবে ক্রেতাদের ডাকে ?

(ঘ) কোন্ কোন্ দোকানে ছেলেমেয়েদের ভীড় বেশি হয় ?

৪। **আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ঃ**

(ক) মেলায় আমোদ-প্রমোদের কি ব্যবস্থা থাকে ?

(খ) নাগর-দোলা, ম্যাজিক-লণ্ঠন, যাদুবিদ্যা, নাচ-গান—এগুলির মধ্যে কোন্গুলি তোমার ভাল লাগে ?

(গ) কোথায় ছোট ছেলেমেয়েদের বেশি ভীড় হয় ?

৫। **উপসংহার ঃ**

(ক) মেলাটি তোমার কেমন লেগেছে ?

(খ) এইরকম মেলায় লোকের কি উপকার হয় ?

অভিযোজন ঃ শিক্ষক উপরি উক্ত শীর্ষগুলি অবলম্বন করে 'একটি মেলা' সম্বন্ধে ছাত্রদের একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে বলবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য করবেন।

বাড়ীর কাজ ঃ—ছাত্রদের বাড়ী থেকে অনুচ্ছেদটি সুন্দরভাবে লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠটীকা—১০

॥ রচনা ॥

৬। সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনার পাঠটীকা রচনা করুন।
[C. U. B. Ed. 1980, '78, '72]

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—সপ্তম	সাধারণ পাঠ—রচনা
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ—*বসন্তকাল
গড় বয়স—১২+	* অদ্যকার পাঠ
সময়—৪৫ মিনিট	
তারিখ—	
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য ঃ মুখ্য ঃ—বসন্তকাল সম্বন্ধে বাংলা রচনা লিখতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ ঃ—ছাত্রদের ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

উপকরণ ঃ—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং বসন্তকালের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত একখানি চিত্র।

আয়োজন ঃ অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

১। ঋতু কয়টি এবং কি কি ?

২। এর মধ্যে কোন্ ঋতুটি তোমার ভাল লাগে ?

৩। এই ঋতুটি কেন ভাল লাগে ?

৪। ঋতুগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার খারাপ লাগে এবং কেন খারাপ লাগে ?

পাঠঘোষণা ঃ—আজ আমরা 'বসন্তকাল' সম্বন্ধে একটি রচনা লেখার চেষ্টা করব।

উপস্থাপন :—আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করা হবে এবং প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বসন্তকাল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করা হবে:— ভূমিকা—প্রাকৃতিক শোভা—বসন্তকালের উৎসব—বসন্তকালের উপকারিতা—বসন্তকালের অপকারিতা—উপসংহার। শিক্ষক এই শীর্ষগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন এবং ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন :

১। **ভূমিকা** :

(ক) শীতকালের পর কোন্ ঋতু আসে ?
(খ) কোন্ কোন্ মাসকে বসন্তকাল বলা হয় ?
(গ) বসন্তকাল এলে আবহাওয়ার কি রকম পরিবর্তন হয় ?

২। **প্রাকৃতিক শোভা** :

(ক) বসন্তকালে কি কি ফুল ফোটে ?
(খ) বসন্তকালের সঙ্গে কোকিলকে যুক্ত করা হয় কেন ?
(গ) এইসময় কোন্ কোন্ গাছের ডালে মুকুল দেখা যায় ?
(ঘ) বসন্তকালে আকাশের শোভা কেমন হয় ?
(ঙ) বসন্তকালকে ঋতুরাজ বলা হয় কেন ?

৩। **বসন্তকালের উৎসব** :

(ক) বসন্তকালে কি কি উৎসব হয় ?
(খ) হোলি-উৎসব সম্বন্ধে কি জান ?
(গ) শিবরাত্রি সম্বন্ধে কি জান ?
(ঘ) বাসন্তী পূজা সম্বন্ধে কি জান ?
(ঙ) চড়কের মেলা সম্বন্ধে কি জান ?

৪। **বসন্তকালের উপকারিতা** :

(ক) 'দখিনা বাতাস' কাকে বলে ?
(খ) বসন্তকাল আমাদের কাছে প্রীতিকর কেন ?
(গ) এই সময়ে কি কি শস্য উৎপন্ন হয় ?
(ঘ) এই সময়ে রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন থাকে ?

৫। **বসন্তকালের অপকারিতা** :

(ক) বসন্তকালে কি কি রোগ হয় ?
(খ) বসন্তকালে এইসব রোগ হওয়ার কারণ কি ?
(গ) সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় ?

৬। **উপসংহার** :

(ক) কবিরা বসন্তকালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কেন ?

(খ) বসন্তকাল তোমার কেমন লাগে?

(গ) বসন্তকালের বিদায় কিভাবে ঘটে?

অভিযোজন :—শিক্ষক বসন্তকালের 'প্রাকৃতিক শোভা' (২নং শীর্ষ) সম্বন্ধে ছাত্রদের একটি বড় অনুচ্ছেদ রচনা করতে বলবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য করবেন।

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রদের বাড়ী থেকে সম্পূর্ণ রচনাটি সুন্দরভাবে লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠটিকা—১১

॥ ভাব সম্প্রসারণ ॥

১১। নবম শ্রেণীতে ভাব-সম্প্রসারণ :

"মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।",

(রবীন্দ্রনাথ)

[C. U. B. Ed. 1972]

লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন।

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—নবম ছাত্র সংখ্যা— গড় বয়স—১৪+ সময়—৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—ভাব-সম্প্রসারণ বিশেষ পাঠ—* মৃত্যুকে যে…… বাঁচতে তারাই জানে।" * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য : ছাত্রদের আলোচ্য কবিতাংশটির ভাবসম্প্রসারণ করতে সাহায্য করা এবং তাদের কল্পনাশক্তি ও রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানো।

উপকরণ : - শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন :—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। কিভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে?

২। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ কি কি উপায় অবলম্বন করে?

৩। দুঃসাহসী ব্যক্তিদের মৃত্যুভয় কিরূপ?

৪। যারা মৃত্যুকে অতিরিক্ত ভয় করে তাদের কি বলা হয়?

পাঠ ঘোষণা :—আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা নিম্নলিখিত কবিতাংশটির ভাব-সম্প্রসারণ করবো :—

"মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।"

উপস্থাপন :—আলোচ্য কবিতাংশটি শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সাহায্যে এর ভাব-বিশ্লেষণ করতে ছাত্রদের সহায়তা করবেন :—

(১) মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার অর্থ কি ?

(২) মৃত্যুকে মানুষ সবসময় এড়িয়ে চলতে পারে না কেন ?

(৩) 'মৃত্যু তারেই টানে'—একথার অর্থ কি ?

(৪) 'মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে, মৃত্যু তাকে কিভাবে টানে ?

(৫) পৃথিবীতে দুঃসাহসিক অভিযান কিংবা আবিষ্কার যাঁরা করেছেন তাঁদের মৃত্যুভয় কিরূপ ?

(৬) মৃত্যুভয় বড় বড় কাজে কিভাবে বাধা সৃষ্টি করে ?

(৭) এই বাধা কারা অতিক্রম করতে পারেন ?

(৮) বীর ব্যক্তিরা তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের ফল কিভাবে লাভ করেন ?

(৯) মৃত্যুকে যারা বরণ করে তারা বাঁচতে জানে—একথা বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

(১০) ভীরুতা ও বীরত্ব এই দুটি গুণের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর ? কেন পছন্দ কর ?

(১১) কবিতাংশটির সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝিয়ে বল।

অভিযোজন :—শিক্ষক ছাত্রদের কবিতাংশটির ভাব সম্প্রসারিত করে খাতায় লিখতে বলবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ধুরে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন।

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রেরা বাড়ী থেকে ভাব-সম্প্রসারণটি সুন্দর ক'রে লিখে আনবে।

পাঠটীকা—১২

॥ পত্রলিখন ॥

অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী একটি পত্র-লিখন প্রসঙ্গ লইয়া পাঠটীকা রচনা করুন।
[C. U. B. Ed. 1979]

বিদ্যালয়ের নাম — শ্রেণী –অষ্টম ছাত্র সংখ্যা— গড় বয়স—১৩+ সময়—৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—পত্র-লিখন বিশেষ পাঠ—* চিড়িয়াখানা ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তোমার বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লিখ। * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য :

মুখ্য :—আলোচ্য বিষয়টির উপর বন্ধুকে একটি পত্র লিখতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ: ছাত্রদের রচনাশক্তির বিকাশ ঘটানো।

উপকরণ: শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং চিড়িয়াখানার দৃশ্য সম্বলিত একখানি চিত্র।

আয়োজন :—অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। ব্যক্তিগত পত্র কাকে বলে ?
২। বন্ধু-বান্ধবকে লেখা চিঠি কি জাতীয় পত্র ?
৩। ব্যক্তিগত পত্রের সঙ্গে বৈষয়িক পত্রের তফাৎ কি ?
৪। চিঠির পাঁচটি অংশের নাম বল।

পাঠ ঘোষণা :—আজ আমরা বন্ধুর কাছে চিড়িয়াখানা ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করে একটি চিঠি কিভাবে লেখা যায় তা শিখব।

উপস্থাপন :—চিঠিখানি ছাত্রেরা যাতে লিখতে পারে তার জন্য চিঠির পাঁচটি অংশের উপর ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

শিরোনামা :

(ক) চিঠির কোনখানে শিরোনামা লিখবে ?
(খ) শিরোনামায় কি লিখবে ?

২। **সম্ভাষণ :**

(গ) তোমার বন্ধুকে কিভাবে সম্ভাষণ করবে ?

(ঘ) প্রিয়বরেষু, বন্ধুবরেষু, মেহেরবানেষু, সুহৃদ্বরেষু, অভিন্নহৃদয়েষু—এই সম্ভাষণগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমার ভাল লাগে ?

(ঙ) সম্ভাষণে প্রিয়বরেষু ইত্যাদির সঙ্গে আর কি লিখবে ?

৩। **মূল বক্তব্য :**

(চ) চিঠির প্রথম বাক্যটি কি লিখবে ? (মনে রাখবে এই বাক্যটি কিছুটা আকর্ষণীয় হওয়া দরকার)।

(ছ) তোমরা কে কে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলে ?

(জ) কখন তোমরা সেখানে পৌছেছিলে ?

(ঝ) বছরের কোন্ সময়ে তোমরা সেখানে গিয়েছিসে ?

(ঞ) শীতকালে চিড়িয়ানার প্রধান আকর্ষণ কি ?

(ট) চিড়িয়াখানায় কি কি জীবজন্তু তোমরা দেখেছিলে ?

(ঠ) চিড়িয়াখানা ভ্রমণ তোমার কেমন লেগেছিল ?

(ড) কোন মজার ঘটনা দেখে থাকলে বল।

৪। **বিদায় সম্ভাষণ :**

(ঢ) বন্ধুকে কিভাবে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে ?

৫। **নাম স্বাক্ষর :**

(ণ) এই অংশে কি লিখবে ?

অভিযোজন :—শিক্ষক পত্রের ৩নং অংশ সম্বন্ধে ছাত্রদের একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে বলবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদের সাহায্য করবেন।

বাড়ীর কাজ :—ছাত্রদের বাড়ী থেকে সমগ্র চিঠিটি সুন্দরভাবে লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠটীকা— ৩

॥ দ্রুতপঠন ॥

১৩। দশম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা দ্রুত পঠন-এর একটি বিষয় লইয়া একটি একটি পাঠটীকা রচনা করুন।

বিদ্যালয়ের নাম —	বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
শ্রেণী—দশম	সাধারণ পাঠ—দ্রুত পঠন
ছাত্রসংখ্যা—	বিশেষ পাঠ —'শিক্ষারম্ভ'
গড় বয়স—১৫+	(জীবনস্মৃতি)
সময়—	—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারিখ—	* অভ্যকার পাঠ
শিক্ষক—	

উদ্দেশ্য :—রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষারম্ভ' রচনাটির রসাস্বাদনে ছাত্রদের সাহায্য করা এবং তাহাদের মধ্যে দ্রুতপঠনের অভ্যাস গড়ে তোলা।

উপকরণ :—শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন :—অভ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে :

১। রবীন্দ্রনাথের লেখা কোন্ কোন্ গল্প তোমরা পড়েছ ?

২। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে যে আত্মজীবনীটি লিখেছেন তার নাম কি ?

৩। তোমার ছোটবেলায় যখন প্রথম লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলে তখন তোমাদের কেমন লাগত ?

৪। এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতার কথা মনে থাকলে বল।

পাঠঘোষনা :—আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির অন্তর্গত 'শিক্ষারম্ভ' রচনাটি পড়ব। প্রথমে আমি রচনাটির বিষয়বস্তুর উপর কতকগুলি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দেব। তোমরা রচনাটি মনোযোগসহকারে পড়ে ঐ প্রশ্নগুলির (পূর্বে-নির্দ্ধারিত প্রশ্ন) উত্তর দেবে।

উপস্থাপন : নিম্নলিখিত পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া হবে :

১। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'—কবিতাটি পড়ে কবির মনে কিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল ?

২। খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের কৌতুকপরতা সম্বন্ধে যা জান বল।

৩। কৈলাস মুখুজ্জে কিভাবে শিশুকবির মনোরঞ্জন করত? শিশুমনের উপর ছড়ার কিরূপ প্রভাব পড়েছিল?

৪। ইস্কুলে যাবার জন্য কবি ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? গৃহশিক্ষক তাঁকে কি সারগর্ভ কথা বলেছিলেন?

৫। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে কবির কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

৬। শিশুকবির সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল কিভাবে?

৭। পুলিশ কর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম সম্বন্ধে শিশুকবির মনে কিরূপ ধারণা ছিল?

৮। অন্তঃপুরে গিয়ে কবি কি করলেন?

৯। রামায়ণের করুণ বর্ণনা পড়ে শিশুকবির চোখ দিয়ে জল পড়ল কেন?

১০। এই ঘটনায় কবির স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

এই প্রশ্নগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়ার পর ছাত্রদের আলোচ্য অংশটি নীরবে পড়বার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। পড়তে পড়তে কোন কঠিন শব্দ পেলে ছাত্রেরা শিক্ষককে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করবে। তবে শিক্ষক রচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে ছাত্রদের কঠিন শব্দগুলির অর্থ যথাসম্ভব অনুমান ক'রে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন। ছাত্রেরা পড়া শুরু করার আগে শিক্ষক পাঠে আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কিছুটা আলোচনা করবেন। দশ মিনিট পর শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ব-নির্দ্ধারিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন।

অভিযোজন :—ছাত্রেরা অদ্যকার পাঠের কতখানি রসগ্রহণ করতে পেরেছে তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে;

১। 'শিক্ষারম্ভ' রচনাটি পড়তে তোমার কেমন লাগল?

২। এর মধ্যে কোন্ কোন্ চরিত্র তোমার ভাল গেগেছে?

৩। এর মধ্যে কোন্ কোন্ ঘটনা তোমার খুব ভাল লেগেছে?

বাড়ীর কাজঃ ছাত্রদের বাড়ী থেকে 'শিক্ষারম্ভ' রচনাটি তাদের কেন ভাল লেগেছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠটীকা—১৪

॥ অনুবাদ ॥

১৪। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির অনুবাদ শেখানোর জন্য দশম শ্রেণীর উপযোগী একটি পাঠ-টীকা রচনা করুন।

"A good book always teaches us somethihg, in fact, many things directly or indirectly, if the mind is willing to learn. Books are the best company ; they also give us the best society. They help us establishing contact with many great men. We hear what such men said and did : through books we even see them as if they were really alive. As we read, we share great thought with great minds. We hope and grieve with great men. The scenes in which they appeared are described for us and as we turn the pages, we come to know, what nobleness is."

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—দশম ছাত্রসংখ্যা— গড় বয়স ১৫+ সময়—৪৫ মিনিট তারিখ— শিক্ষক—	বিষয় –বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ—ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ বিশেষ পাঠ * "A good book······ nobleness is" অনুচ্ছেদটির বঙ্গানুবাদ * অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য : মুখ্য : প্রদত্ত ইংরাজী অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করতে ছাত্রদের সাহায্য করা।

গৌণ : ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা।

উপকরণ : শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ এবং প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি বড় বড় হরফে লেখা একটি পোস্টার।

আয়োজন : অদ্যকার পাঠের প্রস্তুতিকল্পে ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে :

১। ভাল বই পড়লে আমাদের কি উপকার হয়?

২। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?

৩। When quite a boy I wanted to be a sailor—এই বাক্যটি বাংলায় অনুবাদ কর। [উত্তর : খুব অল্পবয়সে আমি নাবিক হতে চেয়েছিলাম।]

৪। ইংরাজী ও বাংলা বাক্যদুটির মধ্যে গঠন সংক্রান্ত কি কি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে বল।

পাঠঘোষণা : আজ আমরা প্রদত্ত ইংরাজী অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করব।

উপস্থাপন : ছাত্রদের ইংরাজী অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করতে সাহায্য করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে :—

(ক) বড় বড় হরফে লেখা অনুচ্ছেদটি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

(খ) অনুচ্ছেদটি ছাত্রদের স্পষ্টভাবে পড়ে শোনানো হবে।

(গ) কঠিন কঠিন শব্দের অর্থগুলি ছাত্রদের সহায়তায় বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে :

in fact—প্রকৃতপক্ষে ; directly—প্রত্যক্ষভাবে ; indirectly—পরোক্ষভাবে ; company—সঙ্গী ; society - সংসর্গ, সঙ্গ ; establishing – স্থাপন করতে ; contact —যোগাযোগ ; through—মাধ্যমে ; as it – যেন ; really বাস্তবিকই ; alive—জীবন্ত ; share—অংশভাগী হওয়া ; grieve—দুঃখ প্রকাশ করা ; scene – দৃশ্য ; appear—আবির্ভূত হওয়া ; discribe – বর্ণনা করা ; nobleness—মহত্ত্ব।

(ঘ) ইংরাজী অনুচ্ছেদটির মূল বক্তব্য ছাত্রদের বাংলায় বলে দেওয়া হবে।

(ঙ) অনুচ্ছেদটি থেকে কিছু কিছু বাক্য কিংবা বাক্যাংশ নির্বাচন ক'রে সেগুলি ছাত্রদের অনুবাদ করতে বলা হবে :—

in fact, many things directly or indirectly —প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক কিছু (শেখায়)।

Books are the best company—বই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী।

they also give us the best society—তারা আমাদের সর্বোকৃষ্ট সঙ্গ দেয়।

establishing contact with many great men—বহু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।

through boaks we even see them—বইয়ের মধ্য দিয়ে এমন কি আমরা তাঁদের দেখতে পাই।

as if they were really alive—যেন তাঁরা সত্যি বেঁচে আছেন।

As we read—যখন আমরা পড়ি।

We share great throught with great minds—আমরা মহান ব্যক্তিদের মহৎ চিন্তার অংশভাগী হই।

We hope and grieve with great men—আমরা মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে একসাথে আশা ও দুঃখ প্রকাশ করি।

The scenes in which they appeared are described for us—যে সব দৃশ্যে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের জন্য সেগুলি তাঁরা বর্ণনা করেছেন।

as we turn the pages—যখন আমরা পাতা উন্টাই।

We come to know, what nobleness is—মহানুভবতা কি তা আমরা জানতে পারি।

(চ) অনুবাদ করার সময় ছাত্রদের একদিকে যেমন ইংরাজী বাক্যের বক্তব্যটি যথাযথভাবে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করতে হবে, অপরদিকে তেমনি বাংলা ভাষার সাবলীল প্রকাশভঙ্গী যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদের উপর বেশি জোর দিতে হবে। অনুবাদের সময় ছাত্রেরা অভিধান ব্যবহার করতে পারবে।

অভিযোজন: ছাত্রেরা নিজ নিজ খাতায় ইংরাজী অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করবে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য করবেন।

বাড়ীর কাজ: ছাত্রদের বাড়ী থেকে অনুবাদটি আরও ভাল ক'রে লিখে আনতে বলা হবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা বা কবিতাংশ লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন (কবিতাটি বা কবিতাংশটি উদ্ধৃত করিতে হইবে।)

[C. U. B. Ed. 1974, '76]

২। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতি সহ) লইয়া পাঠ-টীকা রচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1980]

৩। নবম শ্রেণীর জন্য নীচের কবিতাটির ভিত্তিতে পাঠ-টীকা রচনা করুন :—

[C. U. B. Ed. 1977]

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের' পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।

সে গুরুসম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে ; তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে ॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান ॥
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। নবম শ্রেণীতে—যে কোন একটি কবিতা বা কবিতাংশ লইয়া একটি বিশদ পাঠটীকা রচনা করুন (ঐ কবিতা বা কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতে হইবে)।

[C. U. B. Ed. 1971]

৫। নবম অথবা দশম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা কবিতাংশ লইয়া পাঠটীকা রচনা করুন (কবিতা ও কবিতাংশের উদ্ধৃতি আবশ্যক)।

[C. U. B. Ed. 1979, '75 '72]

৬। দশম শ্রেণীর জন্য নিম্নে প্রদত্ত কবিতাটি লইয়া একটি পাঠটীকা রচনা করুন :—

[C. U. B. Ed. 1978]

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরতি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণে একটি বিষয় লইয়া পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1979]

৮। সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণাংশের উপযোগী যে-কোন বিষয় লইয়া পাঠটিকা রচনা করুন। [C. U B. Ed. 1975, '77, '78, '72]

৯। অষ্টম শ্রেণীতে—ক্রিয়াপদের 'অতীতকাল' লইয়া একটি বিশদ পাঠ-টীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1971]

১০। নবম শ্রেণীতে পঠনীয় ব্যাকরণের একটি বিষয় লইয়া পাঠ-টীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1976, '74]

১১। দশম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণের (এই শ্রেণীর উপযোগী) একটি বিষয় লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1973]

১২। সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনা লইয়া একটি পাঠ-টীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1978, '72, 80]

১৩। ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী যে-কোন রচনা লইয়া পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1975]

১৪। সপ্তম শ্রেণীতে—'ফেরিওয়ালা' বা 'ডাকপিওন' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1971]

১৫। অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী একটি রচনা লইয়া পাঠ-টীকা রচনা করুন। [C. U. B Ed. 1977, '76, 73]

১৬। দশম শ্রেণীতে একটি রচনা (রচনার বিষয় নিজেই নির্বাচন করুন) লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1974]

১৭। নবম বা দশম শ্রেণীর উপযোগী ভাব-সম্প্রসারণ (উদ্ধৃতিসহ) বিষয়ে পাঠটীকা রচনা করুন। [C. U. B. Ed. 1980]

১৮। অষ্টম শ্রেণীতে ভাব-সম্প্রসারণ :—

"রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন।

[C. U. B. Ed. 1974]
